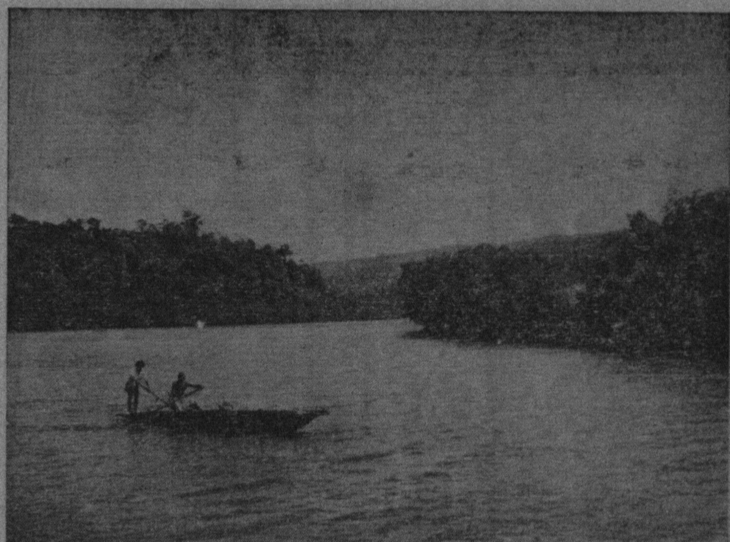


আন্দামানের খাড়ি



টুরিস্ট হোম থেকে মেরিনের দৃশ্য



আগ্নেয়গিরি—ব্যারেন দ্বীপ



ব্যারেন দ্বীপের অভিযাত্রীদল



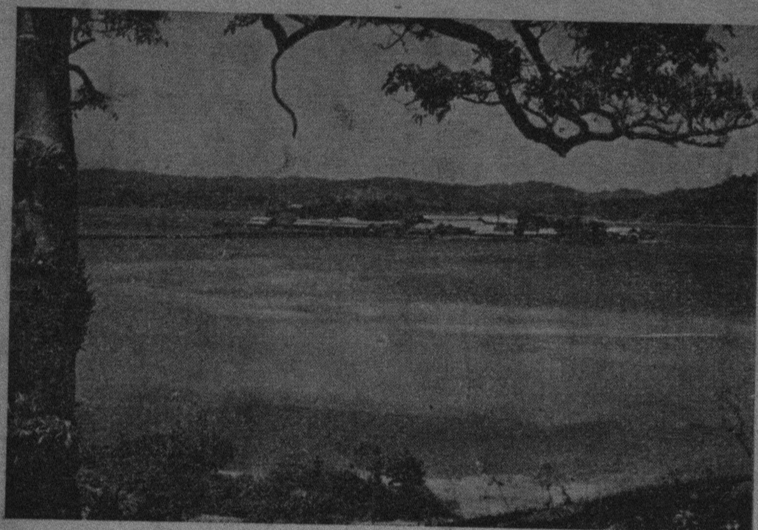
সেলুলার জেল

সবুজ দ্বীপ আন্দামান

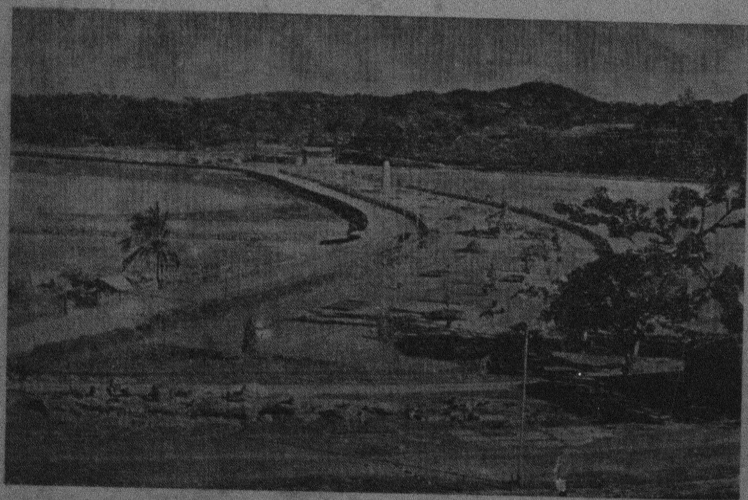
প্রতিভা গুপ্ত



ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৭-সি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২



চ্যাথাম দ্বীপ



মেরিন ড্রাইভ—ডানদিকে জিমখানা গ্রাউণ্ড

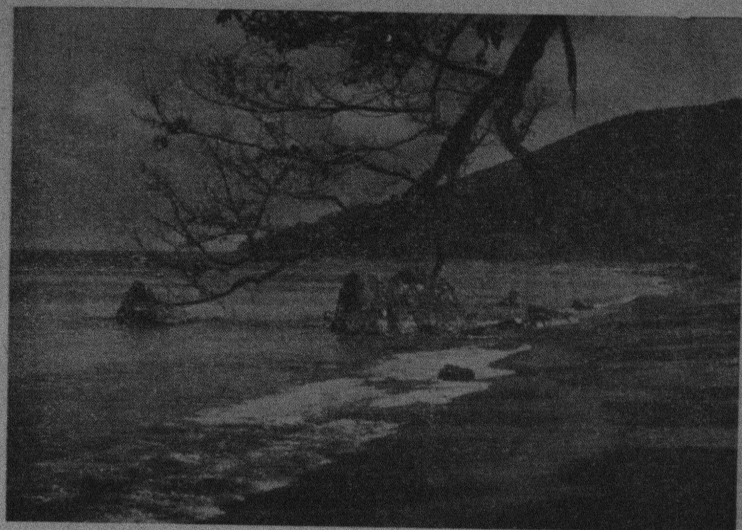
প্রকাশ করেছেন :
পি. গুপ্ত
৩৭৬/২, জি ব্লক,
নিউ আলিপুর
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

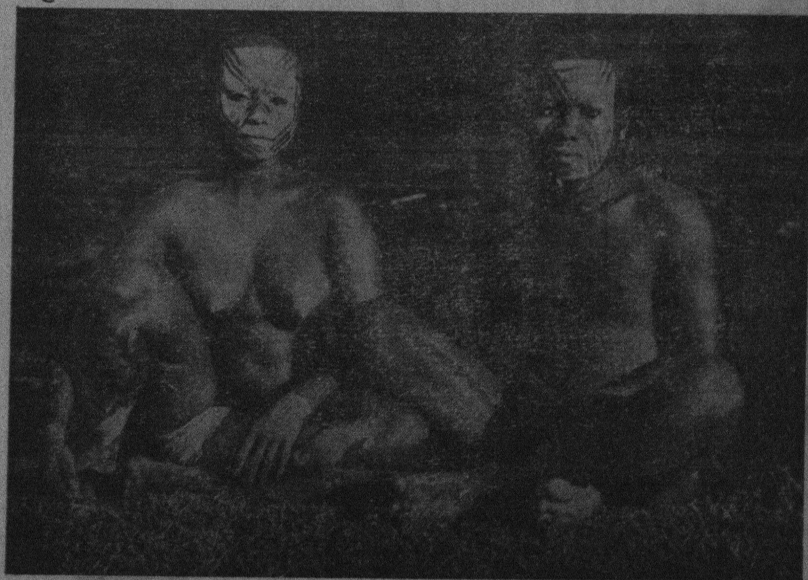
প্রচ্ছদপট এঁকেছেন :
বিভূতি সেনগুপ্ত

ছেপেছেন :
প্রদীপ হাজরা
শ্রীমুদ্রণ
৩৮, পঞ্চানন ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৯

বাঁধাই করেছেন :
প্রোগ্রেসিভ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৪-এ, রামমোহন রায় রোড,
কলিকাতা

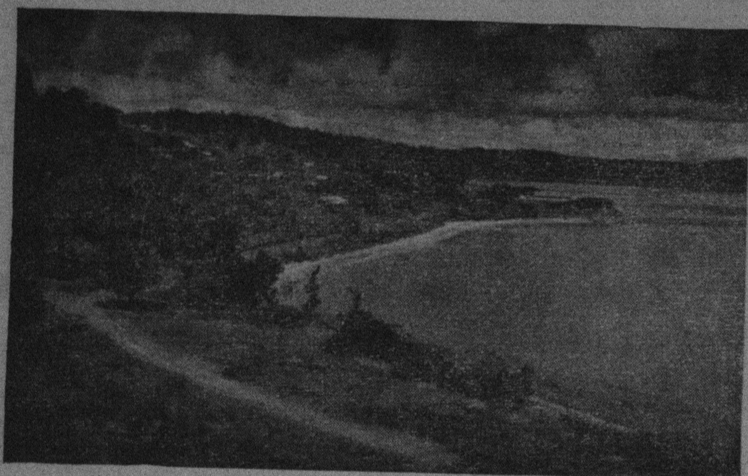


ব্রক্‌সাবাদ সমুদ্রসৈকত

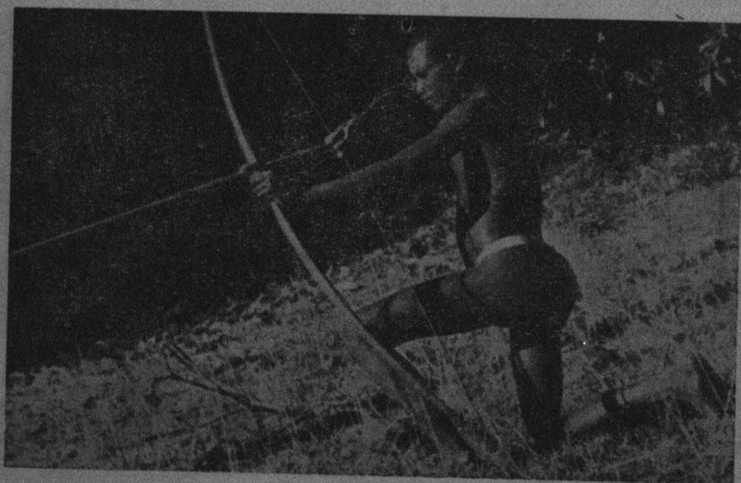


চিত্রিত-বদন ওঙ্গি স্বামী-স্ত্রী

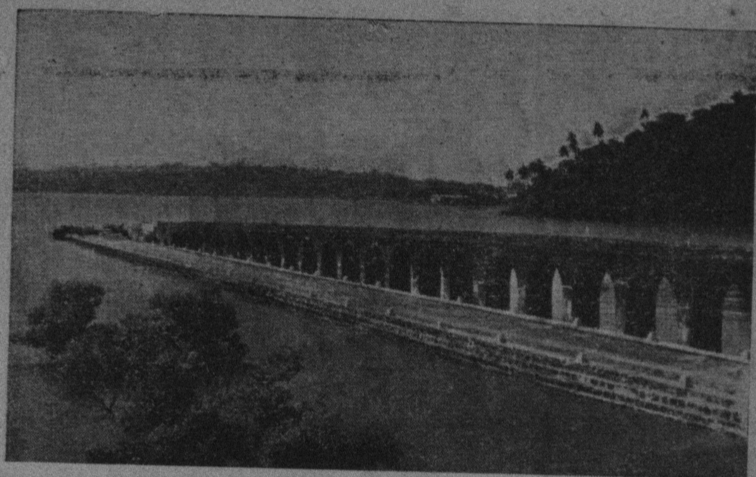
সবুজ দ্বীপ আন্দামান



পোর্টব্লেয়ার



মৎস্য শিকার-রত ওঙ্গি



হোপ টাউনের জেটি

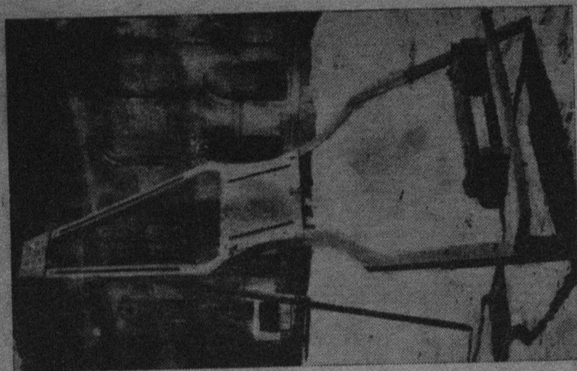


এবারডিন বাজার

উৎসর্গ

॥ মাতৃভূমির সেই অবিস্মরণীয়
মুক্তি-সাধকদের স্মরণে—
যাঁদের পবিত্র পাদস্পর্শে অভিশপ্ত আন্দামান
পুণ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে ॥

—লেখিকা



ফ্লগিং ফ্রেম



ওঙ্গি দম্পতি

আমার কথা

আন্দামানে আসবার পর থেকেই মনে মনে ইচ্ছা ছিল এই দ্বীপগুলি সম্বন্ধে কিছু লিখব। আমার ধারণা আন্দামান সম্বন্ধে এখনও সকলে অন্ধকারেই আছেন। নানা পত্র-পত্রিকায় ছোট-বড় বহু রচনা বার হয়েছে কিন্তু এই দ্বীপগুলি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হয়ত অনেকেরই নেই। বছর দুই আগে 'মাসিক বসুমতী' এবং 'গল্প ভারতী'তে আমার লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সামান্য পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত করে এবার পুস্তকাকারে বার করলাম। এর মধ্যে কোন কল্পনার আশ্রয় নিইনি, সমস্ত ঘটনাগুলি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছি। পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আমাদের দেশ থেকে মাত্র সাড়ে সাতশ মাইল দূরে রয়েছে একটি প্রকৃতির স্বপ্নরাজ্য। বাধ্য না হলে সেখানে কেউ যায় না এবং এই বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়েন সরকারী চাকুরের দল। নানা কাজের চাপে তাঁরা আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে কতটুকু মাথা ঘামান ?

যাঁরা সত্যই সৌন্দর্যের উপাসক, যাঁরা আন্দামানের অপার্থিব সৌন্দর্য দেখে প্রাণ ভরে উপভোগ করবেন, তাঁরা খুব কমই সাগর পাড়ি দিয়ে দ্বীপান্তরের দেশে যেতে

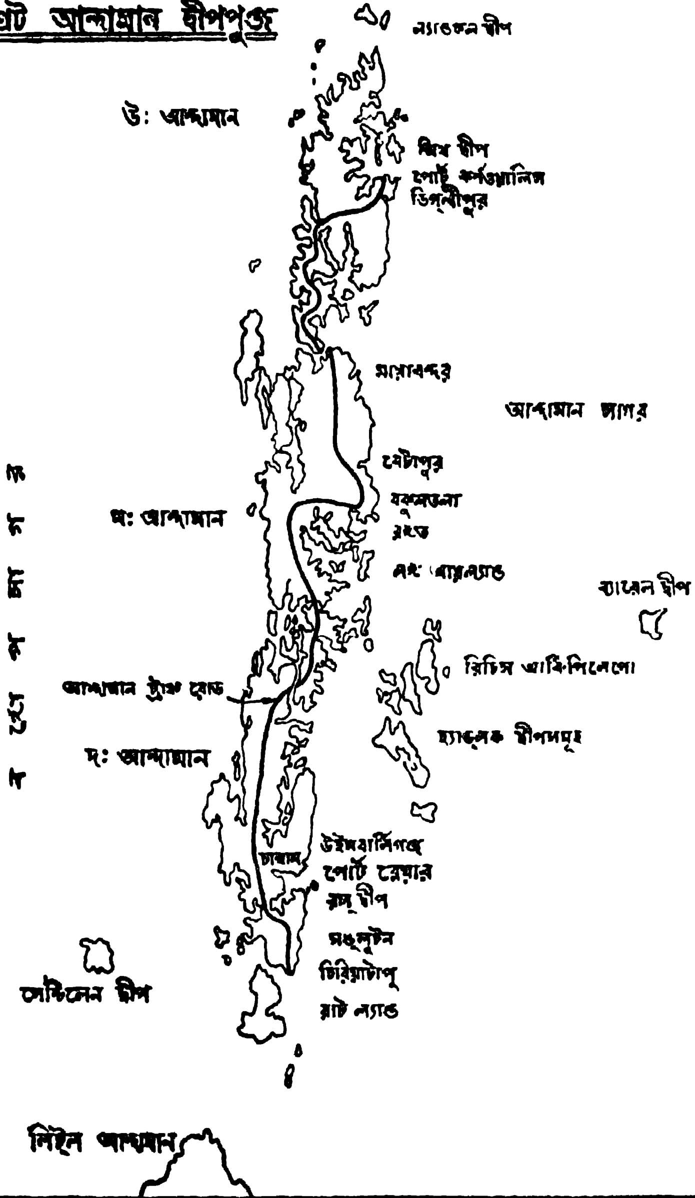
উৎসাহিত বোধ করবেন। হয়ত কত দূর-দূরান্তের দেশে তাঁরা যেতে চাইবেন, কিন্তু আন্দামানে—কখনই না।

বিশ্বকবিও তাই বলিয়াছেন—

বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা।
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির-বিন্দু॥ (রবীন্দ্রনাথ)

প্রতিভা গুপ্ত।


গ্রেট আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ
ল্যাণ্ডফল দ্বীপ
উ: আন্দামান
স্মিথ দ্বীপ
পোর্ট কর্ণওয়ালিস
ডিগলীপুর
মায়াবন্দর
আন্দামান সাগর
বেটাপুর
বকুলতলা
রঙ্গত
ম: আন্দামান
লং আয়ল্যাণ্ড
ব্যারেন দ্বীপ
রিচিস আর্কিপিলেগো
আন্দামান ট্রাঙ্ক রোড
হ্যাভলক দ্বীপসমূহ
দ: আন্দামান
বঙ্গোপসাগর
উইমবার্লিগঞ্জ
চাথাম
পোর্ট ব্লেয়ার
রস দ্বীপ
মঙ্গলুটন
চিরিয়াটাপু
রাট ল্যাণ্ড
সেন্টিনেল দ্বীপ
লিটল আন্দামান

ডিসেম্বরের ভোরবেলা। চারিদিক তখনও কুয়াশায় অন্ধকার। শীতটাও বেশ চেপে বসেছে, জড়তা কাটতে চায় না কিছুতেই। গরম এক কাপ চা নিয়ে বসেছি এমন সময় ক্রীং ক্রীং করে একটানা সুরে টেলিফোনটা বেজে উঠল। বড় মেয়ে বীথি ফোন ধরে বলল, 'মা দিল্লী থেকে বাপী ট্রাঙ্ককল করেছেন।'

উনি গিয়েছিলেন সরকারী কাজে দিল্লীতে। ছুটে গিয়ে ফোন ধরলাম, "কি ব্যাপার? হঠাৎ ট্রাঙ্ককল?"

উনি জবাব দিলেন, "নতুন খবর আছে। আমার বদলীর খবর বেরিয়েছে। আমাকে আন্দামানে পাঠাচ্ছে।"

শুনেই তো আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। চেঁচিয়ে উঠে বললাম, "কি সর্বনাশ! আন্দামানে? এবার উপায়?"

উনি বললেন, "এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? দিল্লীতে অনেকে বলছেন আন্দামান নাকি খুব সুন্দর জায়গা। নিজের পয়সা খরচ করে কোনদিন তো যাওয়া হবে না। সুযোগ যখন এসেছে, চলই না ঘুরে আসি। আর বেশী দিনের জন্য নয়, মাত্র দু' বছরের জন্য।"

জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর মেয়েদের পড়াশুনার কি হবে?"

উনি বললেন, "শুনছি তো সে সব বন্দোবস্ত নাকি আছে। করা যাবে কি, সরকারী চাকরী যখন করি, যেখানে পাঠাবে যেতেই হবে। যাই হোক তুমি তৈরী হতে থাক, আমি কয়েকদিনের মধ্যেই আসছি।"

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। কোথায় সাতসমুদ্র তের নদীর পারে আন্দামান। সেখানে কি করে যায়, কেমন করে যায়, সে সব বিষয়ে কোন ধারণাই নেই। জায়গাটা কেমন, স্কুল কলেজ আছে কিনা, তাও তো জানি না। ভেবে ভেবে

কোন কূল কিনারাই পাচ্ছিলাম না। এমন সময় উনি অর্থাৎ গুপ্ত সাহেব দিল্লী থেকে ফিরে এলেন।

এরপর সুরু হল নানারকম জল্পনা-কল্পনা। কি করা এবং কি না করা।

প্রতিবেশীরা জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় বদলী হচ্ছেন?"

জবাব দিলাম, "ভারতবর্ষের বাইরে।"

তাঁরা বললেন, "তাই নাকি? বেশ মজা তো! কোথায়?"

বললাম, "আন্দামানে।"

শুনেই সকলে আঁতকে উঠলেন, "কি সর্বনাশ, দ্বীপান্তরে যাচ্ছেন? কি এমন অপরাধ করলেন?"

সবাই যেন হায় হায় করে উঠলেন, গন্তব্য স্থানের নাম শুনে। মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল।

অনেক আলাপ আলোচনার শেষে সুবিধা অসুবিধা, ভাল-মন্দ সব দিক ভেবে দেখার পর আমাদের আন্দামান যাবার কথা যখন একেবারে পাকা হল, তখন সুরু হল মনের মধ্যে অদ্ভুত এক উত্তেজনা! অজানা অচেনা দ্বীপান্তরের দেশ—মনে ভয়, কৌতূহল সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক ভাবের সৃষ্টি হল।

যাই হোক যাবার জন্য আমরা তৈরী হতে লাগলাম। ঝঞ্ঝাটও কম নয়। টিকা নাও, ইনজেকসন নাও, হেলথ সার্টিফিকেট তৈরী কর, চীফ কমিশনারের কাছ থেকে প্যাসেজের জন্য অনুমতি আনাও, জাহাজে তোলবার জন্য মালপত্রের মাপজোখ নাও ইত্যাদি নানা ঝামেলা। কয়দিন এর পিছনেই ছুটোছুটি করতে হল।

বাঁধাছাঁদা করে আমরা তৈরী, জাহাজ আর ছাড়ে না। নির্ধারিত সময় যা ছিল জাহাজ ছাড়বার তা দিন সাতেক আগেই পার হয়ে গিয়েছে। রোজই শুনি 'আজ নয় কাল'। 'আজ নয় কাল' করতে করতে আরও দিন পাঁচেক কেটে গেল। বিরক্ত হয়ে অপেক্ষা করতে করতে অবশেষে শুনলাম, 'আগামী কাল জাহাজ

নিশ্চয় করে ছাড়বে।' পরদিন অর্থাৎ ১৯৬১ সনের ২রা জানুয়ারী আমরা খিদিরপুর ডক থেকে আন্দামানের উদ্দেশ্যে জাহাজে চড়লাম। জাহাজটির নাম এম. ভি. আন্দামান।

আমরা যখন ভাইজাগে ছিলাম, এই আন্দামান জাহাজ আমাদের চোখের সামনেই তৈরী হল। হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ডের প্রথম কারগো-কাম্ প্যাসেঞ্জার শিপ বলে খুব ঘটা করে 'লঞ্চিং' হল। প্রথম সমুদ্রযাত্রার দিন অর্থাৎ 'মেইড্‌ন্ ভয়েজের' দিন শিপইয়ার্ডের অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে গুপ্ত সাহেবও জাহাজে চড়ে বেড়িয়ে এসেছিলেন। ফিরে এসে আমাদের কাছে গল্প করেছিলেন 'জাহাজটি একদিকে হেলে পড়ছে, আবার অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হবে ঠিক করার জন্য। যাই হোক এরপব জাহাজটির আর কোন খোঁজ রাখি নি।

এতদিন পরে সেই জাহাজে চড়ে সাগর পাড়ি দিতে হবে ভেবে মনে মনে খুব রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম। বন্ধুরা যাঁরা বিদায় দিতে এসেছিলেন, তাঁরা আমাদেব জাহাজ দেখে বললেন, "এ আবার জাহাজ নাকি! এতো গোয়ালন্দ স্টীমার।" গোয়ালন্দ স্টীমার অবশ্য নয় তবে জাহাজটি বেশী বড়ও নয়। মাত্র পাঁচ হাজার টনের। যাত্রী ধরে প্রায় ছয়শ। আমাদের তো বেশ ভালই লাগল। বেশ ঝক্‌ঝকে,তক্‌তকে। ডেকের গায়ে লাগানো সারি সারি কেবিন, আধুনিক কেতায় সাজানো। প্রত্যেকটি কেবিনে একটি বড় ওয়ার্ডবোব, একটি ড্রেসিং টেবিল, একটি টিপয়, দুইটি বার্থ, এবং বেশ বড় একটি গদি আঁটা চেয়াব। একেবারে পরিপাটী বন্দোবস্ত। বেশ খুশী মনে সব দেখেশুনে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। জাহাজে বেশ ভিড় হয়েছিল। অনেকে কান্নাকাটি করছিলেন, বিশেষ করে মেয়েরা। সবার মনেই এক দুশ্চিন্তা, কোথায় চললাম কে জানে।

আমরা জাহাজে চড়লাম সন্ধ্যাবেলা। শুনলাম জোয়ার না

এলে জাহাজ ছাড়বে না, কাজেই রাত্রিটা ওখানেই থাকতে হবে। তবে জাহাজ জেটি থেকে দূরে মাঝ নদীতে দাঁড়িয়ে থাকবে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেলে আমরাও যে যার কেবিনে গিয়ে ঢুকলাম।

ভোরবেলা অন্ধকার থাকতেই ছুটলাম ডেকের দিকে। রাত্রি বেলা কখন যে খিদিরপুর ছাড়িয়ে চলে এসেছি টেরই পাই নি। সকালবেলার ঝিরঝিরে হাওয়ায় চলন্ত জাহাজে বসে তীরের দৃশ্য দেখতে খুব ভাল লাগছিল। কেবিন বয় এসে জিজ্ঞেস করে গেল কিছু প্রয়োজন আছে কিনা এবং আমরা কোথায় খাব, সেলুনে না ক্যান্টিনে। সেলুনে খেলে প্রত্যেকের মাথা পিছু পুরো জার্নির জন্য ৩০৲ দিতে হয় আর ক্যান্টিনে খেলে ইচ্ছামত খাবার কিনে খেতে হয়। আমরা সেলুনে খাওয়াই ঠিক করলাম।

জাহাজ চলছিল। দুই পাশে তখনও দেখা যাচ্ছিল লোকালয়ের চিহ্ন। ধীরে ধীরে তীরের গাছপালা বাড়ীঘর দূরে সরে যেতে লাগল। দূরে—আরও দূরে। তারপর শুধু দিগন্ত প্রসারী জলের রাশি। বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল। কবে কতদিন পরে ফিরে আসব সেই দ্বীপান্তরের দেশ থেকে, সেই কথাটাই শুধু মনে হতে লাগল।

হুগলী নদী ছাড়িয়ে, ডায়মণ্ড হারবার পার হয়ে এবার আমাদের জাহাজ সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। জলের রংও ধীরে ধীরে বদলাতে স্বরু করল। এতক্ষণ ছিল শুধু কাদাগোলা জল। এবার কাদাগোলা জল থেকে নীলচে সবুজ, নীলচে সবুজ থেকে ঘন নীল এবং তারপর গভীর কালো রং এ পরিণত হল। অদ্ভুত কালো জল। দোয়াতের কালির রংও বুঝি এমনিই কালো। অবাক্ হয়ে জলের দিকে তাকিয়েছিলাম। সমুদ্র নাকি যত গভীর হয় তার রংও তত কালো হয়। বঙ্গোপসাগর কি এতই গভীর? না মেঘে ঢাকা নীল আকাশের ছায়ায় সে এত কালো? কালো—গাঢ় কালো

জল। মনে হল আন্দামানে যেতে হলে এই সীমাহীন নিবিড় কালো জলরাশি পাড়ি দিতে হয় বলেই বোধহয় তার আর এক নাম 'কালাপানি।'

জাহাজ যখন মাঝ-সমুদ্রে গিয়ে পড়ল তখন দেখলাম সমুদ্রের আর এক রূপ। সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় আমার নতুন নয়। ভাইজাগ, পুরী, গোপালপুর, মাদ্রাজে গিয়ে বহুবার সমুদ্র দর্শন হয়েছে। কিন্তু সে শুধু তীরে বসে ঢেউ দেখা ছাড়া আর কিছু নয়। এ ভাবে সমুদ্রের বুকে বসে তার রূপ দেখা আগে কখনও সম্ভব হয় নি। এ সমুদ্রের রূপ আলাদা। সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে তীরের চিহ্নমাত্র নেই। জল—শুধু জল। অশান্ত ঢেউগুলি অনবরত একটার পর একটা এসে আছড়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে। বিরামহীন, সংখ্যাহীন। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু ঢেউয়ের পর ঢেউ নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। মাথায় তাদের রূপোলি ফেনার ঝিলিক। ঢেউগুলি জাহাজের গায়ে ভাঙ্গবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে কেউ যেন বালতি বালতি সাবান গোলা জল ঢেলে দিচ্ছে। ঢেউ ভাঙ্গার খেলা দেখতে দেখতে আবার সামনের দিকে চেয়ে দেখলাম। আদি-অন্তহীন বিশাল সমুদ্র।

আদি অন্ত তাহার কোথারে,
কোথা তার তল, কোথা কূল ?

জাহাজে অনেক যাত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। কেউ বা আমাদের মত নতুন, কেউ বা ছুটির পর ফিরে যাচ্ছেন, আবার কেউ বা আন্দামানের বহুদিনের বাসিন্দা। সহযাত্রীদের কাছে আন্দামানের একটা মোটামুটি ছবি পেলাম। যেমন, সেখানে খুব বৃষ্টি হয়, খাওয়া দাওয়ার বেশ কষ্ট, পড়াশোনার সুবিধা নেই, পলিটিক্স খুব বেশী, দলাদলিটা তার চেয়েও বেশী ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের

সঙ্গে সে সময়কার আন্দামানের সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার কর্ণওয়াল ছুটির পর ফিরছিলেন। ভদ্রলোক নিজে পাঞ্জাবী, বৌ মেমসাহেব। দুটি মেয়ে—মীরা ও মণিকা, পুতুলের মত দেখতে। সারা জাহাজ ছুটোছুটি করে তোলপাড় করে তুলছিল। দেখে বুঝতে পারলাম এ জাহাজ তাদের কাছে নতুন নয়। আমার ছোট মেয়ে ডুলা মীরা মণিকাব সঙ্গে ভাব কবে দলে ভিড়ে ওপরে ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে নীচে বাঙ্ক পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। খাবারের সময় ছাড়া দেখা পাওয়া ভাব।

ডাইনিং রুমে প্রত্যেকদিন দেখা হত কর্নওয়াল দম্পতিব সঙ্গে। খাবারের ব্যবস্থা ছিল রাজসিক। দেশী বিদেশী মিলে অনেক রকম ভোজ্যবস্তুর ব্যবস্থা ছিল। মিসেস কর্নওয়াল তাব থেকে দুই একটা জিনিস নিয়ে কোনটাব এক চামচ কোনটার আধ চামচ খেয়ে খাওয়া শেষ করতেন। আমরা খেতাম প্রায় সবগুলি জিনিসই, তারপর আবার দুবার করেও চেয়ে নিতাম। আমিষ নিরামিষ দুরকমেরই বন্দোবস্ত ছিল। ভোজনরসিক গুপ্ত সাহেব কোনটাই বাদ দিতেন না। মেমসাহেব ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে আমাদের খাওয়া দেখতেন এবং মনে মনে হয়ত ভাবতেন আমরা এক একটি রাক্ষসের নবসংস্করণ!

খাবার টেবিলে গল্প কবতে কবতে ডাঃ কর্নওয়াল বললেন, "যদিও আমি ওখানকার এস. এম. ও. কিন্তু এখানে তোমাদের একজন বাঙ্গালী ডাক্তার আছেন ডাঃ পাণিগ্রাহী, তাঁর খুব হাতযশ আছে।"

গুপ্তসাহেব বললেন, "পাণিগ্রাহী? পাণিগ্রাহী কখনও বাঙ্গালী হয় না। হয় উনি উড়িয়া নয়ত মেদিনীপুর বর্ডারের লোক।"

ডাঃ কর্নওয়াল,—"না না আমি খুব ভালো করে জানি উনি বাঙ্গালী।"

গুপ্ত সাহেবও মানবেন না, ডাক্তার কর্নওয়ালও ছাড়বেন না।

বিশ্বাস করাবেনই যে পাণিগ্রাহী বাঙ্গালী। শেষে গুপ্তসাহেব চুপ করে গেলেন।

সময় কেটে যাচ্ছে। যে কৌতূহল, যে উৎসাহ নিয়ে রওনা দিয়েছিলাম, ধীরে ধীরে তা কমে আসতে লাগল। তিনদিন একটানা সমুদ্র দেখে দেখে ক্লান্তি এসে গেল। এই দীর্ঘ যাত্রার পথে জাহাজ কোথাও নোঙর করে না। এই পথে অন্য কোন জাহাজও চলতে দেখা যায় না। সারাদিন খাও আর ঘুমাও, এ ছাড়া আর কোন কাজ নেই। কাজ যদি থাকে সে শুধু বসে বসে ঢেউ গোনা। কত আর ভাল লাগে? জল—শুধু জল দেখে আমাদেরও চিত্ত বিকল হবার উপক্রম। একমাত্র বৈচিত্র্য সমুদ্রের জলে উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক। উড়ুক্কু মাছগুলি দল বেঁধে লাফিয়ে জল ছেড়ে ওঠে আর পাখার ওপর ভর দিয়ে খানিকটা দূর উড়ে গিয়ে আবার জলে ডুব দেয়। দেখতে ভারী মজা লাগে।

সমুদ্রের অবস্থা বেশ শান্ত থাকায় আমাদের কারও সমুদ্র পীড়া হয় নি। প্রত্যেকদিন সকালে নার্স মিস্ রয় এসে খবর নিয়ে যেতেন আমরা কেমন আছি। এর মধ্যে একদিন বিকেল চারটের সময় লাইফ জ্যাকেট পরার মহড়া হল। আগেই জাহাজের লোকেরা এসে লাইফ জ্যাকেট পরা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমরা লাইফ জ্যাকেট পরে ওপরের ডেকে ছুটলাম। খানিকক্ষণ পরে আবার ঘণ্টা বাজলে নীচে নেমে এলাম। এই ভাবে দিন কাটতে লাগল। যাত্রীরা তাস, ক্যারাম, ডেক টেনিস খেলেও সময় কাটাতে লাগলেন। আমার যেন সময় আর কাটে না। কতদিনে পৌঁছাব, কতদিনে মাটিতে পা দেব, এই চিন্তাই মন জুড়ে রইল।

চতুর্থ দিনে ভোরবেলা ডেকে গিয়ে দেখি অপরূপ দৃশ্য। সমুদ্রের বুকে যেন পাহাড়ের মেলা বসে গিয়েছে, সারি সারি একটার পর একটা পাহাড়। কোনটা বেশ বড় কোনটা খুব ছোট। প্রত্যেকটিই

আলাদা আলাদা এক একটি দ্বীপের মত। সামনে এক লাইন আবার তার পিছনে এক লাইন। কখন কখন মনে হয় বুঝি অনেকগুলি দ্বীপ একসঙ্গে লাগানো। শুধু পাহাড় আর পাহাড়। মধ্যে সংকীর্ণ খাড়িপথ। মাঝে মাঝে পাহাড়ের নীচে বিস্তৃত উপত্যকা। দ্বীপগুলি সবই আগাগোড়া সরস সবুজ বনে ঢাকা। ঘন নীল সমুদ্রের বুকে একরাশ সবুজের মেলা। অরণ্য সম্পদের আংশিক প্রকাশেও অপরিমেয়তার ইঙ্গিত। সহযাত্রীরা বললেন, খানিক আগে বর্মীদের কোকো (Cocoa) দ্বীপ ছাড়িয়ে এসেছি, আর এইখান থেকেই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সুরু এবং একেবারে শেষে সেই দক্ষিণ সীমান্তে পোর্টব্লেয়ার পর্যন্ত আমাদের জাহাজ এই দ্বীপগুলির পাশ দিয়ে দিয়ে চলবে।

এই তবে আন্দামান। আজও যার নাম শুনলে বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। যে দেশটা সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। যে দেশের নাম শুনলে মনে প্রশ্ন জাগে সমুদ্রের মাঝখানে কেমন সে দেশ, যে দেশে শাস্তি দেবার জন্য কয়েদীদের দ্বীপান্তর পাঠান হত —আর কেমন সে দেশের আদিম অসভ্য মানুষ, যারা সভ্যদুনিয়ার মানুষকে পরমশত্রু বলে মনে করে। উদগ্র কৌতূহল নিয়ে দ্বীপগুলির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভারতবর্ষের মানচিত্র খুললে দেখা যায় বঙ্গোপসাগরের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে একসারি মুক্তোর মত ছোট ছোট কয়েকটি বিন্দুর সমষ্টি। এই হল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ভৌগোলিক অস্তিত্ব। কলকাতা থেকে যার দূরত্ব ৭৮০ মাইল, আর মাদ্রাজ থেকে ৭৪০ মাইল। এই দ্বীপ-পুঞ্জের আয়তন ২৫৮০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা আটচল্লিশ হাজারের ওপর।

বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে গভীর জঙ্গলে ঢাকা দ্বীপগুলি দেখে ভাবছিলাম, সত্যিই কি এই দ্বীপগুলি আরাকান পর্বতমালার বিচ্ছিন্ন শাখা? ভৌগোলিকেরা বলেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগে বর্মাদেশের

'কেপ নেগ্রেস' থেকে সুমাত্রার 'এচিন হেড' পর্যন্ত সমগ্র আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অর্ধচন্দ্রাকারে বর্মা ও সুমাত্রার সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরে হয়ত কোন প্রবল ভূমিকম্পে বা অন্য কোনরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পাহাড়গুলির কিছু সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে, কিছু মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কে জানে প্রকৃতির খেয়ালে হাজার বছর পর আবার হয়ত বর্তমান দ্বীপগুলি তলিয়ে যাবে কিংবা নতুন নতুন দ্বীপের সৃষ্টি হবে।

জাহাজে আন্দামানের একটি মানচিত্র এবং আন্দামান সম্বন্ধে কয়েকটি বই ছিল। মানচিত্রে দেখলাম উত্তর সীমান্তে ল্যাণ্ডফল দ্বীপ, দক্ষিণ সীমান্তে রাটল্যাণ্ড দ্বীপ এবং মাঝখানে ছোটবড় আরও দু'শটি পাহাড়ী দ্বীপ ও অসংখ্য খাড়ি নিয়ে গ্রেট আন্দামান। লম্বায় প্রায় দু'শ মাইল। এর চল্লিশ মাইল দক্ষিণে লিট্‌ল আন্দামান, তারও আশী মাইল দক্ষিণে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

সেকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথে কিন্তু বঙ্গোপসাগর পাড়ি দেবার সময় আন্দামানের পাশ দিয়েই সব জাহাজের আনাগোনা ছিল। পৃথিবীর নানা দিক থেকে আফ্রিকা, চীন, জাপান, ঈজিপ্ট, গ্রীস, রোম, মালয়, জাভা, সুমাত্রা—সব দেশের জাহাজগুলি এর পাশ দিয়েই যাতায়াত করত। এই পথে যাবার সময় কখন বা সাইক্লোনে পড়ে, কখন বা পথ হারিয়ে, কখন বা পানীয় জলের সন্ধানে জাহাজগুলি আন্দামানে এসে পড়ত। এখানকার আদিম অসভ্য জাতির হাতে তাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকত না। কিছু না কিছু লোকজন জংলীদের হাতে মারা পড়তই। সেই সব জাহাজের নাবিকেরা এ জায়গাটা সম্বন্ধে এমন সব ভীতিপ্রদ গল্প প্রচার করে বেড়াত যে, যার ফলে সাধ্যমত সকলে আন্দামানকে এড়িয়ে চলত।

তার আগে বঙ্গোপসাগরের এক কোণে এই দ্বীপগুলির খবর বহুদিন পর্যন্ত পৃথিবীর লোকেদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। পরে যখন আন্দামানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও তার বাসিন্দাদের সম্বন্ধে লোকে নানা

কাহিনী প্রচার করে বেড়াতে লাগল, তার বেশীর ভাগই অলীক ও কাল্পনিক।

আন্দামান সম্বন্ধে প্রথম ঐতিহাসিক সংবাদ পাওয়া যায় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ক্লডিয়াস টলেমির লেখা একটি ভ্রমণ কাহিনী থেকে। টলেমী তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে কতকগুলি দ্বীপ-পুঞ্জের উল্লেখ করেছেন. নাম বলেছেন, 'আগমাটি' বা Good Spirit Island.

এর পরে নবম শতাব্দীতে আরব দেশীয় পরিব্রাজকদের ভ্রমণ কাহিনী থেকে আবার আন্দামানের খবর পাওয়া যায়। দুই জন আরব পরিব্রাজক যখন ভারতবর্ষ ও চীনদেশের মধ্যে যাতায়াত করছিলেন, জলের সন্ধানে এক সময় তাঁরা এই দ্বীপে উপস্থিত হন এবং জংলীদের হাতে তাঁদের কিছু লোকজন মারা যায়। তাঁরা বলেছেন, "এখানকার অধিবাসীরা দেখতে অতি ভয়ঙ্কর, রং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। ঘন কোঁকড়ান থোপা থোপা মাথার চুল এবং কুৎসিত ভয়াবহ মুখাকৃতি। মানুষগুলি সম্পূর্ণ নগ্নকায় এবং বন্য জন্তুর মত তারা কাঁচামাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।"

এরও চারশ বছর পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কো পোলোর লেখা থেকে আন্দামানের আরও খবর পাওয়া যায়। মার্কো পোলো বলেছেন, "বঙ্গোপসাগরে আঙ্গামান নামে বিরাট লম্বা এক দ্বীপ আছে। এর অধিবাসীরা অত্যন্ত বন্য ও অসভ্য জাত। তাদের দেখতেও অনেকটা জনোয়ারের মত। স্বভাব অত্যন্ত ক্রূর। তারা নিজের জাত ছাড়া অন্য মানুষ পেলে তাদের হত্যা করে ভক্ষণ করে।"

১৫৬৩ সনে মাস্টার সিজার ফ্রেডারিক মালাক্কা থেকে গোয়া যাবার কালে নিকোবরে এসে পড়েন। তিনি বলেছেন, "নিকোবর থেকে পেগু পর্যন্ত অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ আছে, তাদের বলে Land of Andameons কতকগুলি দ্বীপের মধ্যে একদল মানুষ বাস করে, তারা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ। তারা পরস্পরকে

হত্যা করে ভক্ষণ করে। দুর্ভাগ্যক্রমে কোন জাহাজ যদি সেখানে গিয়ে পড়ে তবে প্রাণ নিয়ে কেউ ফিরে আসতে পারে না।"

সম্রাট অশোকের সময় একবার একদল হৃতসর্বস্ব ভারতীয় বণিক পাটলিপুত্রে এসে বলেছিল, সমুদ্র পথে সিংহল থেকে আসবার সময় এক দ্বীপে তাদের নৌবহর থামলে সেখানকার কৃষ্ণকায় উলঙ্গ অধিবাসীরা তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে এবং তাদের যথা-সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে রেখে দেয়। অতিকষ্টে প্রাণ নিয়ে তারা পালিয়ে আসে। সকলে অনুমান করেন এই বণিকরা হয়ত আন্দামানেই এসে পড়েছিল।

বহু শতাব্দী পর্যন্ত আন্দামান দ্বীপগুলি সভ্যজগতের কাছে এক রহস্যময় ভয়ঙ্কর দেশ বলে গণ্য হত। এখানকার আদিম অধি-বাসীদের সম্বন্ধে সকলের ধারণা ছিল তারা নরখাদক—Cannibals. এই অপপ্রচারের ফলে দ্বীপগুলি সম্বন্ধে সকলে দারুণ আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। নানা লোকের নানা বর্ণনা থেকে আন্দামান ও তার অধিবাসী সম্বন্ধে নানারকম অবিশ্বাস্য ও অদ্ভুত কাহিনী প্রচার হতে থাকল। এই সব কাহিনীর সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য কেউ মাথা ঘামায়নি বরং নিরাপদ দূরত্বে সকলে আন্দামানকে পাশ কাটিয়ে চলে যেত।

পাহাড়ের পর পাহাড়, দ্বীপের পর দ্বীপ পার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোন লোকালয় চোখে পড়ছে না। শুধু সবুজ দ্বীপের সারি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করছিলাম ঘন জঙ্গলের মাঝখান থেকে আন্দা-মানের আদিম অধিবাসীরা তীর ধনুক নিয়ে বেরিয়ে আসে কি না। কিন্তু বৃথা আশা। কোন জনমানবের চিহ্নও দেখা গেল না।

ভাবতে অবাক লাগে, এতদূরে এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলিতে প্রথমে মানুষের পদার্পণ কি করে হল। তার সম্বন্ধেও নানা কিংবদন্তী আছে। অনেকে বলেন বহুদিন আগে এক পর্তুগীজ জাহাজ তিনশ

কাফ্রী ক্রীতদাস (নরনারী) নিয়ে মোজাম্বিক থেকে রওনা হয়ে পর্তুগীজ সেটেলমেন্ট পেগু যাচ্ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গোপসাগরের প্রচণ্ড সাইক্লোনে দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে জাহাজটি এসে ধাক্কা খেল আন্দামান দ্বীপে এবং টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। ফলে সেই তিনশ কাফ্রী স্ত্রী পুরুষ স্থায়িভাবে এখানেই রয়ে গেল। মনে অবশ্য প্রশ্ন জাগে সেই জাহাজে পর্তুগীজ নাবিক ও খালাসী যারা ছিল তাদের কি হল? তাদের কি একজনও বেঁচে ছিল না? কিংবদন্তী বলে কাফ্রী ক্রীতদাসরা আক্রোশের বশে তাদের হত্যা করেছিল।

আবার এমন গল্পও আছে যে সেকালে মালয় ও চীনা জলদস্যুরা আন্দামানে তাদের ঘাঁটী তৈরী করেছিল। তারাই সব ভীষণ দর্শন কাফ্রীদের ধরে এনে এখানে ছেড়ে দিয়েছিল যাতে তাদের ভয়ে বাইরের কোন জাহাজ এখানে ভিড়তে সাহস না করে। কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যে যাচাই করা বড় কঠিন।

আন্দামান দ্বীপগুলির দিকে চেয়ে দেখলাম। কি নয়নাভিরাম দৃশ্য। কি সবুজের সমারোহ। কতরকমের যে সবুজ তার ঠিক নেই। কেমন সব বিরাট বিরাট গাছগুলি নিজস্ব মহিমায় সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সুন্দর শ্যাম গম্ভীর। মনে হচ্ছিল কেউ যেন যত্ন করে নিজের হাতে দ্বীপগুলিকে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

পুরো দেড় দিন পাহাড়ী দ্বীপগুলির পাশ দিয়ে এসে জাহাজ ঘুরে এবার পোর্টব্লেয়ারের দিকে চলল। বন্দরের মুখেই ছোট্ট একটি দ্বীপ—নাম 'রস্ আয়ল্যাণ্ড।' রস্‌কে বাঁ পাশে রেখে জাহাজ এগিয়ে চলল। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিরাট বন্দরটি, তার তিন দিকেই ঘেরা পাহাড়। বাঁ দিকের পাহাড়ে পোর্টব্লেয়ার শহর। প্রথমেই দেখতে পেলাম সেলুলার জেল, যেন অতন্দ্র প্রহরীর মত সমুদ্রের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বন্দরের মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপ—

চ্যাথাম। এইখানেই পোর্টব্লেয়ারের জেটি। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর পঞ্চম দিনে আমাদের জাহাজ এসে চ্যাথামে নোঙ্গর করল। ছোট্ট জেটি, লোকে লোকারণ্য। জাহাজ থামা এবং জাহাজ ছাড়ার দিনটিতে জেটিতে খুব ভীড় হয়। শহরের বহুলোক গিয়ে জাহাজঘাটে জড় হয়। এ ছাড়া গুপ্ত সাহেব পি. ডব্লিউ. ডি.-র প্রিন্সিপ্যাল এঞ্জিনীয়ার হয়ে আসায় জাহাজঘাটে পি. ডব্লিউ. ডি.-র অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে জেটির দিকে চেয়ে ছিলাম। একজন সহযাত্রী বলে দিচ্ছিলেন কোন ভদ্রলোক কে এবং কি। গ্যাংওয়ে লাগানো হলে পিল পিল করে জেটির লোকেরা জাহাজে উঠতে লাগল। জনতার বেশ বড় একটা অংশ গুপ্তসাহেবের সঙ্গে পরিচিত হতে এলেন। এঁরা বেশীর ভাগ পি. ডব্লিউ. ডি.-র লোক। সকলের সঙ্গে পরিচয় শেষ হতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। আমরা এ রকম একটা অভ্যর্থনা পেয়ে খুব খুশী হলাম। ভারতবর্ষের কত জায়গায় বদলী হয়ে গিয়েছি, কে কার জন্য মাথা ঘামায়। এখানে সবই একটু ভিন্ন প্রকৃতির। জাহাজ এলে সবাই খুশী। চিঠিপত্র এল, খাবার জিনিসপত্র এল, আরও কিছু মানুষজন এল, সর্বোপরি সভ্য জগতের খবর এল—তাই বৈচিত্র্যহীন জীবনে একটা মস্ত বড় দোলা লাগল।

হেল্‌থ অফিসার যাত্রীদের পরীক্ষা করে নামবার ছাড়পত্র দিলে আমরা জেটিতে নামলাম। জেটি থেকে মাটিতে পা দিয়েই যে কথাটা প্রথম মনে এল তা হল আমরা দ্বীপান্তরের দেশে পা দিলাম। এই সেই দেশ; ছোট বেলা থেকে যার সম্বন্ধে কত গল্প শুনেছি। যার সম্বন্ধে শুধু একটা আবছা ধারণা ছিল। এইখানেই আমাদের দেশের কত মানুষ নির্বাসিত হয়ে জীবন কাটিয়ে গিয়েছে, কতলোক এখানে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে।

চ্যাথাম দ্বীপটি একটি 'কজওয়ে' দিয়ে পোর্টব্লেয়ারের সঙ্গে যুক্ত। জেটির গায়েই পাহাড়ের উপর অন্নপূর্ণা কাফেটারিয়া। বাঁ দিকে

বেশ বড় একটি স-মিল। জেটিভর্তি ছড়ানো রাশিকৃত কাঠের গুঁড়ি, মোটা মোটা পাইপ এবং বিরাট বিরাট প্যাকিং বাক্স।

জেটির বাইরে অনেক সরকারী জীপ ও ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। কোন হোটেলের এজেন্ট অথবা গাইড চোখে পড়ল না। শহরটি পাহাড়ী। কজওয়ে ছাড়িয়ে আসবার পরেই বেশ বড় একটি চড়াই। ডানদিকে 'উইমকোর' ম্যাচ ফ্যাক্টরী। তার এক পাশে অনেক ছোট ছোট বাড়ী। আরও কিছু বাড়ীঘর, ছোট একটি বাজার। হার্টিকালচার গার্ডেন পার হয়ে আমরা এসে পোর্টব্লেয়ারের সরকারী গেস্ট হাউসে পৌছলাম।

পোর্টব্লেয়ার ক্যাপ্টেন ব্লেয়ারের প্রতিষ্ঠিত প্রথম কয়েদী উপনিবেশ। যার আকাশে বাতাসে মিশে রয়েছে কত মানুষের বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুজল, যার ধূলি মাটিতে মিশে রয়েছে কত লাঞ্ছিত অত্যাচারিত হতভাগ্যের মৃতদেহ।

সাইক্লোনে পড়ে অথবা পথ হারিয়ে যে সব জাহাজ আন্দামানে এসে পড়ত সেই সব জাহাজের নাবিকরা নানা রং ফলিয়ে এখানকার জংলীদের কথা নানাদিকে প্রচার করে বেড়াত। তার ওপর বঙ্গোপসাগরে মালয়ী ও চীনা জলদস্যুদের অত্যাচারও অত্যন্ত বেড়ে চলেছিল। এ ছাড়া এই দ্বীপগুলিতে একটা নিরাপদ পোতাশ্রয় না থাকাতে সাইক্লোনের সময় জাহাজগুলি অত্যন্ত বিপদে পড়তে লাগল।

কিছুদিন ধরেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গোপসাগরের দ্বীপগুলিতে উপনিবেশ গঠন করার কথা ভাবছিলেন কিন্তু ১৭৫২ সনে কেপ নেগ্রেস দ্বীপে উপনিবেশ গঠনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে নতুন করে চেষ্টা করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। ১৭৭৭ সনে জন রিচি বঙ্গোপসাগরের দ্বীপগুলি কোম্পানীর তরফ থেকে জরীপ করে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে জানালেন, "In whatever light these islands are considered a thorough

knowledge of them will appear to be a matter of great utility."

কোম্পানী এ খবর পেয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। ১৭৮৮ সনে ক্যাপ্টেন বুকানন আবার কোম্পানীকে জানালেন যে, তিনি আন্দামান সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য জোগাড় করেছেন, তাঁকে সেখানে যাবার জন্য সুযোগ দেওয়া হোক। তা ছাড়া বছর বছর এত জাহাজ যে বঙ্গোপসাগরে বিপদে পড়ছে তার জন্য কোম্পানী কেন এতটুকুও চিন্তিত হচ্ছেন না, এটা আশ্চর্যের কথা। এই সব কারণে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এর একটা প্রতিকার করতে উঠে পড়ে লাগলেন।

১৭৮৯ সন। লর্ড কর্নওয়ালিশ তখন ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল। সে সময় কোম্পানীর হাইড্রোগ্রাফার ছিলেন ক্যাপ্টেন আর্কিবল্ড ব্লেয়ার এবং সারভেয়ার জেনারেল ছিলেন কর্নেল কোলব্রুক।

প্রথমে কোম্পানী ক্যাপ্টেন ব্লেয়ারকে ও পরে কর্নেল কোলব্রুককে আন্দামানে পাঠালেন সমস্ত দ্বীপগুলি ও আশেপাশের দরিয়া জরীপ করতে তিনটি কারণে।

(১) কয়েদী উপনিবেশের জন্য মনোমত একটি স্থান নির্বাচন।

(২) নিরাপদ পোতাশ্রয়ের জন্য বন্দরগুলি পরিদর্শন।

(৩) আন্দামানের আদিবাসীদের বশ করে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন।

ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার ও কর্নেল কোলব্রুক সমস্ত দ্বীপগুলি মোটামুটি জরীপ করে কোম্পানীর কাছে রিপোর্ট পেশ করলেন। ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার জানালেন, আন্দামানে এত সুন্দর সুন্দর স্বাভাবিক বন্দর আছে যা পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। জলহাওয়া ভাল। দ্বীপগুলির মধ্যে ছোট

বড় ঝরনা আছে। কোন কোন বন্দর এত প্রশস্ত যে, সেখানে হয়ত ব্রিটিশ নেভির অর্ধেকই প্রায় ভিড়ানো যায়।

এখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে কর্নেল কোলব্রুক জানালেন, "আন্দামানীরা হয়ত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা আদিম জাত। তাদের গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তারা খর্বাকৃতি এবং মাথায় তাদের ঘন কুঞ্চিত কেশ। সম্পূর্ণ নগ্নকায়। মানুষগুলি ধূর্ত এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ।"

পেনাল সেট্‌ল্‌মেণ্টের জন্য তাঁরা উভয়েই দক্ষিণ আন্দামানের চ্যাথাম দ্বীপ ও তৎসংলগ্ন বড় দ্বীপটি (বর্তমান পোর্টব্লেয়ার) পছন্দ করলেন।

রিপোর্ট পেয়ে কোম্পানী ক্যাপ্টেন ব্লেয়ারকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর সংগে অনেক আলাপ আলোচনার পর সেট্‌ল্‌মেণ্টের দায়িত্ব দিয়ে ক্যাপ্টেন ব্লেয়ারকে আবার আন্দামানে পাঠালেন। বাংলা দেশ থেকে অল্প সংখ্যক কর্মচারী, মিস্ত্রি, মজুর ছ'মাসের রেশন নিয়ে বর্মা হয়ে ১৭৮৯ সালে ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার আন্দামানে এসে পৌঁছালেন। জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য বর্মা থেকে কিছু বর্মী কয়েদী ও বর্মী মজুরও নিয়ে এলেন। গভীর জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করা এক দুঃসাধ্য কাজ। অসংখ্য বিরাট বিরাট গাছ, তার নীচে ঘন ঝোপঝাড়। তার উপর আছে জংলীদের বারবার আক্রমণ। অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমে ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার চ্যাথাম দ্বীপে ছোট্ট একটি কলোনী গড়ে তুললেন। স্থানীয় জঙ্গল থেকে বাঁশ ও কাঠ কেটে ছোট ছোট ঝোপড়ি তৈরী হল। রেশন রাখবার জন্য একটি গুদাম ঘর এবং পানীয় জল রাখবার জন্য একটি রিজারভরও তৈরী হল। চ্যাথামে কিছু বাড়ীঘর তৈরী করে ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার এবার নজর দিলেন তার পাশের দ্বীপটির দিকে। আন্দামানীরা বেশীর ভাগ এই দ্বীপেই বাস করত। কাজেই জঙ্গল পরিষ্কার করা বা বাড়ী-ঘর তৈরী করার কাজটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াল। প্রচণ্ড আক্রোশ

নিয়ে আন্দামানীরা প্রাণপণে বাধা দিতে লাগল। অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আন্দামানীদের হটিয়ে কিছু ঝোপড়ি তৈরী হল। কোম্পানীকে জানান হলে কলকাতা থেকে কয়েদীরা দলে দলে আসতে লাগল। জন্ম হল প্রথম কয়েদী উপনিবেশের।

সমস্ত চ্যাথাম দ্বীপটি জুড়ে নানারকম তরিতরকারি ও কিছু নারকেল গাছ লাগানো হল, ফল পাওয়া গেল আশাতীত ভাবে। আদিবাসীরা প্রথম দিকে যত আক্রমণ চালিয়েছিল ধীরে ধীরে তা কমে আসতে লাগল, তারা বিদেশীদের আওতা থেকে আরও দূরে গভীর জংগলের মধ্যে চলে গেল। এই সময় কলকাতা থেকে অনেকে স্বাধীন ভাবেও বসবাস করতে এলেন। ক্যাপ্টেন ব্লেয়ারের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিন বছরেই এই ছোট্ট কলোনীটি সব দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করল। এখানকার রসদ আসত কলকাতা ও পেনাঙ থেকে।

এই সময় লর্ড কর্ণওয়ালিসের ভাই কমোডোর কর্ণওয়ালিস সেটল্‌মেণ্টটি পরিদর্শন করতে এলেন। গভর্ণর জেনারেলের নামে উপনিবেশটির নাম রাখা হল 'পোর্ট কর্ণওয়ালিস।'

কমোডোরের সঙ্গে নতুন করে দ্বীপগুলি আব একবার জরিপ করার সময় দেখা গেল উত্তর আন্দামানে যে বন্দরটি আছে, পোতাশ্রয়ের পক্ষে সেটি বেশী উপযোগী এবং খুব চওড়া হওয়ায় অনেক জাহাজ একসঙ্গে নোঙর করার সুবিধা। তা ছাড়া কলকাতার থেকেও অনেক কাছে। নৌ ঘাঁটি খোলার পক্ষে বন্দরটি অতুলনীয়। কোম্পানীর কাছে আবার রিপোর্ট গেল। এদিকে ক্যাপ্টেন ব্লেয়ারের উপনিবেশটি যখন অনেক উন্নতি লাভ করেছে সেই সময় কোম্পানী থেকে আদেশ এল সমস্ত সেটল্‌মেণ্ট উঠিয়ে উত্তর আন্দামানে নিয়ে যাবার জন্য।

আবার ভাঙো সব। নিয়ে চল নতুন দ্বীপে, দক্ষিণ সীমান্ত থেকে একেবারে উত্তর সীমান্তে। উত্তর আন্দামানে 'এরিয়েল বে'র সামনে একটি দ্বীপে আবার নতুন করে নতুন উদ্যমে সুরু হল

উপনিবেশ গঠনের কাজ। অরণ্য পরিষ্কার করা হল, জমি জরিপ করা হল, ঝোপড়ি তৈরী হল। জলেরও কোন অসুবিধা হল না, পাহাড়ের গায়ে প্রচুর ঝর্ণা, তাতে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জল। মোটামুটি ভাবে কিছু ঝোপড়ি তৈরী হলে ক্যাপ্টেন কিড্ কলকাতা থেকে দু'শ জন দুর্ধর্ষ কয়েদী নিয়ে এলেন। ক্রমে ক্রমে জীবিকার সন্ধানেও অনেকে আসতে সুরু করল। নতুন ক'রে এই উপনিবেশটির নাম রাখা হ'ল 'পোর্ট কর্ণওয়ালিস' আর ছেড়ে আসা উপনিবেশটির নাম রাখা হল 'ওল্ড হারবার'।

এই সময় বম্বে গভর্ণমেণ্ট পাঁচজন ইয়োরোপীয় কয়েদীকে এখানে পাঠাতে চাইলেন। এখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার লিখে পাঠালেন, ইয়োরোপীয়দের পক্ষে এ জায়গা মোটেই উপোযোগী নয়; কাজেই তাদের এখানে পাঠানো উচিত নয়। সেই থেকে এই নিয়ম হয়ে গেল কোনদিন কোন ইয়োরোপীয় কয়েদীকে আন্দামানে দ্বীপান্তরে পাঠানো হবে না।

ক্যাপ্টেন ব্লেয়ারের পর ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার কিড্ ১৭৯৩ সালে নতুন সেট্‌লমেণ্টের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ক্যাপ্টেন কিড্ এসেই লক্ষ্য করলেন জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজে যেসব শ্রমিকরা নিযুক্ত তারা বেশীর ভাগই রুগ্ন এবং অশক্ত। বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপের সব মানুষই অসুস্থ হয়ে পড়ল। ক্যাপ্টেন কিড্ ভাবলেন সেট্‌ল্‌মেণ্টের চারিদিকের ঘন জঙ্গলই হয়ত অসুস্থতার কারণ। এবং তিনি মনে মনে স্থির করলেন যত সত্বর সম্ভব জঙ্গল পরিষ্কার করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বৎসর খানেকের মধ্যেই নানারকম চর্মরোগ ও জঙ্গলের পোকার কামড়ে অনেক লোক মারা গেল। এ ছাড়া ম্যালেরিয়া মহামারী রূপে দেখা দিল। দিন দিন অসংখ্য লোক মারা যেতে লাগল।

পোর্ট কর্ণওয়ালিসের খবর যখন কলকাতা পৌঁছাল গভর্ণর জেনারেল ক্যাপ্টেন কিডকে জানাতে লিখলেন, আন্দামানে সেট্‌ল্-

মেণ্ট রাখা সম্ভব কিনা। ক্যাপ্টেন কিড জানালেন, "আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ভৌগোলিক অবস্থিতি আদর্শস্থানীয়। কোম্পানীর আন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার খুব সুবিধা এবং যুদ্ধের সময় এখান থেকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা খুব সহজ। অসুবিধা হল এর জলহাওয়া। এত স্যাঁতস্যেঁতে আবহাওয়া সহ্য করা অসম্ভব। আদিবাসীরা মোটেও বন্ধুভাবাপন্ন নয়, তা ছাড়া সমস্ত রেশনের জন্য অন্য দেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। সেট্‌ল্‌মেণ্ট চালানো অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ।"

কিডের রিপোর্ট পেয়ে গভর্ণর জেনারেলের আদেশে আন্দামানের সেট্‌ল্‌মেণ্ট তুলে দেওয়া হল।

"Considering the great sickness and mortality of the settlement formed at the Andamans which it is feared is likely to continue, and the great expense and embarrassment to Government in maintaining it and in conveying to its supplies, at the present period it appears to the Governor General in Council, both with a view to humanity and economy to withdraw it."

জাহাজ ভরে কয়েদীদের সব প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌ দ্বীপে এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিকদের কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই সময় এখানে আড়াইশ' কয়েদী, পাঁচশ' স্বাধীন বাঙ্গালী বাসিন্দা এবং বহুসংখ্যক সৈন্য ছিল। ১৭৯৬ সালে ক্যাপ্টেন ব্লেয়ারের রক্ত-জল-করা পরিশ্রমের ফল আন্দামানের পেনাল সেট্‌ল্‌মেণ্ট পরিণত হল পরিত্যক্ত এক জনহীন দ্বীপে।

দ্বীপগুলি থেকে উপনিবেশ উঠিয়ে নিলেও ইংরেজরা নিশ্চিন্ত মনে চলে যেতে পারল না। মনে আশঙ্কা অন্য কোন দেশের লোক এসে এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার না করে। উপনিবেশ না

গড়তে পারলেও প্রাণ ধরে এই দ্বীপপুঞ্জ কাউকে দিয়ে দেওয়া যায় না।

এরপর ৬০ বছর পর্যন্ত আন্দামানের কোন খবর কেউ না পেলেও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট একটি করে জাহাজ বরাবর রেখে গিয়েছে টহল দেবার জন্য। অন্ততঃ বাইরের জগতের লোক যাতে জানতে পারে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ওপর একমাত্র অধিকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই।

মনে মনে অনেকের লোভ থাকলেও বিশেষ কেউ আর এগিয়ে আসেনি। পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের আন্দামানের ওপর লোভ থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাদের কোন চেষ্টাও সফল হয়নি।

এদিকে আন্দামানের কাছে তুই একটি তুর্ঘটনার খবর মাঝে মাঝে পাওয়া যেতে লাগল।

১৮২৪ সনে প্রথম বর্মা যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ নৌবহর আন্দামানে পোর্ট কর্ণওয়ালিসের কাছে এসে নোঙর করেছিল। সেই সময় আন্দামানীরা তাদের সর্বরকমে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

১৮৩৯ সনে রাশিয়ান জিওলোজিস্ট মিঃ হেলফার আন্দামানীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

বারই আগস্ট ১৮৪৪ সন। ইংরেজ জাহাজ 'ব্রিটন' এক হাজার যাত্রী নিয়ে রওনা হল সিডনি থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে। যাত্রার প্রথম থেকেই সমুদ্রের অবস্থা ভাল ছিল না। প্রবল বাতাস ও অশান্ত ঢেউএর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ব্রিটন চলতে লাগল। পথে উঠল তুমুল ঝড়। সকাল থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল; সন্ধ্যার দিকে চারিদিক কালো হয়ে এল। কোথায় এসেছে বোঝবার উপায় নেই। দশ গজ দূরের জিনিসও দেখা যায় না, এত কুয়াশা। ক্রমেই বঙ্গোপসাগরের জলরাশি উত্তাল হয়ে উঠল। রাত্রি হয়ে যাওয়ায় গভীর অন্ধকার—এত অন্ধকার যে নিজের হাতটাও দেখা যায় না। কোন্‌দিকে যে জাহাজ যাচ্ছে জানবার কোন উপায়ই

নেই। নাবিকরা প্রমাদ গণল। জাহাজ যদি আন্দামানের দিকে যায় তবে আর রক্ষা নেই। তারা প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল আন্দামানকে এড়িয়ে যাবার। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। দুর্দান্ত ঝড়ের বেগে জাহাজ মোচার খোলার মত ভাসতে ভাসতে আন্দামানের দিকে এগিয়ে চলল। যাত্রীরা অত্যন্ত ভয় পেয়ে যাওয়ায় ক্যাপ্টেন সকলকে আদেশ দিলেন নিজেব নিজের কেবিনে গিয়ে ভগবানের নাম করতে। অন্ধকার—নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। জাহাজেও কোন আলো নেই, বাইরেও কোন আলো নেই। সকলেই মরণের প্রতীক্ষা কবছে এমন সময় হঠাৎ প্রবল ধাক্কায় জাহাজটি টলে উঠল আব সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে সমুদ্র যেন আছড়ে ফেলে দিল এক পাহাড়ের পায়ে। সমস্ত জাহাজ জুড়ে উঠল আর্ত চীৎকার। এইবার নিশ্চিত সলিল সমাধি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও জাহাজ কিন্তু ডুবল না। কোথায় এল তাও বোঝা গেল না। সবাই ভোরের আলোর অপেক্ষা করতে লাগল। ভোর হল। সকলে বাইরে এসে দেখল একটি অতি সুন্দর দ্বীপের গায়ে ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে জাহাজটি আটকে রয়েছে। ডাঙ্গার গাছগুলি তাদের অসংখ্য শাখাপ্রশাখা দিয়ে যেন পরমযত্নে তাকে আগলে রয়েছে।

যাত্রীরা তীরে নামবার জন্য তৈরী, এমন সময় দেখা গেল গাছের আড়াল থেকে ভীষণদর্শন উলঙ্গ কতকগুলি আদিবাসী তীর ধনুক হাতে সন্তর্পণে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। চীৎকার করে রুমাল নেড়ে যাত্রীরা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করল তারা শত্রু নয়, বন্ধু। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না, নিরাশ হয়ে সকলে তীরে নামবার আশা ত্যাগ করল। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে যাত্রীরা দেখল কিছু দূরে প্রায় তাদেরই মত অবস্থায় আর একটি জাহাজও সেই দ্বীপে আটকে রয়েছে। সেই জাহাজটি ছিল আর একটি ইংরেজ জাহাজ 'রানিমিড'। যাচ্ছিল 'গ্রেভসেণ্ড' থেকে কলকাতায়। একই সময় জাহাজ দুটি রওনা দিয়েছিল বিভিন্ন

বন্দর থেকে। ভাগ্যচক্রে একই সময়ে সাইক্লোনে পড়ে একই জায়গায় এসে আটকে পড়েছে। এই অদ্ভুত পরিবেশে দুই জাহাজের যাত্রীরা পরস্পরকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল।

তীরে নেমে যে সকলে সকসঙ্গে হবে তারও উপায় নেই। জলে সাঁতার দিয়ে এ জাহাজ থেকে ও জাহাজে সকলে মেলামেশা করতে লাগল।

সাইক্লোন শেষ হলে যাত্রীরা চিন্তা করতে লাগল ফিরে যাবার কি উপায় করা যায়। জাহাজের যা অবস্থা তা মেরামত করার কোন উপায় নেই। রসদ যা ছিল তা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। পানীয় জলের জন্য দ্বীপে নামলে হয়ত একটা উপায় হয় কিন্তু তার চেষ্টাই বা কি করে করবে। বহুদিন কোন জাহাজ সে পথ দিয়ে যেতে দেখা গেল না। অনেক ভেবে দুই জাহাজের ভাঙ্গাচোরা মালমসলা দিয়ে একটি নৌকা তৈরী করল নাবিকরা তারপর কয়েকজন সেই নৌকা চড়ে কলকাতা রওনা দিল। অনেক বিপদ-আপদ ঝড়-তুফান পার হয়ে সাতাশ দিন পর নৌকাটি এসে কলকাতা পৌছাল। নাবিকদের কাছে জাহাজডুবির খবর পেয়ে কর্তৃপক্ষ আন্দামানের উদ্দেশ্যে একটি জাহাজ পাঠালেন। এই জাহাজ যখন এসে পৌছাল তখন অর্ধেক লোকেরই অনাহারে এবং রোগে মৃতপ্রায় অবস্থা।

জাহাজ দুটি যতদিন আন্দামানে ছিল আন্দামানীরা বারবার আক্রমণ করে তাদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল।

এই সব দুর্ঘটনার কথা বাদ দিলেও জলদস্যুর হাতে বছর বছর বহু নাবিক ও লোকজন মারা পড়তে লাগল। কাজেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিছুদিন ধরেই আন্দামানে নূতন করে আবার একটি সেট্‌ল্‌মেণ্ট ও নৌঘাঁটি খোলবার কথা চিন্তা করছিলেন। এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য কোম্পানীর পরিকল্পনা দ্রুতগতিতে কার্যকরী হবার পথে এগিয়ে গেল।

আঠারশ' সাতান্ন সন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের

ইতিহাসের এক স্মরণীয় বছর। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব। কোম্পানীর স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারে সারা দেশ জুড়ে ধূমায়িত হয়ে উঠেছে অসন্তোষের আগুন। দেশের জমিদার তালুকদারদের গদিচ্যুত করে, অপুত্রক রাজাদের রাজ্য কেড়ে নিয়ে, তাঁদের খেতাব কেড়ে নিয়ে, পেনসন থেকে বঞ্চিত করে আগে থেকেই কোম্পানী দেশের লোককে তাদের বিরুদ্ধে বিরূপ করে তুলেছিল। তার উপর দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, সতীদাহ বন্ধ করা, বিধবা বিবাহ চালু করা, মিশনারীদের ধর্ম প্রচার করা সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের মনে এই আতঙ্কের সৃষ্টি হল যে ইংরেজ এবার তাদের খ্রীষ্টান করতে বদ্ধ পরিকর হয়েছে।

এছাড়া সিপাহীদের মধ্যেও দারুণ অসন্তোষ ঘনিয়ে এল। দেশী সৈন্যদের দূর দূরান্তে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান, সমুদ্র যাত্রায় তাদের আপত্তি, পদোন্নতির ব্যাপারে নিয়মকানুনের শিথিলতা এবং পক্ষপাতিত্ব সিপাহীদের ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। এই ভাবেই তৈরী হয়েছিল ভারতব্যাপী বিদ্রোহের পটভূমিকা। সর্বশেষ কার্তুজে শূয়োর ও গরুর চর্বি মাখিয়ে হিন্দু মুসলমানের ধর্ম নষ্ট করা হচ্ছে এই বিশ্বাসে বিদ্রোহের আগুন ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। গদিচ্যুত সামন্তরা সকলে এই বিদ্রোহে যোগদান করল। তাদের সঙ্গে আরও যোগ দিল দেশের অগণিত লাঞ্ছিত, শোষিত বঞ্চিত মানুষের দল।

প্রথম বিদ্রোহ সুরু হল ব্যারাকপুরের সেনানিবাসে ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ। ক্রমে মীরাট, আম্বালা, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, কানপুর, আগ্রা, ঝাঁসী, মধ্যভারত, বুন্দেলখণ্ড, দিল্লী সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। এমন যে একটা ঘটনা ঘটতে পারে তা কোম্পানীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

সর্বত্রই সিপাহীরা দল বেঁধে ইয়োরোপীয়দের আক্রমণ করল। উন্মত্তের মত তাদের বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দিল, ইংরেজদের হত্যা করল।

জেলখানা ভেঙ্গে কয়েদীদের মুক্ত করে তারপর অন্য সহরে যাত্রা করল। এই ভাবে একের পর এক সহরে সিপাহীরা চালাতে লাগল ধ্বংসলীলা। রাস্তায় ঘাটে বইল রক্তের স্রোত। বিপন্ন ইংরেজ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল। ইংরেজের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়ার উপক্রম। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য। সমস্ত দেশ জুড়ে যে প্রচণ্ড শক্তি ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, যে আশা, উদ্দীপনা. উৎসাহ নিয়ে সিপাহীরা প্রথম সংগ্রাম সুরু করেছিল, যোগ্য নেতার অনুপস্থিতি এবং বহু দেশীয় রাজার সহযোগিতার অভাবের জন্য এবং সর্বোপরি বিদ্রোহ দমনে দেশের লোকেদের ইংরেজদের সাহায্য করার জন্য সিপাহীদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। ভাগ্যদেবীর সহায়তায় সমস্ত বিদ্রোহ দমন করে ইংরেজরা আবার বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

এখন কোম্পানীর চিন্তা হল এই সব বিদ্রোহীদের নিয়ে। এই বিপজ্জনক লোকগুলিকে কোথায় পাঠান যায়? এমন জায়গায় পাঠানো প্রয়োজন, জীবনে যাতে সেখান থেকে ফিরে আসতে না পারে। কাজেই এর উপযুক্ত স্থান হিসাবে আন্দামানের কথাই তাদের মনে হল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অনেক ভেবেচিন্তে ডক্টর এফ.জে. মট্-এর নেতৃত্বে এক কমিশন পাঠালেন আন্দামানে। কমিশনে ছিলেন ডক্টর জি. প্লেফেয়ার লেফটেনাণ্ট হীদকোট এবং ডাঃ মট্ স্বয়ং।

নূতন করে কয়েদী উপনিবেশের জন্য স্থান নির্বাচন করতে ডাঃ মট্ এবং তাঁর সঙ্গীরা কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে মৌলমেন হয়ে আন্দামানের দিকে পাড়ি দিলেন। সঙ্গে কিছু বর্মী কয়েদী ও প্রহরী নিলেন।

আন্দামানের বহু দ্বীপ ঘুরে শেষে তাঁরা 'ওল্ড হারবার' এসে পৌছলেন। ক্যাপ্টেন ব্লেয়ারের পরিত্যক্ত সেট্‌লমেণ্টটি পরীক্ষা করে এবং সব ঘুরে দেখে এই জায়গাটিকেই মনোনীত করলেন। ডাঃ মট্

তাঁদের মতামত কোম্পানীকে লিখে পাঠালেন এবং প্রস্তাব করে পাঠালেন ক্যাপ্টেন ব্লেয়ারের সম্মানার্থে 'ওল্ড হারবারের' নাম দেওয়া হোক 'পোর্ট ব্লেয়ার'।

কোম্পানী এই রিপোর্ট পেয়ে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ক্যাপ্টেন এইচ. ম্যান (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ কনভিক্ট্স্, মৌলমেন)-কে আদেশ পাঠালেন যে তিনি অবিলম্বে আন্দামানের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং পোর্টব্লেয়ারে গিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ থেকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলন করুন।

ক্যাপ্টেন ম্যান পোর্টব্লেয়ারে এসেই উপনিবেশের প্রাথমিক বন্দোবস্তের কাজে ব্যস্ত হলেন। প্রথমেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাড়ী ও ইয়োরোপীয় প্রহরীদের জন্য ব্যারাক তৈরীর কাজ সুরু হল। আন্দামানের আবহাওয়া বর্মা দেশের অনুরূপ হওয়ায় কোম্পানী আদেশ দিলেন, বাড়ীগুলি যেন বর্মাদেশের ধরনে উঁচু মাচানের ওপর তৈরী হয়। প্রথম দিকে বর্মী কয়েদীরা জঙ্গল পরিষ্কার করে দিতে লাগল, পরে ভারতীয় কয়েদীরাই সব কাজকর্ম করবে বলে স্থির হল।

১৮৫৮ সনে দুশ' জন কয়েদী, চারজন ওভারসিয়ার দুজন ডাক্তার ও পঞ্চাশজন নৌ-সেনা নিয়ে ১০ই মার্চ ডাঃ জেম্স্ প্যাটিসন ওয়াকার এসে পৌঁছলেন পোর্ট ব্লেয়ারে। দ্বিতীয় বার কয়েদী উপনিবেশের পত্তন হল।

বর্তমানে ফিরে আসা যাক। পোর্টব্লেয়ার সহর দেখে আমরা ভারী খুশী হলাম। পাহাড় ও সমুদ্রের অপরূপ সমন্বয়; তার উপর সবুজের রাজ্য। গেস্ট হাউসটি 'হ্যাডো' অঞ্চলে। সহরে ঢোকার আগেই হ্যাডো। খুব কম বাড়ীঘর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অঞ্চলটি। হ্যাডো থেকে বেশ খানিকটা দূরে বাজার হাট। ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার

যখন প্রথম উপনিবেশ গঠন করেন, এই হ্যাডো অঞ্চলেই নাকি আদিবাসীরা সংখ্যায় ছিল সর্বাধিক। তারা সাধ্যমত বিদেশীদের বাধা দিয়েছিল। তারও অনেক পরে আন্দামানীদের বশ করার জন্য সরকার থেকে যে 'আন্দামান হোম' তৈরী হয়েছিল তার সব চেয়ে বড় শাখাটি ছিল হ্যাডোতেই। এখন অবশ্য সে হোমের কোন চিহ্নই নেই। গেস্ট হাউসটি আমাদের খুব পছন্দ হল। উঁচু মাচানের উপর কাঠের বাড়ী, ঠিক বড় রাস্তার ধারে। বিরাট বিরাট ঘর, সামনে পেছনে কাঁচঢাকা বারান্দা, সামনে ফুলের বাগান। রাস্তার উল্টো দিকেই উঠে গিয়েছে বেশ উঁচু একটি পাহাড়, তার গায়ে 'আবহাওয়া দপ্তর'।

আমরা যে সময় পোর্টব্লেয়ারে এলাম সেই সময় এখানকার চীফ কমিশনার মিঃ এম. ভি. রাজোয়াদে বদলী হয়ে চলে যাচ্ছিলেন। চীফ কমিশনারই আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্বময় কর্তা, সর্বপ্রকার দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী। চীফ কমিশনারের অপ্রতিহত ক্ষমতা, একচ্ছত্র আধিপত্য। তিনি রাজচক্রবর্তী, রাজাধিরাজ।

এ হেন প্রবল প্রতাপান্বিত চীফ কমিশনারের বিদায় উপলক্ষে সে সময় এখানে 'ফেয়ারওয়েল পার্টির' প্রতিযোগিতা চলছিল। লাঞ্চ, টি, ডিনার, ব্রেকফাস্ট কোনটাই বাদ নেই। আরম্ভ হয়েছিল মাসখানেক আগে থেকেই, শেষের দিকে এসে আমরাও সেই পার্টির হিড়িকে ভেসে চললাম। পোর্টব্লেয়ারে আমাদের জাহাজ পৌঁছাল বেলা ৪টের সময়, পাঁচটা থেকে সুরু হল পার্টিতে যোগ দেওয়া। চেনা নেই, শোনা নেই, অচেনা লোকের নিমন্ত্রণে অচেনা পরিবেশে নিতান্ত অস্বস্তিকর অবস্থা। এক নাগাড়ে বার দিন আর বাড়ীর ভাত খেতে হয়নি। মেয়েরা অভিযোগ করে তারা একলা থাকে আর আমরা বাইরে নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়াই। কিন্তু কি করা! দুই এক জায়গায় পাশ কাটাতে চাইলে কেউ কেউ বললেন, 'এমন

কাজও করবেন না। বদনাম রটে যাবে যে নূতন পি. ই. সাহেব লোক সমাজে মিশতে চায় না।'

যাই হোক শেষ পর্যন্ত চীফ কমিশনারের বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এল। আন্দামানে এক চীফ কমিশনার উপস্থিত থাকতে অন্য চীফ কমিশনার পদার্পণ করতে পারেন না। বহুকাল থেকেই এই অলিখিত আইন চলে আসছে। এদিকে মাদ্রাজ থেকে এম. ভি. নিকোবর জাহাজে নূতন চীফ কমিশনার পাঁচছয় দিনেব মধ্যেই এসে পোঁছাবেন। তাই মিঃ রাজোয়াদে ডিফেন্স মিনিস্ট্রি থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে নিকোবর থেকে আই. এ. এফ. প্লেন আনিয়ে তারপর কলকাতা ফিরে গেলেন।

আমরা পোর্টব্লেয়ারে এলাম ৬ই জানুয়ারী, মিঃ রাজোয়াদে গেলেন ১৭ই জানুয়ারী এবং নূতন চীফ কমিশনার মিঃ বি. এন. মহেশ্বরী এলেন ২১শে জানুয়ারী।

সেদিনও জাহাজঘাটে আন্দামানের বড়কর্তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিপুল জনসমাবেশ। সরকারী অফিসারদের আগেই জানানো হয়েছিল তাঁরা যেন চ্যাথাম জেটি থেকে পরে অন্নপূর্ণা কাফেটেরিয়ার উপর তলায় উপস্থিত থাকেন।

সকলে দারুণ কৌতূহল ও ঔৎসুক্য নিয়ে জেটিতে হাজির। নূতন চীফ কমিশনার এসে পৌছাবার আগেই তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প চালু হয়েছিল। এইটাই পোর্টব্লেয়ারের বিশেষত্ব। নূতন চীফ কমিশনার কেমন দেখতে, কেমন আধুনিক, কেমন লোক জানবার জন্য সকলের প্রবল আগ্রহ। প্রাক্তন চীফ কমিশনারের সঙ্গে বর্তমান চীফ কমিশনারের একটা তুলনামূলক সমালোচনা করবার জন্য সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল।

জাহাজ ভিড়লে নূতন চীফ কমিশনার শ্রীযুক্ত বি. এন. মহেশ্বরী ও শ্রীমতী মহেশ্বরী হাসিমুখে দুইপাশে দাঁড়ান জনতাকে নমস্কার করতে করতে গ্যাংওয়ে দিয়ে নেমে এলেন। 'গার্ড অফ অনার'

দেওয়া হলে তাঁদের অন্নপূর্ণা কাফেটেরিয়াতে নিয়ে যাওয়া হল। সরকারী অফিসার এবং সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি আগেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ডেপুটী কমিশনার মিঃ হালভে সকলের সঙ্গে চীফ কমিশনারের পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথম দর্শনে সকলেই হতাশ হলেন। বড্ড বেশী সাদাসিধে দেখতে। না ডাঁট, না ঠাট। তবে মানুষ যে বেশ ভাল সেটা অল্প পরিচয়েই সকলের মনে হল।

মিঃ মহেশ্বরী আসবার পরই আন্দামান সম্বন্ধে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে কাজে লাগলেন। ইনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি জনসাধারণের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করতে এবং তাদের অভিযোগ শুনতে দিনে একঘণ্টা করে সময় বরাদ্দ করলেন। এর আগে সাধারণ লোকের পক্ষে চীফ কমিশনার পর্যন্ত পৌছান ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার।

প্রায় দিন পনের গেস্ট হাউসে থাকবার পর আমরা আমাদের বাংলোতে চলে এলাম। নতুন বাড়ী, সাজিয়ে গুছিয়ে বসতে বেশ সময় লাগল। চমৎকার বাড়ীগুলি, কাঠের তৈরী। এদেশের মাটিতে ইঁট তৈরী হয় না, তাছাড়া আন্দামানের জঙ্গলে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায় বলে বসতবাড়ী থেকে অফিস আদালত পর্যন্ত সবই কাঠের বাড়ী। কাঠের বাড়ীর আর একটি কারণ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ Sismic Zone-এ পড়ায় প্রায়ই ভূকম্পন টের পাওয়া যায়। বাংলোগুলি খুব বড় এবং সঙ্গে বিরাট বাগান। ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশ থেকে এখানে বদলী হয়ে এলে সবচেয়ে আনন্দ হয় এত বড় বাড়ী পেয়ে। তার ওপর ভাড়া দিতে হয় না, সোনায় সোহাগা। বাড়ীর সংগে গ্যারাজ। সরকারী বাড়ী, সরকারী গাড়ী, সরকারী ড্রাইভার, মালি, পিওন, চৌকিদার সব মিলিয়ে বেশ একটা রাজসিক বন্দোবস্ত।

আমাদের বাংলোটা হ্যাডোতে, নাম 'হ্যাডা ভিলা'। বিরাট দোতলা কাঠের বাড়ী, সামনে পেছনে কাঁচঢাকা বারান্দা। সামনের বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায় ধূ ধূ করছে সমুদ্র। কলকাতা থেকে

জাহাজ এলে বহুদূর থেকে দেখা যায়। পেছন দিকে শোবার ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যায় ছোট্ট একটি উপত্যকা, তারই মাঝে খাঁজ কেটে কেটে ধানের চাষ করা হয়েছে। তার নীচে একটি খাড়ি এবং খাড়ির পরেই চলে গিয়েছে বহুদূর পর্যন্ত ঘন নিবদ্ধ পাহাড়ের শ্রেণী। বাংলোটির সামনে একটি লন এবং ফুলের বাগান। দুই পাশে এবং পেছনে বিরাট ফলের বাগান। আম, কলা, পেঁপে, আতা, পেয়ারা, সবেদা, সুপুরি, নারকেল কিছুরই অভাব নেই সে বাগানে। সত্যি কথা বলতে কি, এ বাংলোটির প্রধান আকর্ষণ হল এর বাগান। হাজী সুভান আলি নামে এক মুসলমান ভদ্রলোক তাঁর নিজের থাকবার জন্য এ বাড়ী ও বাগান তৈরী করেছিলেন। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পুনর্দখলের পর রাজনৈতিক কারণে সরকারের আদেশে সুভান আলিকে পোর্টব্লেয়ার ত্যাগ করে যেতে হয়। যাবার সময় 'হ্যাডো ভিলা' তিনি সরকারকে বিক্রী করে দিয়ে যান।

গেস্ট হাউসে থাকবার সময় সেখানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। অ্যান্থ্রোপোলোজিক্যাল অফিসার, নাম শ্রীপ্রকাশ রাও। বেশ কয়েক বছর হল আন্দামানে আছেন। আমার মেয়েরা সব সময় সেই ভদ্রলোকের কাছে বসে চোখ বড় বড় করে জংলীদের গল্প শুনত। একদিন আমিও গিয়ে সেখানে যোগ দিলাম। গিয়ে দেখি আন্দামানের আদিবাসীদের সম্বন্ধে বিশেষ করে জারোয়াদের সম্বন্ধে কত রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণী দিয়ে যাচ্ছেন নৃতত্ত্ববিদ্ ভদ্রলোকটি। জারোয়াদের বিষয়ে যা শুনলাম তাতে রীতিমত হৃৎকম্প উপস্থিত হল। এখানে মানুষের প্রধান বিভীষিকা হল জারোয়া। এমন কি অন্য আদিবাসী অর্থাৎ ওঙ্গি আন্দামানীরাও জারোয়াকে ভয় করে। জারোয়াদের দেশে থাকতে হবে বলে মনে ভয় ঢুকে গেল। নানারকম প্রশ্ন করায় আমার আগ্রহ দেখে প্রকাশ রাও আন্দামান সম্বন্ধে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য বই দিলেন।

ক্রমে ক্রমে পোর্টব্লেয়ারের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতে লাগল।

অনেকের সঙ্গে পার্টির মারফত আলাপ হয়েছিল, অনেকের সঙ্গে নূতন করে আলাপ হ'ল। একদিন আমরা গেলাম গভর্ণমেণ্ট হাউসে। এখানে চীফ কমিশনারের বাড়ীকে বলে গভর্ণমেণ্ট হাউস। সেখানে গিয়ে ডাঃ কর্ণওয়াল ও ডাঃ পাণিগ্রাহীর সঙ্গে দেখা। গুপ্ত সাহেবকে দেখেই ডাঃ কর্ণওয়াল বললেন, "দেখ পাণিগ্রাহী, তোমাদের এই বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলে তুমি নাকি বাঙ্গালী নও।" গুপ্ত সাহেব তো অপ্রস্তুতের একশেষ। আমতা আমতা করে উনি বললেন, "প্রায় সে রকমই, আমি ভেবেছি আপনি হয়ত মেদিনীপুরের লোক।" ডাঃ পাণিগ্রাহী বললেন, তাঁর বাড়ী মেদিনীপুরে।

ফেরবার সময় ডাঃ পাণিগ্রাহীকে নিয়ে আমরা তাঁর বাড়ী গেলাম। সেখানে গিয়ে কথায় কথায় মিসেস পাণিগ্রাহী বললেন, তাঁর বাবা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার, নাম মিঃ পাণ্ডা। অন্যমনস্ক গুপ্তসাহেব বললেন, 'কোথায়? কটকে?" আবার অপ্রস্তুতের পালা। ডাঃ পাণিগ্রাহী জবাব দিলেন, "না, কলকাতায়। আরে মশাই, আমরা উড়িয়া নই, বাঙ্গালী, বাঙ্গালী।"

হাসপাতালের কাছাকাছি অ্যাটলাণ্টা পয়েণ্টে ডাক্তারদের সব বাড়িগুলি। বাজার থেকে বেশ উঁচু একটা চড়াই উঠে অ্যাটলাণ্টা পয়েণ্ট।

পোর্টব্লেয়ারের আশেপাশের জায়গাগুলি প্রায় দেখা হয়ে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। কারণ চীফ কমিশনার চলে যাচ্ছিলেন বলে বহু প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্থাপনও হচ্ছিল আবার বহু প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উৎসবও চলছিল। কাজেই সেই সব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সহরের ভেতরে বাইরে সব জায়গাতেই ছুটাছুটি করতে হচ্ছিল। এত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। অন্ধ্রদেশে বিশাখাপত্তনেও সমুদ্র ও পাহাড়ের সমাবেশ আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আন্দামানের অনেক পার্থক্য। অন্ধ্র দেশের পাহাড়গুলি রুক্ষ, নিরাভরণ, বৃক্ষলতাহীন আর আন্দামানের পাহাড় অরণ্য সমাকীর্ণ,

লতাগুল্ম ভরা, জঙ্গল ঘেরা দুর্গম। পাহাড়ের মাঝে আঝে আছে অসংখ্য খাড়ি। খাড়ির মধ্যে মোটরবোটে ঘোরবার সময় মনে হয় সুন্দরবনে এসে পড়েছি। তেমনি দুইপাশের ম্যানগ্রোভের জঙ্গল জলের প্রান্ত পর্যন্ত নেমে এসেছে, যতদূর দৃষ্টি যায় এঁকে বেঁকে ক্রীকগুলি দূর দূরান্তে চলে গিয়েছে। খাড়ির জল টলটলে নীলচে সবুজ। আবার পাহাড়ী পথে যাবার সময় এক এক সময় মনে হয় রাঁচী হাজারিবাগের ঘাট রোড দিয়ে চলেছি।

নতুন দেশ, নামহীন তার সব অঞ্চল। কাজেই উপনিবেশ গঠনের প্রথম থেকে কর্তাব্যক্তিরা যাঁরাই এখানে এসেছেন তাঁদের নামানুসারে এক এক জায়গার নামকরণ করেছেন। আবার নিজেদের দেশের থেকেও অনেক অঞ্চলের নাম রেখেছেন। এ ছাড়া সিপাহী বিদ্রোহ দমনে যে সব ইংরেজ জেনারেল সাহায্য করেছিলেন তাঁদের স্মৃতিরক্ষার্থে এক একটি দ্বীপের নামকরণ হয়েছে। যেমন হ্যাভলক দ্বীপ, সার হিউরোজ দ্বীপ, সার জন লরেন্স দ্বীপ,সার হেনরী লরেন্স দ্বীপ, নীল দ্বীপ এবং পোর্ট ক্যাম্বেল।

এবারডীন বাজার পোর্টব্লেয়ারের চৌরঙ্গী, সব চেয়ে জনবহুল ও যানবহুল অঞ্চল। নামটি কিন্তু ভারী অভিজাত। স্কটল্যাণ্ডের একটি বড় সহর এবারডিন, তার থেকে সহবের কেন্দ্রস্থলের নাম রাখা হয়েছে এবারডিন বাজার ও তার পাশেই এবারডিন বস্তি বা বসতি। এবারডিনের কথায় মনে এল এইখানেই সেট্‌লমেণ্টের সব চেয়ে বড় সংঘর্ষ বেধেছিল আন্দামানীদের সঙ্গে বিদেশীদের।

ডাঃ জেমস্ প্যাটিসন ওয়াকার এলেন পোর্টব্লেয়ারে কয়েদী উপনিবেশের প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেট হয়ে। তিনি এসেই লাগিয়ে দিলেন কয়েদীদের জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজে। আন্দামানের জঙ্গল যাঁরা দেখেননি তাঁরা কল্পনা করতে পারবেন না কত গভীর এখানকার অরণ্য। কয়েদীরা জঙ্গল পরিষ্কার করতে আরম্ভ করল। কিন্তু সে কি সহজ কাজ? হাজার হাজার বছর ধরে যে অরণ্য

এখানে রাজত্ব করছে, যার বনস্পতির মূল উপমূল আন্দামানের মাটির তলায় শিরা উপশিরার মত জড়িয়ে রেয়েছে, সামান্য কুড়লের ঘায়ে তাকে কাবু করা কি এতই সহজ? অসংখ্য গাছ, তাতে অসংখ্য লতাপাতা ঝোপঝাড়। যার ভিতরে সূর্যের আলো ঢুকতে ভয় পায়, মানুষ সেখানে ঢুকবে কোন ভরসায়? বিরাট বিরাট গাছগুলি কাটা হল। মাটিতে না পড়ে সেগুলি হেলে দাঁড়িয়ে রইল অন্য গাছের গায়ে। জঙ্গলের জোঁক মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়ে কিলবিল করে কয়েদীদের ছেঁকে ধরল। তার উপর আছে অন্দামানের বিখ্যাত পোকা ticks, ঝুরঝুর করে গাছের গা থেকে মানুষের গায়ে ঢুকে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় কয়েদীরা যখন ছটফট করত, পরিবর্তে পেত উপরওয়ালার নির্মম উপেক্ষার হাসি ও কশাঘাত। মরণাধিক পরিশ্রম করে কয়েদীরা জঙ্গল কাটা, জলা জায়গা পরিষ্কার করা, রাস্তা ঘাট তৈরী করা ইত্যাদি নানাধরনের কাজে লেগে রইল।

নূতন উপনিবেশ স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীদের মৃত্যুর হার খুব বেড়ে গেল। এবার কিন্তু অন্য কারণে। উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, অমানুষিক পরিশ্রম, সমুদ্র ও অরণ্যঘেরা দ্বীপটির নির্জনতা, আদিবাসীদের আতঙ্ক সব মিলিয়ে কয়েদীরা ভয়ে পাগলের মত হয়ে উঠল। অনেকে সেই আতঙ্কে মারা গেল, অনেকে পাগল হয়ে গেল। কয়েদীদের একমাত্র চিন্তা হল কেমন করে পালান যায়। এদের একটা ভুল ধারণা ছিল মাইল দশেক সমুদ্র পাড়ি দিলেই দেশে গিয়ে পৌঁছাবে নয়ত হাঁটা পথে রওনা দিলে বর্মাদেশে গিয়ে উপস্থিত হবে। নানারকমে চেষ্টা চলতে লাগল এখান থেকে পালিয়ে যাবার। চারিদিকে কড়া পাহারা, কোন সুযোগেই পাওয়া যায় না। কিন্তু পালাবে কোথায়? জঙ্গলের পথে ওৎ পেতে আছে আদিবাসী দল আর সাগরের জলে আছে বুভুক্ষু হাঙ্গরের পাল। কোনদিকে কোন পথ নেই। তবুও দলে দলে কয়েদী

পালাতে লাগল। প্রায় কুড়ি বাইশ জন বাঁশ কেটে ভেলা তৈরী করে পালাল, কিছুদূর গিয়েই তারা ভেলা ডুবে মরল। আরেক দল পালাল ছোট ডিঙ্গি করে, তাদের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। স্থলপথে একদল পালাল, জঙ্গলের মধ্যে আন্দামানীদের হাতে মারা পড়ল। এ ছাড়া ছুটকো ছাটকা দুই চার জন করে যারাই পালায়, ধরা পড়ে ফিরে আসে। কেউ জলপথে পালায়, সমুদ্রে ডুবে মরে; কেউ স্থলপথে পালায়, জংলীদের হাতে মরে। কিন্তু পালানো কিছুতেই বন্ধ হয় না।

ডাঃ ওয়াকারের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কয়েদীরা পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে তাদের শাস্তি হত প্রাণদণ্ড। প্রত্যেক কয়েদীর দৈনিক কাজের একটা নির্দিষ্ট তালিকা ছিল। যদি কোন কারণে তারা সে কাজ শেষ করতে না পারত তবে তাদের অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে শাস্তি দেওয়া হত। ক্ষমাহীন নির্যাতন ও নিপীড়নে তারা পাগল হয়ে উঠত। বহু কয়েদী সেই শাস্তির ভয়ে ফাঁসী দিয়েও আত্মহত্যা করত। সে সময় গাছের ডালে প্রায়ই কয়েদীদের মৃতদেহ ঝুলতে দেখা যেত। সব মিলিয়ে কয়েদীদের এমন একটা মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হল যে মরণ তো সব রকমেই, কাজেই পালাতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে মরণের বেশী আর কিছু তো হবে না। এদিকে প্রাণদণ্ডের ভয়েও যখন কয়েদীদের পালানো বন্ধ হল না, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আদেশ পাঠালেন, কোন কয়েদীকে পালানোর অপরাধে যেন প্রাণদণ্ড দেওয়া না হয়।

ডাঃ ওয়াকারের নির্দেশে কয়েদীদের সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করা হত। জোড়ায় জোড়ায় হাতকড়া লাগিয়ে কাজে লাগিয়ে দিত। তার মধ্যে যারা দুর্দান্ত প্রকৃতির তাদের দশ বারো জনকে এক সঙ্গে পায়ে বেড়ি লাগিয়ে কাজে লাগিয়ে দিত।

কিছুদিন পর ডাঃ ওয়াকার কোম্পানীর কাছে প্রস্তাব পাঠালেন পোর্টব্লেয়ারে ঢোকার মুখে যে ছোট্ট দ্বীপটি (রস্) আছে সেখানে

হেড কোয়ার্টার সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক এবং কলকাতার সঙ্গে মাসে একবার করে যোগাযোগ স্থাপন করা হোক।

একেতো কয়েদীদের পালানো লেগেই আছে তার ওপর আছে জংলীদের হামলা। কর্মরত কয়েদীদের ওপর অতর্কিতে আদিবাসীরা আক্রমণ করে তাদের মেরে ধরে যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে যেত। আবার, হয়ত কয়েদীরা রান্নায় ব্যস্ত, জংলীরা এসে তাদের বাসনপত্র সব কেড়ে নিয়ে যেত। লোহা বা যে কোন ধাতুর ওপর ছিল আদিবাসীদের দুর্দান্ত লোভ।

ডাক্তার ওয়াকার অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করতেন সিপাহী বিদ্রোহের আসামীদের ওপর। তিনি মনের ভিতর সর্বক্ষণই একটি অস্বস্তি বোধ করতেন, প্রতিমুহূর্তেই আশঙ্কা করতেন এই বুঝি কয়েদীরা তাঁকে আক্রমণ করল। তাছাড়া প্রবল বর্ষা, অসম্ভব মশা, আদিবাসীদের আতঙ্ক, উপযুক্ত পাহারার অভাব, সর্বোপরি দুর্ধর্ষ কয়েদীদের ভয় ডাঃ ওয়াকার ও তাঁর সহকর্মীদের জীবন বিষময় করে তুলেছিল। সভ্যজগতের সঙ্গে যোগসূত্র—কালে ভদ্রে মৌলমেন থেকে একটি জাহাজের রেশন নিয়ে আগমন। কাজেই সমস্ত অসুবিধাগুলির জন্য একমাত্র দায়ী ভাবতেন কয়েদীদের এবং গায়ের জ্বালা মেটাতে অকথ্য অত্যাচার করতেন।

পোর্টব্লেয়ারে আসবার কিছুদিন পরে একদল কয়েদী ডাঃ ওয়াকারকে জানাল প্রায় দু'শ জন কয়েদী ষড়যন্ত্র করছে তাঁকে খুন করে নিজেদের হাতে কর্তৃত্বের ভার নেবে বলে। ডাঃ ওয়াকার যদিও নিজের নিরাপত্তার জন্য সর্বপ্রকারের সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন তবুও তাঁর আহারে রুচি নেই, রাতে ঘুম নেই, মনে শান্তি নেই। তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে লাগলেন। যদি এই কয়েদীদের হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হয় কোম্পানীর তাতে আর কি এসে যাবে, মাঝখান থেকে অসহায় হবে ডাঃ ওয়াকারের স্ত্রী-পুত্র। এরই মধ্যে একদিন এক দুর্ধর্ষ মুসলমান

কয়েদী ডাঃ ওয়াকারকে পাহারারত সান্ত্রীর হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে আক্রমণ করতে গেল। সময়মত অন্যান্য প্রহরীরা এসে পড়ায় সে-যাত্রা তিনি বেঁচে গেলেন। এই সব কারণেই ডাঃ ওয়াকার কয়েদীদের ওপর আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিলেন।

আন্দামানীদের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কিছুই জানা যাচ্ছে না। কোন রকমেই তারা বিদেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে রাজী হচ্ছে না। কি করা যায়? এই আদিবাসীদের সম্বন্ধে বিশদ ভাবে কেমন করে জানা যায়? এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটল।

দুধনাথ তেওয়ারী ব্যারাকপুরে এক রেজিমেণ্টে সৈনিকের কাজ করত। সিপাহী বিদ্রোহের পর অনেকের সঙ্গে দুধনাথও ধরা পড়ল। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সে এল আন্দামানে। তাকে রাখা হল রস্ দ্বীপে। কয়েকদিন যেতে না যেতেই দুধনাথের অন্তরাত্মা চীৎকার করে উঠল। এইভাবে কি করে থাকা যায়? এই বন্ধন, এই কয়েদ অসহ্য। অন্য কয়েদীরা বলল সামনে যে দ্বীপ দেখা যাচ্ছে সে দ্বীপ ব্রহ্মদেশের সঙ্গে যুক্ত। মাত্র দশ দিনের হাঁটা পথ। দুধনাথ ভাবল এই জেলখানায় বন্দী হয়ে থেকে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে একটা ঝুঁকি নেওয়া অনেক ভালো। কিন্তু পালানো যায় কি করে? চারিদিকে উত্তাল সমুদ্র, জঙ্গলে ভয়ঙ্কর আদিবাসীদের ভয়, তার উপর নৌসেনার কড়া পাহারা। তের চৌদ্দ দিন পরে দুধনাথ জঙ্গল থেকে বাঁশ জোগাড় করে ভেলা তৈরী করে চুপি চুপি রস্ ছেড়ে গভীর রাতে এপারে এসে পৌঁছাল। এবার-ডিনের ক্যাম্প থেকে আরও কয়েকজন কয়েদী নিয়ে দুধনাথ রওনা দিল জঙ্গলের পথে। সকলের মনে এক আশা, দশ দিনের মাত্র পথ বর্মা। দ্বিতীয় দিন জঙ্গলের মধ্যে আরও একটি ভাগোড়া দলের সঙ্গে তাদের দেখা, সংখ্যায় তারা ছিল প্রায় চল্লিশ জন। রাস্তা জানা নেই, দিকের ঠিক নেই, দলটি চলেছে তো চলেছেই। লুকিয়ে সঙ্গে করে যা খাবার নিয়ে এসেছিল কয়েকদিন বাদেই তা ফুরিয়ে

গেল। এদিকে রাস্তা ভুল হচ্ছে বারবার। জঙ্গলের মধ্যে সরু পায়ে চলা পথগুলি তারা সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছে কারণ সেগুলি ছিল আন্দামানীদের যাতায়াতের পথ। কোন্‌দিকে যে চলেছে তা বোঝবার উপায় নেই, সঙ্গে খাবার নেই, জল নেই। এমনও হচ্ছে ঘুরতে ঘুরতে পাঁচ ছয়দিন আগের ছেড়ে যাওয়া জায়গায় আবার এসে উপস্থিত হচ্ছে। ক্ষিধে পেলে গাছের বুনো ফল পেড়ে খাচ্ছে, তেষ্টা পেলে বেতগাছের ডগা কেটে জল বার করে খাচ্ছে।

অনাহারে, পরিশ্রমে, ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হয়ে দলের অনেকে রাস্তায় ছটফট করতে করতে শুয়ে পড়ল। বাকী দলটি এগিয়ে চলল। অদম্য স্বাধীনতার তৃষ্ণা তাদের মন প্রাণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পথের কষ্ট তারা অগ্রাহ্য করে চলতে লাগল। কয়েকদিন পর—মনের বল ভরসা অনেক কমে এসেছে, কিন্তু ফিরে যাবার পথ নেই। রাস্তার কষ্ট, খাবার বা জলের অভাব, সাপ, বুনোজন্তু, জোঁক সব কিছু ছাপিয়ে তাদের মন জুড়ে ছিল এক দারুণ আতঙ্ক—তা হল আন্দামানী। এবারডিন অধিকার করে যে বিদেশী সভ্য মানুষরা তাদের স্থানচ্যুত করেছে তাদের উপর অপরিসীম বিতৃষ্ণা ও দুর্দান্ত ক্রোধ নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে তারা ঘুরে বেড়ায়, তাদের হাতে পড়লে আর রক্ষা নেই। তের দিন পথ চলার পর একদিন দুপুর বেলা দলটিকে অপ্রত্যাশিত ভাবে আন্দামানীরা ঘিরে ধরল। সংখ্যায় ছিল তারা প্রায় একশ জন। প্রাণের ভয়ে হাতজোড় করে পায়ে ধরে ভাগোড়া কয়েদীরা আকারে ইঙ্গিতে জীবন ভিক্ষা করল, কিন্তু কোন লাভ হল না। নিষ্ঠুরের মত আন্দামানীরা কয়েদীদের হত্যা করে চলল। দুধনাথ তেওয়ারী এবং আরও দুইজন জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। সমুদ্রের ধারে গাছের কোটরে সারারাত কাটিয়ে ভোরবেলায় দুধনাথ আর তার সঙ্গীরা বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেল প্রায় জন পঁচিশ আন্দামানী চার পাঁচটা ডিঙ্গি করে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে। দৌড়ে দুধনাথরা আবার জঙ্গলে ঢুকল কিন্তু তার আগেই

আদিবাসীরা তাদের দেখতে পেয়েছে। জঙ্গল থেকে তিনজনকে খুঁজে এনে তীর ধনুক ও বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারতে লাগল। দুধনাথ অজ্ঞান হয়ে পড়ল, অন্য দুইজন মারা গেল। একজন আন্দামানী অজ্ঞান দুধনাথকে কাঁধে করে দলের সঙ্গে নিয়ে চলল। নূতন করে দুধনাথ আবার বন্দী হল।

এরপর প্রায় একবছর পর পোর্টব্লেয়ারে এবারডিন কনভিক্ট স্টেশনে দুধনাথ নিজে থেকে এসে ধরা দিল। সকলের প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, আন্দামানীরা দুধনাথকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে প্রথমে তার ক্ষতস্থানে লাল ও সাদামাটির প্রলেপ লাগিয়ে দিল তারপর তার জামা কাপড় খুলে ফেলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ফেলল। দুধনাথ আন্দামানীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, আজ এ বনে, কাল সে বনে। আজ এ দ্বীপে, কাল সে দ্বীপে। সর্বক্ষণ তার উপর কড়া পাহারা। ভুলেও কেউ তার হাতে তীর ধনুক দেয় না। আন্দামানীরা স্বভাবে যাযাবর। শূয়োর ও মাছ তাদের প্রিয় খাদ্য।

চার মাস পর আন্দামানীদের বড় সর্দার পুটিয়া তার মেয়ে জীগার সঙ্গে দুধনাথের বিয়ে দিল। আন্দামানীদের নিয়ম কানুন ছিল ভারী অদ্ভুত। বিয়ের আগে মেয়েরা সকলের সম্পত্তি, কিন্তু বিয়ের পরে আজীবন তারা পতিপ্রাণা হয়ে থাকে। বিয়ের ব্যাপারে বর বা কনের স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না। দলের সর্দার যে কোন মেয়ের সঙ্গে যে কোন ছেলের বিয়ে দিতে পারে। বিয়ের সময় সর্দার কনেকে বরের কোলে বসিয়ে দেয় এবং যৌতুক হিসেবে বরকে চার পাঁচটি লোহার ফলা লাগানো তীর দান করে। দুধনাথকে অবশ্য তারা কোন যৌতুক দেয়নি।

সারাদিন পুরুষরা জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের ধারে জড়ো হয়। আন্দামানীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে এবং তাদের ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব তাদের কাছে নেই। স্ত্রীলোকেরা ঝুড়ি বোনে, জাল বানায়, মাংস আগুনে ঝলসায়। এ ছাড়া স্ত্রীলোকেরা একটুকরো কাঁচ দিয়ে নিজেদের মাথা কামিয়ে ফেলে এবং

পুরুষদের মাথাও কামিয়ে দেয়। সৌন্দর্যের জন্য লাল ও সাদামাটি দিয়ে শরীর চিত্রিত করতে ভালবাসে। এই মাটি তাদের সব রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা গাছের লতাপাতা দিয়ে ঝোলা তৈরী করে তার মধ্যে বাচ্চাকে বসিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে নেয়। বাঁশ ও পাতা দিয়ে অস্থায়ী ঝোপড়ি বানায়। আন্দামানীরা মানুষ খায় এমন কোন প্রমাণ দুধনাথ পায়নি, এমনকি কাঁচা মাংসও কোনদিন খেতে দেখেনি।

ধরা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও দুধনাথ ধরা দিল কেন? সে বলল কিছুদিন থেকেই দেখা যাচ্ছিল আন্দামানীরা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। গোছা গোছা তীর ধনুক তৈরী হচ্ছে, বল্লমে শান দেওয়া হচ্ছে, এখানে ওখানে দলে দলে সকলে আলোচনা করছে। ব্যাপারটা কি দুধনাথ ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, ভাষাজ্ঞানও এমন হয়নি যে কথাবার্তা থেকে বুঝে উঠতে পারে। কয়েকদিন পর আন্দামানীদের বিরাট এক বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়ল, দুধনাথও চলল তাদের সঙ্গে। চলতে চলতে অনেকটা দূর গিয়ে দলটি যখন বাঁক নিয়ে অন্য একটি রাস্তা ধরল দুধনাথ ব্যাপারটা বুঝতে পারল; এই রাস্তা তো তার চেনা চেনা লাগছে, এই রাস্তাই তো এবারডিনের দিকে গিয়েছে। তবে কি আন্দামানীরা সেট্‌ল্‌মেণ্টের উপর আক্রমণ করতে চলেছে? কথাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বশরীর শিউরে উঠ্‌ল। কি সর্বনাশ, যদি অতর্কিতে এই দলটি সেট্‌ল্‌মেণ্ট আক্রমণ করে তবে একটি প্রাণী বাঁচবে না। কি করবে দুধনাথ? পালিয়ে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে সাবধান করে দেবে, না অসহায় ভাবে নিজের দেশের কয়েদীদের মরণযজ্ঞ দেখবে? দুধনাথ এ কথা জানতো 'ভাগোড়া' কয়েদীর শাস্তি মৃত্যু, কিন্তু তার নিজের জীবনের বিনিময়ে যদি হাজার হাজার জীবন রক্ষা পায় সেইটাই তার কাছে বেশী কাম্য বলে মনে হল। দুধনাথ মন স্থির করে ফেলল। পালানো অবশ্য মুশকিল এদের হাত থেকে, কিন্তু ইংরেজের সজাগ প্রহরীর চোখে যে ধুলো

দিতে পেরেছে একদল বন্য জাতিকে ফাঁকি দেওয়া তার পক্ষে খুব কঠিন হল না। ধীরে ধীরে দলের থেকে পিছিয়ে পড়ে তারপর অন্য রাস্তা ধরে দুধনাথ দৌড় লাগাল। মনে খালি এক চিন্তা, সময় মত পৌঁছতে হবে। দৌড়াতে দৌড়াতে নালা, ডোবা, পাহাড়, জঙ্গল পেরিয়ে রক্তাক্তকলেবরে অর্ধঅচেতন অবস্থায় শেষ পর্যন্ত এবারডিন স্টেশনে এসে পৌঁছাল। সকলকে বলল, 'আন্দামানীরা সেট্‌ল্‌মেণ্ট আক্রমণ করতে আসছে, তোমরা সাবধান হও।'

সঙ্গে সঙ্গে সকলে সাবধান হয়ে পড়ল। শার্লট নামে এক যুদ্ধ জাহাজ রস্‌ দ্বীপ ও পোর্টব্লেয়ারের মাঝখানে পাহারা দিতে লাগল। দূর থেকে যেই দেখা গেল আন্দামানীরা আসছে সঙ্গে সঙ্গে শার্লট জাহাজ থেকে কামান গর্জন করে উঠল। আন্দামানীর দল প্রথমটা থমকে দাঁড়াল তারপর পিছন দিক দিয়ে ঘুরে এবারডিন আক্রমণ করল। সুরু হল ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বৃষ্টি। এত তীরের বর্ষণ ইংরেজ সৈন্যরা সহ্য করতে না পেরে কিছুক্ষণের জন্য পিছিয়ে এল। পিছু হটতে হটতে তারা সমুদ্রের ধারে চলে আসতেই আন্দামানীরাও তাদের হটাতে হটাতে সেখানে এল। আবার শার্লট জাহাজ থেকে সুরু হল গোলা-বৃষ্টি। গোলাবৃষ্টির ফলে অসংখ্য আন্দামানী মারা পড়ল, বাকী সকলে আবার জঙ্গলে পালিয়ে গেল। এই যুদ্ধ আন্দামানের ইতিহাসে 'এবারডিনের' যুদ্ধ নামে পরিচিত। দুধনাথ তেওয়ারীকে তার কাজের পুরস্কার স্বরূপ চিরতরে মুক্তি দেওয়া হল।

এবারডিন বাজারের দক্ষিণ দিক থেকে একটি রাস্তা চলে গিয়েছে সেলুলার জেল ও হাসপাতালের দিকে, অন্যটি চলে গিয়েছে সমুদ্রের ধারে মেরিন ড্রাইভের দিকে। অন্য প্রান্তে অর্থাৎ উত্তর দিকে একটি রাস্তা গিয়েছে সেক্রেটারিয়েটের দিকে, আর একটি গিয়েছে ফিনিক্স বে, ডিলানিপুর, হ্যাডো হয়ে চ্যাথামের দিকে। এবারডিন বাজার সহরের কেন্দ্রস্থল এবং সমস্ত পোর্টব্লেয়ার সহরটি এরই চারপাশে গড়ে

উঠেছে। বাজারে হোটেল রেস্টুরেন্ট আছে বেশ কয়েকটি, কিন্তু বিদেশ থেকে বেড়াতে এসে বোর্ডিং ও লজিং এর জন্য কোন হোটেল পাওয়া যায় না। সারা সহরে সেরকম কোনও বন্দোবস্ত নেই। মাথা গোঁজবার জন্য যদি কোন বন্দোবস্ত করা যায়, খাবারের জন্য হোটেলের অভাব হয় না। বেশীর ভাগ দক্ষিণ ভারতীয়দের হোটেল; একটি বাঙ্গালী হোটেলও আছে। অবশ্য সরকারী গেস্ট হাউস আছে তিনটি, সার্কিট হাউস আছে একটি আর আছে একটি অতি চমৎকার ট্যুরিস্ট হোম। অনেক আগে থেকে বন্দোবস্ত না করলেএ সব জায়গায় একোমোডেশন পাওয়া যায় না। সরকারী কর্মচারী হলে গেস্ট হাউসে জায়গা পেতে খুব অসুবিধা হয় না।

বাজারের একপাশে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। ফোন করলে বাড়ীতে ট্যাক্সি পাঠিয়ে দেয়। অন্য পাশে নেতাজী হল। বিরাট হলটি। পোর্ট ব্লেয়ারে কোন টাউন হল নেই। টাউন হল হিসেবে নেতাজী হল ব্যবহার করা হয়। 'লোক্যাল বর্ণ এসোসিয়েশন' থেকে নেতাজী হল তৈরী হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পুনর্দখলের কিছুদিন পরে।

আগেই বলেছি, এবারডিন বাজার পোর্টব্লেয়ারের চৌরঙ্গী। বাজারের মাঝখানে ফারজান্দ আলি মার্কেট এখানকার নিউ মার্কেট। বাসনকোসন, জামাকাপড়, শৌখীন সামগ্রী সবই এখানে পাওয়া যায়, অবশ্য সোনাদানাটা বাদে। এবারডিন বাজারের মাঝখানে একটি 'ওয়ার মেমোরিয়েল' আছে, চলতি ভাষায় বলে ক্লক টাওয়ার বা ঘণ্টা ঘর। তার চার পাশে টিনের চাল দেওয়া সব দোকানপাট। বেশীর ভাগ দোকানই দক্ষিণ ভারতীয়দের।

পোর্টব্লেয়ারে একটা মজার কথার চল আছে সেটি হল 'ক্লক টাওয়ার নিউজ' অর্থাৎ গুজব। ভারতের বহুদেশে ঘুরেছি, ছোট ছোট জায়গাগুলি সাধারণতঃ গুজবপ্রিয় হয়, কিন্তু এখানে এটি যাকে বলে 'ক্লাইম্যাক্স'। একজনের ঘরের মধ্যে বসে কি কথা হল কি হল না, সত্যি মিথ্যে রং চড়িয়ে দেখা গেল তার পরদিনই সহরের এক প্রান্ত

থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়েছে। পোর্ট ব্লেয়ারের লোকেদের এত গুজবপ্রিয়, এত পরের বিষয়ে উৎসাহী হবার একটা মাত্র কারণ এখানকার লোকেদের মনের কোন 'ডাইভারসন' নেই। ভাল সিনেমা, ভাল গান বা ভাল কথা শোনবার কোন সুযোগ নেই। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ অত্যন্ত কম, কাজেই বহির্বিশ্বের কোন খবর নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ নেই। সীমাবদ্ধ দ্বীপে দিনের পর দিন একই পরিবেশ, একই মানুষ, একই আলোচনা। অগত্যা অবসর বিনোদনের একমাত্র উপায় পরনিন্দা ও পরচর্চা! এমন মুখরোচক বিষয় যে এখানকার লোকেরা বর্তমান নিয়ে শুধু সন্তুষ্ট থাকে না। অতীতে কবে কোথায় কে কি করেছিল না করেছিল, অদম্য উৎসাহ সহকারে সে সব বিষয় আহরণ করতে অত্যন্ত উৎসাহী। এর ওপর আছে দলাদলি। আগে ধারণা ছিল বাঙ্গালীরাই একমাত্র দলাদলিতে পারদর্শী, এখানে এসে দেখি সব দেশের লোকেদের মধ্যেই এটি বিদ্যমান। এমন কি অনেকের মধ্যে মুখ দেখা বা কথা বলাও বন্ধ। প্রথম প্রথম অদ্ভুত লাগত ভেবে, এ কোন্ দেশে এসে পড়লাম, পরে অবশ্য সবই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে মহিলাদের। তাঁদের ছেলেমেয়েরা ভারতবর্ষে থেকে পড়াশোনা করে, স্বামীরা অফিসে থাকেন, হাতে অফুরন্ত অবসর; কাজেই পরের বাড়ীর হাঁড়ির খবর জানতে তাঁদের দারুণ উৎসাহ।

যা বলছিলাম। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ। এই বিংশ শতাব্দীতে কেউ বিশ্বাস করবেন না আমাদের এখানে কোন দৈনিক খবরের কাগজ আসে না। প্রতি সপ্তাহে প্লেনে করে সাতখানা কাগজ একসঙ্গে আসে, সেই সঙ্গে চিঠিপত্র। প্লেন যখন থাকে না তখন জাহাজে মাসে একবার করে ত্রিশখানা কাগজ আসে। ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ার আনন্দ এখানে এসে সবাই ভুলে যায়।

কলকাতা—পোর্টব্লেয়ার—মাদ্রাজ। তিনটি সহরের মধ্যে যোগসূত্র দুইটি—'কারগো-কাম-প্যাসেঞ্জার' জাহাজ এম. ভি. আন্দামান এবং এম. ভি. নিকোবর। দূরত্ব যদিও মাত্র সাড়ে সাতশ' মাইল তবুও কলকাতা থেকে আসতেও চার দিন, মাদ্রাজ থেকে আসতেও চার দিন। গড়পড়তা তিন সপ্তাহ পরে পরে কলকাতা ও মাদ্রাজ থেকে জাহাজ আসে, অবশ্য এর ব্যতিক্রমও কখন কখন হয়। এর উপর কোন জাহাজ যদি ড্রাই ডকে গেল তবে তো কথাই নেই। তখন চিঠি আসে এক মাস পরে এবং কাগজ আসবে গোটামাসের একসঙ্গে। তবে আন্দামান সরকার থেকে একপাতার ছোট্ট একটি দৈনিক খবরের কাগজ বার করে ১´ × ১½´ ফুট সাইজের, তাতে রেডিও নিউজের মত সংক্ষেপে প্রায় সব খবরই থাকে। কাগজটির নাম 'ডেইলি টেলিগ্রাম'।

জাপানীরা পোর্টব্লেয়ারে ছোট একটি 'এয়ার স্ট্রিপ' তৈরী করেছিল যুদ্ধের সময়। পরে সেটি মেরামত করে রেগুলার এয়ার সারভিসের উপযোগী করা হয়েছে। আমরা ১৯৬১ সনের জানুয়ারী মাসে এলাম, সেই বছরই নভেম্বর মাসে প্রথম 'এয়ার সারভিস' শুরু হ'ল। পোর্টব্লেয়ারে সেদিন দারুণ উত্তেজনা, এয়ার পোর্ট লোকে লোকারণ্য। চারদিকে পাহাড় মাঝখানে এয়ার পোর্ট। লোক্যাল বর্ণ লোকেদের উৎসাহে এয়ার পোর্টের চারপাশে তিল ধারণের জায়গা নেই। তাদের মনে দারুণ উত্তেজনা, আন্দামান এখন আর পিছিয়ে থাকবে না, সপ্তাহে সপ্তাহে সভ্য জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।

প্রতি শুক্রবার সকাল সাড়ে ছ'টার সময় দমদম থেকে ডেকোটা প্লেন রওনা হয়, পরে রেঙ্গুন হয়ে বেলা আড়াইটার সময় পোর্টব্লেয়ারে এসে পৌঁছায়। পরদিন আবার সকাল সাড়ে ছ'টার সময় কলকাতা ফিরে যায়। নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্লেন সারভিস খোলা থাকে। মে মাসে বর্ষা শুরু হলে বন্ধ হয়ে যায়, ফলে আন্দামানের

লোকেরা বাইরের জগৎ থেকে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৬৬ সনের ২রা মে থেকে স্কাই মাস্টার সোজা পোর্টব্লেয়ারে যাচ্ছে। 'ইনগর‍্যাল ফ্লাইটে' আমরা ঘুরেও এসেছি পোর্টব্লেয়ার থেকে।

সারা বছর বিমান চলাচলের উপযুক্ত এরোড্রোম এতদিন ছিল না. সম্প্রতি প্রচুর টাকা খরচ করে এয়ার পোর্টটি অনেক বড় করা হয়েছে এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সারাবছরই এখানে বিমান চলাচল করবে। যতদিন প্লেন চলে এখানকার আবহাওয়াই বদলে যায়। সপ্তাহে সপ্তাহে চিঠি আসছে, কাগজ আসছে, লোকজন আসছে, ভি. আই. পি.-রা দলে দলে আসছেন যাচ্ছেন, একেবারে সরগরম অবস্থা। তখন কিন্তু কারও মনে হয় না আমরা কতদূরে পড়ে আছি। মনে হয় না অন্য সময় প্রয়োজন হলে (অর্থাৎ জাহাজ যখন থাকে না) এই দ্বীপপুঞ্জের আটচল্লিশ হাজার মানুষ মাথা কুটে মরলেও এখান থেকে বার হতে পারে না।

এখানকার স্থানীয় লোকেরা আন্দামানকে বলে 'আণ্ডেমান'। এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম—'আচ্ছা, আন্দামান নামটা কি করে এল ? কারা দিয়েছে এখানকার নাম ?' ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'হণ্ডুমান থেকে নাম হয়েছে আণ্ডেমান।'

আন্দামানের নামকরণ নিয়ে ভারী মজার মজার গল্প আছে। টলেমি নাম বলেছেন 'আগমাটে', মার্কোপোলো বলেছেন 'আঙ্গামান', মাস্টার সিজার ফ্রেডারিক বলেছেন 'আণ্ডেমিয়ান', ভারতবর্ষের বণিকরা বলেছেন 'আন্ধার মাণিক্য'। অনেকে আবার বলেন মালয়ী দস্যুরা বহুকাল থেকেই আন্দামানের অস্তিত্ব জানত, তারা বলত 'ইয়াং-টু-মাং বা 'আণ্ডাবান'। একজন বিখ্যাত মালয়বাসী পণ্ডিত বলেছেন, মালয়ীরা যুগ যুগ ধরে আন্দামানীদের ক্রীতদাস হিসেবে ধরে এনে তাদের ব্যবসা চালাচ্ছিল। তারা বলত আন্দামানীরা রামায়ণে বর্ণিত হনুমানের মত দেখতে, তাই মালয়ী উচ্চারণে তাদের বলত 'হণ্ডুমান'।

তার থেকে হণ্ডামান, আণ্ডেমান, আণ্ডাবান তথা আন্দামান। এমন গল্পও আছে সীতা উদ্ধারের জন্য শ্রীরামচন্দ্র নাকি প্রথমে এইখান থেকেই সেতু বাঁধতে চেয়েছিলেন, পরে হয়ত দূরত্ব অনেক বেশী হওয়ার জন্য অথবা হয়ত কোন 'টেকনিক্যাল' অসুবিধার জন্য মত বদলে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে চলে গিয়েছিলেন। সেতু বন্ধনের গল্প আরও আছে। এখানকার আদিবাসীদের পূর্বপুরুষ মাইয়া টোমোলা তাদের পাপের শাস্তি দেবার জন্য দ্বীপগুলি জলে ডুবিয়ে দিয়ে মুখ্যভূমি অর্থাৎ ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। পরে আদিবাসীরা অনেক স্তবস্তুতি করে অযোধ্যার শ্রীরামচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করে। শ্রীরামচন্দ্র তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সেতু বেঁধে দেবেন। এখানেও বোধ হয় শেষ পর্যন্ত কোন অসুবিধার জন্য প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেন নি। গল্প যাই-ই হোক, এখানকার লোকেদের ধারণা এ দেশটা হনুমানের দেশ। গন্ধমাদন পর্বত বয়ে নিয়ে যাবার সময় হনুমান এই দ্বীপে বিশ্রাম করেছিলেন এবং এর অনবদ্য সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে আন্দামানকে তাঁর রাজধানী করবেন বলে আদিবাসীদের কথা দিয়ে গিয়েছিলেন।

শুধু হনুমান কেন, যেই আন্দামানে আসবে সেই এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে। সমুদ্র, পাহাড়, ঝর্ণা, খাড়ি, উপত্যকা, যাই চোখে পড়বে তাই মনে হবে 'কি সুন্দর'।

এখানে পাখীর বাসা (edible birds nest) পাওয়া যায় প্রচুর। বহুদিন থেকে চীনারা আন্দামানে আসত পাখীর বাসার খোঁজে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে উঁচু গাছের ডালে এবং পাহাড়ের গুহার মধ্যে একরকম পাখী তাদের মুখের লালা দিয়ে বাসা তৈরী করে। চীনদেশে পাখীর বাসা অতি জনপ্রিয় খাদ্য। বাসাগুলি অনেকটা জমাট বাঁধা সিমাইএর মত। এখনও প্রতিবছর যখন মরশুম হয় বহু বর্মী ও লোক্যাল লোকেরা সরকার থেকে জঙ্গল ইজারা নিয়ে পাখীর বাসা পেড়ে মেনল্যাণ্ডে চালান দেয়।

অনেকে বলেন আন্দামানের গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক রকম ফুল পাওয়া যায় যা খেলে মৃতের পুনর্জীবন লাভ হয়। স্বর্গের নন্দনকানন থেকে কেমন করে নাকি এই মৃতসঞ্জীবনী ফুলের গাছ আন্দামানে এসে পড়েছিল। ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার মিঃ ভাস্করণ এ গল্প করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "বিশল্যকরণী নয় ত? গন্ধমাদন পর্বতে বিশল্যকরণী গাছই তো ছিল।" মিঃ ভাস্করণ বললেন, "না, বিশল্যকরণী নয়"। আমি বললাম, "আপনি দেখেছেন এ ফুল?" মিঃ ভাস্করণ—"কেউই দেখেনি ইদানীংকালে, তবে আছে এ কথা ঠিক। কোনদিন যদি কেউ খুঁজে বার করতে পারে তবে তা চিকিৎসা জগতে যুগান্তর আনবে।"

বিশ্বাস না করলেও আর প্রতিবাদ করিনি। তবে এটা ঠিক এখানকার জঙ্গলে জড়ি বুটী আছে বহু প্রকারের।

এ ছাড়া এখানে আছে ভারী সুন্দর সুন্দর 'পিকনিক স্পট', যেখানে গেলে মনটা ভারী খুশী হয়ে ওঠে। এই রকম একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পিকনিক স্পট হল 'করবাইন্‌স্ কোভ', একমাত্র সমুদ্র স্নানের জায়গা, যেখানে জলের নীচে পাথর নেই আর হাঙ্গরের উপদ্রব নেই। সহর থেকে বেরিয়ে, মেরিন ড্রাইভ পার হয়ে সমুদ্রের পাশ দিয়ে, পাহাড়ের ওপর দিয়ে প্রায় পাঁচ মাইল গিয়ে তবে করবাইন্‌স্ কোভ। পুরীর সমুদ্র সৈকতের মত বড় না হলেও দেখতে অপরূপ। তিন দিক ঘিরে পাহাড়, তার নীচে অনেকটা জায়গা জুড়ে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে গিয়েছে সমুদ্রের তীর। সমুদ্র সৈকতের গায়েই সরকারী নারকেল বাগিচা, অসংখ্য নারকেল গাছের সারি। প্রতি রবিবার বহুলোক করবাইন্‌স্ কোভে দল বেঁধে স্নান করতে আসেন। অল্প দূরেই পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটি ট্যুরিস্ট হোম। স্নান সেরে সকলে সেখানে গিয়ে দোসা, ইডলি, চা, কফি খেয়ে বাড়ী ফেরেন।

বর্ষাকালে সমুদ্র হয়ে ওঠে অশান্ত তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ। ঢেউগুলি দুর্বার আক্রোশে ক্রমান্বয়ে তীরের গায়ে আছড়ে পড়তে থাকে, ফলে

প্রতিবছর করবাইন্‌স্ কোভের অনেকখানি জায়গা তার নারকেল গাছের সারির সঙ্গে সমুদ্র গর্ভে ডুবে যায়। সমুদ্রের তীর অনেকখানি বাঁধ দেওয়া, কিন্তু বর্ষাকালে সে বাঁধ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যায়, সমুদ্র তার আপন খেয়ালে এগিয়ে আসতে থাকে। প্রকৃতির কাছে মানুষের হার হয় বার বার।

রেভারেণ্ড করবাইন ছিলেন পোর্টব্লেয়ারের পাদ্রী সাহেব। উপনিবেশ গঠনের পর অনেক চেষ্টা করেও যখন কিছুতেই আদিবাসীদের বশে আনা যাচ্ছিল না, তখন কোম্পানী থেকে আদেশ এল 'আন্দামানীদের কোন রকমে নিজেদের আওতায় এনে তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করা হোক।' এই উদ্দেশ্যে রস্ দ্বীপে কয়েকটি ছোট ছোট ঝোপড়ি নিয়ে 'আন্দামান হোমস্'-এর পত্তন হল এবং রেভারেণ্ড করবাইন সর্বপ্রথম এই আন্দামান হোমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে বশ করে প্রথমে কুড়ি বাইশটি আন্দামানী নিয়ে কাজ শুরু হল।

মিঃ করবাইনের উদ্দেশ্য ছিল আন্দামানীদের লেখাপড়া শিখিয়ে, সভ্যজাতির সংস্পর্শে রেখে সভ্য করে তোলা। কাজটা কিন্তু খুব সহজ হল না, একটা আদিম বন্য যাযাবর জাত এরকম বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যে থাকতে রাজী হল না, ফলে অনেকে আবার পালিয়ে জঙ্গলে চলে গেল। দলে দলে তারা আন্দামান হোমে আসতে লাগল, দলে দলে পালাতে লাগল। কোম্পানী থেকে প্রচুর টাকা বরাদ্দ হল আন্দামান হোমের উন্নতির জন্য। ধীরে ধীরে আন্দামানীদের প্রচুর জিনিসপত্র দিয়ে, নানারকম মুখরোচক খাবার খাইয়ে বশ করতে শুরু করা হল। অনেকে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করল, হিন্দী শিখল, কাপড় জামা পরতে শিখল এবং ক্রমে ক্রমে সরকারী কাজে সাহায্য করতে লাগল। কয়েদীদের সঙ্গে জঙ্গল পরিষ্কার করা, রাস্তা ঘাট তৈরী করা, 'ভাগোড়া' কয়েদী জঙ্গল থেকে ধরে আনা প্রভৃতি নানা কাজে সাহায্য করতে লাগল।

আন্দামান হোম যতদিন রসদ্বীপে ছিল ততদিন বেশী আন্দামানী সেখানে যাতায়াত করত না। রস্‌টা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বলে তারা সহজে সেখানে যেতে চাইত না। পরে আন্দামান হোম যখন হ্যাডো অঞ্চলে সরিয়ে আনা হল তখন বহু আন্দামানী নিজে থেকেই হোমে ভর্তি হতে লাগল। রেভারেণ্ড করবাইন বহু বছর আন্দামানে থাকায় এদের ভাষা শিখেছিলেন এবং সত্যিসত্যি তিনি এই আদিম জাতটাকে ভালবেসেছিলেন।

রেভারেণ্ড করবাইনের পর মিঃ এম ভি. পোর্টম্যান হোমেব দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমেই হোমের অনেক উন্নতি হতে লাগল, আন্দামানীর সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেল। মিঃ পোর্টম্যান আন্দামান হোমের দায়িত্ব নেবার পর ভাবলেন সীমাবদ্ধ দ্বীপে আজন্ম লালিত আদিবাসীদের যদি সভ্যদেশে একবার ঘুরিয়ে আনা যায় তবে বোধহয় তাদের মানুষ করে তোলবার পক্ষে অনেক সুবিধা হবে। এই ভেবে তিনি পঞ্চাশজন আন্দামানীকে নিয়ে কলকাতা গিয়েছিলেন। কলকাতা যাবার পর তাদের দেখে সারা সহরে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল, সবার মুখে এক কথা 'আন্দামান থেকে রাক্ষস এসেছে।' আন্দামানের রাক্ষসদের অতি কষ্টে জনতার হাত থেকে রক্ষা করে মিঃ পোর্টম্যান আবার আন্দামানে ফিরে এসেছিলেন।

মিঃ পোর্টম্যানের সময় আন্দামান হোমের সবচেয়ে বেশী উন্নতি হল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সঙ্গে অনেক কুফলও দেখা দিল। যে বন্য জাতটা এত কষ্টসহিষ্ণু, এত শিকারপ্রিয় ছিল, হোমে থাকার ফলে তারা দিন দিন অলস হয়ে পড়ল, সেই সঙ্গে অল্প বিস্তর আয়েসী। পরিশ্রম না করে, না চাইতে অনায়াসে যদি সব জিনিস পাওয়া যায় তবে শুধু শুধু পরিশ্রম আর কে করে? বন্য হলেও এই সত্যটা তারা বুঝে গিয়েছিল, কাজেই তারা দিন দিন নিষ্কর্মা হয়ে পড়ল। তা ছাড়া প্রকৃতির কোলে যারা মানুষ, গভীর অরণ্যে থাকা

যাদের অভ্যাস, সহরের আবহাওয়া তাদের সহ্য হল না। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অতিরিক্ত ধূমপানের ফলেও আন্দামানীদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যেতে লাগল এবং সর্বক্ষণ কয়েদীদের সঙ্গে থাকার ফলে তাদের রোগগুলিও খুব সহজে এদের মধ্যে সংক্রামিত হতে লাগল। ১৮৭৭ সনে হামজ্বরে বহু আন্দামানী মারা গেল। সবচেয়ে দুঃখের কথা, অরণ্যের এই আদিম জাতটা সভ্যজাতির কঠিনতম অভিশাপ এবং ঘৃণ্য রোগ 'সিফিলিসে' আক্রান্ত হয়ে দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেল। সিফিলিস রোগটা গোটা আন্দামানে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বতন্ত্রভাবে থাকা এবং চিকিৎসা করা দুটোতেই আন্দামানীদের সমান আপত্তি ও আতঙ্ক, কাজেই রোগটা অসম্ভব ভাবে ছড়িয়ে পড়ল। ভগবানের অভিশাপে বংশবৃদ্ধির হার কমতে কমতে আজ আন্দামানী-দের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে সাতাশ আঠাশটিতে। মিঃ পোর্টম্যান বলেছেন, "It is sad to see the ravages which syphillis is working among them and their numbers are becoming less year by year. Quite two-third of Great Andaman being now depopulated, the extinction of this branch of race cannot be far off."

মিঃ বনিংটন বলেছেন, "Andaman Home was the door of death to the Andamanese."

চীফ কমিশনার কর্ণেল ডগলাস পরে আন্দামান হোম তুলে দিয়েছিলেন এবং আন্দামানীরা মহানন্দে জঙ্গলে ফিরে গিয়েছিল।

আশ্চর্য, সত্যি আশ্চর্য। একটা আদিম জাত সভ্য জাতির সংস্পর্শে এসে এই ভাবে ধ্বংস হয়ে গেল? মিঃ হমফ্রে যখন আন্দামান হোমের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তখন আন্দামানীর সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার। একশ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে সাতাশ আঠাশটিতে। অবশিষ্ট আন্দামানী কয়টিকে সরকার নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছেন, তাদের বাড়ীঘর করে দিয়েছেন, সরকারী কাজও কয়েকজনকে দিয়েছেন।

অনেক নৃতত্ত্ববিদের মতে আন্দামানীরা হচ্ছে 'One of the most ancient and purest tribal race.' রেভারেণ্ড করবাইন হয় ত ভুলই করেছিলেন কয়েদীদের ও আন্দামানীদের একসঙ্গে রেখে। তিনি হয় ত স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি তাঁর সৎপ্রচেষ্টার ফলে একটা জাত এ ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

পোর্টব্লেয়ারে আসবার পর যা আমাদের সবচেয়ে আনন্দ দিয়েছিল তা হ'ল এর জলবায়ু। না গ্রীষ্ম, না শীত। দ্বীপগুলি যেন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। জানুয়ারী মাসে কলকাতা থেকে এলাম, তখন সেখানে বেশ শীত। এখানে এসে যেদিন পৌঁছলাম সেইদিনই রাত্রিবেলা ডেপুটী কমিশনার মিঃ হালভের বাড়ী ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। শীত না করলেও অভ্যাস বশতঃ শাল গায়ে দিয়ে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি কোন ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার গায়ে গরম কাপড় নেই, এমন কি গৃহস্বামীর বাচ্চাগুলিও ফিনফিনে পাতলা জামা গায়ে দিয়ে বেড়াচ্ছিল। ঘরের মধ্যে বেশ গরম বোধ হওয়ায় খানিক বাদে কে যেন পাখা চালিয়ে দিল। আমার শাল জড়ানো চেহারাটা নিজের কাছেই কেমন বোকা বোকা লাগছিল, কেউ যাতে বুঝতে না পারে তাই আস্তে আস্তে শালটি খুলে পাশে রাখতেই আমার পাশের ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, "আজকের জাহাজেই এসেছ বুঝি? তোমার গায়ে শাল দেখেই বোঝা যায় তুমি নতুন মেনল্যাণ্ড থেকে এসেছ।" মেনল্যাণ্ড? সে আবার কোথায়, কোনদিন তো নামও শুনিনি। বললাম, "মেনল্যাণ্ড নয়, আমি কলকাতা থেকে আসছি।" আমার কথা শুনে ভদ্রমহিলা আরও জোরে হেসে উঠলেন, বললেন, "ভারতবর্ষকে এখানকার লোকেরা বলে মেনল্যাণ্ড, তা সে দিল্লীই হোক বা কলকাতাই হোক। অস্ট্রেলিয়ার কাছে ইংল্যাণ্ড যেমন মেনল্যাণ্ড, আন্দামানের কাছে ভারতবর্ষও তেমনি মেনল্যাণ্ড—মুখ্যভূমি।"

আন্দামানে সারা শীতকালে লেপকম্বলের দরকার হয় না, সারা গ্রীষ্মকালে গায়ে পাতলা চাদর দিতে হয়। কখন শীত যায়, গ্রীষ্ম আসে টেরই পাওয়া যায় না। তবে বর্ষা? বর্ষার আধিপত্য এখানে বছরের মধ্যে আট মাস। এখানে বর্ষা নামে রণভেরী বাজিয়ে দুর্বার গতিতে। মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের ঝলকানি আর অবিরাম বর্ষণ চলতে থাকে মাসের পর মাস। সে কি বর্ষা, নামলো তো থামতেই চায় না। সাত আট দিন অবিরাম বর্ষণের পর মাঝে দুই তিন দিনের বিরতি, আবার চলে পূর্ণোদ্যমে বর্ষণ।

বঙ্গোপসাগরের সাইক্লোনগুলি আন্দামানের আশপাশ থেকেই উৎপত্তি হয়, কিন্তু কি কারণে জানি না, আন্দামানের ওপর দিয়ে বয়ে না গিয়ে পাশ কাটিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে আঘাত করে। পাশ কাটিয়ে গেলেও সে সব সাইক্লোনের ছোটখাট ঝাপটা যা আন্দামানের ওপরে এসে পড়ে তাতেই এখানকার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। গাছপালা ভেঙে, রাস্তাঘাট ধ্বসে, ইলেক্‌ট্রিকের তার ছিঁড়ে, বাড়ীঘরের চাল উড়িয়ে সে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এত বাতাসের বেগ যে, প্রতিমুহূর্তে আমাদেরও মনে হয়—'মাগো গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি'।

'দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার;
অরণ্য উদ্যত বাহু করে হাহাকার,
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার,
খরতর বক্র হাসি শূন্যে বরষিয়া।'

কবির বর্ণনার এমন জীবন্ত চিত্র অন্য কোথাও দেখা যাবে কি না সন্দেহ।

বেশ কিছুদিন হয়ে গেল আন্দামানে এসেছি কিন্তু এখানকার সব চেয়ে যা দ্রষ্টব্য, আশৈশব যার সম্বন্ধে কত গল্প শুনে এসেছি সেই

সেলুলার জেলই এখন পর্যন্ত দেখা হল না। আজ দেখব, কাল দেখব করে দিন কেটে যাচ্ছে।

এল পনেরই আগস্ট। জিমখানা গ্রাউণ্ডে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিরাট আয়োজন। একপাশে সমুদ্র ও তিন দিকে ছোট ছোট পাহাড় ঘেরা বিরাট ময়দান এই জিমখানা গ্রাউণ্ড। ২৬শে জানুয়ারী এবং ১৫ই আগস্ট এখানে বোধ হয় গোটা সহরের সব মানুষ এসে উপস্থিত হয়। প্যারেড, চীফ কমিশনারের স্যালুট গ্রহণ, স্কুলের ছেলেমেয়েদের মিষ্টি বিতরণ, বক্তৃতা ইত্যাদি অনুষ্ঠান শেষ হবার পর আমরা রওনা দিলাম সেলুলার জেলের উদ্দেশ্যে।

জেলের সামনে বিরাট লম্বা একটি কাঠের দোতলা বাড়ী। তারই মাঝখানে জেলের ফটক আর দুই পাশের ঘরগুলিতে বর্তমান হাসপাতাল। ব্রিটিশ আমলে এই সব ঘরে জেলের অফিস ছিল।

সেলুলার জেলেরই একটা অংশে বর্তমান জেলখানা। পরিষ্কার জামাকাপড় পরে কয়েদীরা সব সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। আমরা গেলে সকলে ভজন গেয়ে শোনাল। চীফ কমিশনার তাদের মিষ্টি বিতরণ করলেন এবং একটি ছোটখাট বক্তৃতা দিলেন। আমরা মেয়েরা পিছনে দাঁড়িয়ে জেল কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিচ্ছিলাম কে কোন্ অপরাধে অপরাধী। কয়েদীদের মধ্যে খুনী ছিল প্রায় পাঁচ-ছয় জন। জেল কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কয়েদীদের জন্য ভোজের আয়োজন করেছিলেন। রান্নাকরা জিনিসগুলি দেখলাম, বড় বড় ডেকচি ভর্তি পোলাউ, সম্বর (ডাল), তরকারী এবং বোঁদে।

সব অনুষ্ঠান শেষে সকলে চলে গেলে গুপ্ত সাহেব এবং আমি জেলার সাহেব মিঃ হর্ষেকে নিয়ে রয়ে গেলাম জেলখানাটি দেখবার জন্য। অবাক হয়ে বিরাট অট্টালিকাটি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। এ মহল থেকে সে মহল। ঠিক যেন মধ্য যুগের এক ইয়োরোপীয় দুর্গ। এই হল কুখ্যাত সেলুলার জেল, যার প্রত্যেকটি সেলে গুমরে মরেছে কত নিপীড়িত আত্মা।

কি প্রশংসনীয় বুদ্ধি সেই পূর্তকারের যিনি এর পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৮৪২ সনে ব্রিটেনে Pentonville Prison তৈরী হয় এক হাজার কয়েদীর জন্য। তারই অনুকরণে আন্দামানের কয়েদীদের জন্য তৈরী হয় সেলুলার জেল। ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি ওয়াচ টাওয়ার, সেখানে সেন্ট্রীর ঘুরে ঘুরে চতুর্দিকে নজর রাখবার জায়গা আর তার সাত দিকে সাতটা উইংগ্‌স্‌ যেন সপ্তরথীর মত সপ্তব্যূহ রচনা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সমস্ত উইংগ্‌স্‌ গুলি ঘিরে উঁচু প্রাচীর। প্রত্যেকটি উইংগ তিনতলা, এক এক সারিতে তেত্রিশটা করে সেল, দুই একটি উইংগ্‌স্‌-এ কম বেশীও আছে। সব মিলিয়ে আগে সাতশ' ছাপ্পান্নটি সেল ছিল। সেলের সামনে ঢাকা লম্বা বারান্দা, তাতে মোটা মোটা লোহার গরাদ লাগানো। অসংখ্য সেলের জন্য জেলখানাটির নাম হয়েছিল সেলুলার জেল। সেকালে যার নাম শুনলে অতি বড় দুর্দান্ত কয়েদীরও বুক কেঁপে উঠত।

সেলুলার জেলের এক একটি উইংগ্‌স্‌-এর মধ্যে উঁচু পাঁচিল তোলা, যাতে কোন কয়েদী একটা থেকে অন্যটাতে পালাতে না পারে। সমস্ত জেলখানাটি এমন ভাবে তৈরী যে, যে কোন উইংগ্‌স্‌ থেকে কয়েদীরা বার হলে ঘুরতে ঘুরতে তাকে সেন্ট্রাল ওয়াচ টাওয়ারে এসে সেন্ট্রীর নজরে পড়তে হত।

জেল কম্পাউণ্ডের এক কোনায় পুরান দিনের ফাঁসীর মঞ্চ, একসঙ্গে দুইজনকে ফাঁসী দেবার ব্যবস্থা। আর একটি ঘরে দেখলাম মানুষ-টানা ঘানি, হঠাৎ দেখলে বিরাট একটি লোহার হামানদিস্তার মত মনে হয়। মিঃ হর্ষে বললেন, ঘানি টানবার সময় কাঠের সঙ্গে জোড়া দিয়ে দিত বিরাট লোহার মুগুরের মত জিনিসটি এবং কয়েদীরা সেই কাঠ ঠেলে ঠেলে ঘানির চার পাশে ঘুরত। ঘানির পাশেই রয়েছে একটি মানুষ সমান লম্বা লোহার ফ্রেম। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম সেটি হল 'ফ্লগিং ফ্রেম'। ফ্রেমের মধ্যে উলঙ্গ অবস্থায় কয়েদীকে পুরে হাত পা চাবি দিয়ে আটকে

দিত। নিয়ম ছিল এত জোরে চাবুক মারতে হবে যে তিন বারের বার যেন চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে।

১৮৭৯ সনে জেনারেল ক্যাডেল (General Cadell) যখন চীফ্ কমিশনার হয়ে পোর্টব্লেয়ারে আসেন, তখনই এই কুখ্যাত সেলুলার জেলের ভিত্তি স্থাপন হয়। বর্মা থেকে ইঁটের বোঝা জাহাজে করে বয়ে এনে, কয়েদীদের অমানুষিক পরিশ্রমে আন্দামানের একমাত্র পাকা ইমারত এই বিরাট জেলখানাটি তৈরী হয়।

তার আগে পর্যন্ত পোর্টব্লেয়ারের বাইরে ছোট একটি দ্বীপ 'ভাইপার'-এ কয়েদীদের জেলখানা ছিল। সাংঘাতিক রকমের জঘন্য চরিত্রের কয়েদীদের সেখানে রাখা হত। সে সময় যাঁরা আন্দামানে এসেছিলেন তাঁদের লেখা থেকে ভাইপার দ্বীপের একটা বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। মিঃ বডেন ক্লস (Boden Kloss) বলেছেন, "ভাইপারকে একমাত্র নরককুণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সংসারে যতরকম ঘৃণ্য অপরাধী ও পাপী আছে তার বোধ হয় সব রকমের নমুনাই ভাইপারে দেখতে পাওয়া যায়। হরেক রকমের কয়েদী, মায় মেয়ে কয়েদীও এখানে আছে। হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি, মুখে পাপের ছাপ এবং সর্বোপরি বেপরোয়া ভাব নিয়ে কয়েদীরা যখন ঘুরে বেড়ায় তখন তাদের হাত পায়ের শৃঙ্খলের ঝনুঝন্ আওয়াজে কেমন মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে।"

ব্রিটিশ আমলে ভাইপারে একটি ফাঁসীর মঞ্চও ছিল।

আন্দামানে পেনাল সেট্ল্‌মেণ্ট খোলবার আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত কয়েদীদের সুমাত্রার বেনকুলেনে (Bencoolen) পাঠান হত। সে সময় সুমাত্রা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে ছিল। পরে যখন সুমাত্রা হস্তান্তরিত হয়ে ডাচ সরকারের হাতে চলে যায়, তখন কয়েদীদের সিঙ্গাপুর এবং পেনাঙে পাঠান হত। এ ছাড়া ভারতীয় কয়েদীদের জন্য আরাকান, মালাক্কা, ও টেনাসেরিমে দ্বীপান্তরের বন্দোবস্ত ছিল।

বেনকুলেন থেকে কয়েদীদের পেনাঙের সেটল্‌মেণ্টে যখন পাঠান হল, সুমাত্রার গভর্ণর স্যার স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফ্‌ল্‌স্ (Sir Stamford Raffles) পেনাঙের জেল অথরিটিকে লিখে জানালেন তাঁরা কোন পদ্ধতিতে কয়েদী উপনিবেশ চালনা করতেন। যে কয়টি আইন স্যার স্ট্যামফোর্ড চালু করেছিলেন তা হল, (১) কয়েদীদের মধ্যে থেকেই তাদের দেখাশোনা করার লোক ঠিক করা। (২) কয়েদীদের কিছুদিন পর সেল্‌ফ্‌ সাপোর্টার (Self-supporter) হতে সাহায্য করা। (৩) নির্দিষ্ট সময়ের পর কয়েদীদের বিবাহে অনুমতি দেওয়া। (৪) কয়েদীদের দিয়ে পেনাল সেটল্‌মেণ্টে পাকাপাকি ভাবে বসতি স্থাপন করা।

স্যার স্ট্যামফোর্ডের নিয়মের ওপর ভিত্তি করে পেনাঙে এবং সিঙ্গাপুরে কয়েদী উপনিবেশ খোলা হল। আরও পরে পেনাঙ এবং সিঙ্গাপুরের কয়েদী উপনিবেশ সরিয়ে যখন আন্দামানে সেট্‌ল্‌মেণ্ট খোলা হল তখন সেখানেও সেই আগের নিয়মাবলীই চালু করা হল।

১৮৫৭ সনে সিপাহী বিদ্রোহের পর সারা ভারতবর্ষের হাজার-হাজার বিদ্রোহীদের নিয়ে ইংরেজের দারুণ সমস্যা উপস্থিত হল। এদের দেশের জেলে রাখা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ যে কোন মুহূর্তে এরা আবার বিদ্রোহ করতে পারে। অথচ স্ট্রেট সেটলমেণ্ট এবং মৌলমেনের জেলখানাতেও বিন্দুমাত্র জায়গা নেই। অগত্যা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নূতন জায়গার সন্ধান আরম্ভ করলেন এবং বিদ্রোহীদের উপযুক্ত জায়গা হিসাবে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পছন্দ করলেন।

কয়েদী আসতে লাগল হাজারে হাজারে। সিপাহী বিদ্রোহের আসামী ছাড়া খুন, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি ঘৃণ্য অপরাধে দণ্ডিত আসামীরাও দলে দলে আসতে লাগল। কয়েদীভর্তি জাহাজ পোর্টব্লেয়ারে এলে সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার এবং সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসার কয়েদীদের তদারক করতে যেতেন। কয়েদীদের সঙ্গে

প্রত্যেক কয়েদীর অপরাধ ও চরিত্রের বিবরণীসহ একটি তালিকা পাঠান হত। সেই তালিকা থেকে এবং কয়েদীদের শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে.তাদের নানা ধরনের কাজে লাগান হত এবং প্রত্যেক কয়েদীর গলায় কাঠের চাকতিতে নম্বর লাগিয়ে দেওয়া হত। বিপজ্জনক কয়েদীর নম্বরের সঙ্গে লেখা থাকত 'ডি' অর্থাৎ ডেঞ্জারাস। এ ছাড়া আরও একটি অক্ষর লেখা থাকত হয় 'এ' নয়ত 'আর'। 'এ' হল 'আটা ঈটিং', 'আর' হল 'রাইস ঈটিং'।

পোর্টব্লেয়ারে আসবার একমাস পর কয়েদীদের পায়ের বেড়ি খুলে নেওয়া হত। প্রত্যেক কয়েদীকে প্রথম ছ'মাস সেলুলার জেলের মধ্যে রাখা হত।

সেলুলার জেলের সাতটি উইংগস্-এর মধ্যে জাপানীরা দুইটি বোমা ফেলে ভেঙেছে, একটিতে বর্তমান জেলখানা, একটিতে ব্যাচেলার্স মেস। দুইটি সরকার থেকে ভেঙে সেই ইঁট দিয়ে সেইখানেই নূতন হাসপাতাল তৈরী·হয়েছে। একটি উইংগ্ জরাজীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সবকয়টিই ভেঙে হাসপাতাল বড় করা হবে বলে পরিকল্পনা আছে। ব্রিটিশ রাজত্বের অনুপম কীর্তির স্মারক হিসাবে রাখা হবে একটিমাত্র উইংগ্।

সেলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলাম, কি ছোট্ট ছোট্ট কুঠুরিগুলি, জানালা বলতে ছাদের কাছে ছোট্ট একটি ঘুলঘুলি। সেলের দরজার গায়ে লাগানো তালাগুলি এখনও ঝুলছে। তালা লাগানোর ব্যবস্থা ছিল অদ্ভুত। দরজার বাইরে প্রায় হাতখানেক দূরে দেয়ালের গায়ে গর্ত ক'রে সেখানে কুলুপ এঁটে দিত। উদ্দেশ্য ছিল যাতে কয়েদীর হাত তালা পর্যন্ত না পৌঁছায়। বিরাট বিরাট তালাচাবি। সেলুলার জেলটি ঠিক সমুদ্রের ধারে হলেও কোন কয়েদীর তা চোখে পড়বার উপায় ছিল না। আসবাবপত্র হিসাবে সাধারণ কয়েদীদের দেওয়া হত দুইখানা করে কম্বল, কলাইকরা একটি থালা এবং একটি মগ।

সেকালে সাত বছরের বেশী কারাদণ্ড হলেই দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দিত।

কয়েদী ছিল দুই প্রকারের—'টারম্ কনভিক্ট' এবং 'লাইফ কনভিক্ট'। টারম্ কনভিক্ট হল যাদের নির্দিষ্ট বছরের জন্য মেয়াদ এবং লাইফ কনভিক্ট হল যাদের পঁচিশ বছরের জন্য মেয়াদ। লাইফ কনভিক্ট পঁচিশ বছরের পরও অনেক সময় ফিরে যেতে পারত না। কয়েদখানা ছিল তিন প্রকারের, এ, বি এবং সি। আমরা যখন ঘুরে ঘুরে জেলখানাটি দেখছিলাম মিঃ হর্ষে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলেন। মনে হল তিনি এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। গল্প শুনে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন এক নিদ্রিত পুরীর কাহিনী শুনছি।

প্রথম তিন মাস কয়েদীদের নিয়োগ করা হত তেলের ঘানিতে। বলদের বদলে ঘানি টানতে হত মানুষকে। অসম্ভব পরিশ্রমে কয়েদীরা অনেক সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত, কিন্তু তাতেও তারা মুক্তি পেত না। মুখে মাথায় জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার তাদের ঘানিতে জুড়ে দেওয়া হ'ত। প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কোটা ছিল দৈনিক পনের সের সর্ষের তেল। কোটা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ঘানি টানতে হত। ঘানি ঘোরাবার সময় বিশ্রাম করতে দিত না, তেষ্টা পেলে জল খেতে দিত না, অজ্ঞান হলে থামতে দিত না।

তিন মাস পর ঘানি থেকে সরিয়ে এনে দেওয়া হত নারকেলের ছোবড়া পিটানোর কাজে। এর নাম ছিল 'ছিলকা'। প্রত্যেক কয়েদীকে কুড়িটি নারকেলের ছোবড়া দেওয়া হত। ছোবড়া পিটিয়ে পিটিয়ে ওপরের শক্ত ছাল তুলে ফেলে, ভুষিগুলি ঝরিয়ে ফেলে ভেতরের তারগুলি বার করতে হত। তারগুলি পরিষ্কার করে দৈনিক এক সেরের একটি গোছা করতে হত। সারাদিন ছোবড়া পিটিয়ে কয়েদীদের হাতে ফোস্কা পড়ে যেত, রক্ত বেরিয়ে আসত এবং হাত অসাড় হয়ে যেত।

ছয় মাস পর কয়েদীরা প্রথম সেলুলার জেলের বাইরে আসার সুযোগ পেত। তখন তাদের লাগান হত রাস্তা তৈরী করা, জঙ্গল কাটা, জলা জায়গা পরিষ্কার করা ইত্যাদি নানা ধরনের কাজে। কাজের পর রাত্রিবেলা তাদের হ্যাডো, ডিলানিপুর, জংলীঘাট প্রভৃতি অঞ্চলের ব্যারাকে তালা আটকে রাখা হত।

কর্তৃপক্ষ কয়েদীদের ওপর নির্যাতন করত পশুর মত। আইন-কানুন, ন্যায়-অন্যায় এ সবের কোন বালাই ছিল না। কিছু দিনের মধ্যেই অবিচার, অত্যাচার, নানারকম বিশৃঙ্খল বন্দোবস্ত, রোগ-পীড়া, অপুষ্টিকর খাওয়া-দাওয়া সব মিলিয়ে আন্দামান যেন একটা অভিশপ্ত দ্বীপে পরিণত হল।

পরিত্রাণ পাবার আশায় কয়েদীরা পালাবার সুযোগ খুঁজেছে বারবার। সেই আঠারশ' সাতান্ন সনে কয়েদী উপনিবেশের পত্তন থেকে সুরু করে কয়েদী উপনিবেশের শেষ পর্যন্ত কয়েদীরা পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে, কিন্তু বেশীর ভাগই তাদের চেষ্টা হয়েছে ব্যর্থ। ইংরেজের এমনই কড়া নজর ছিল যে, সেই হাজার হাজার কয়েদীর মধ্যে থেকে একটিও কয়েদী পালালে জাল দিয়ে যেমন মাছ ধরে তেমনি করে আন্দামানের জঙ্গল ও সমুদ্র ছেঁকে তাকে বার করে আনত, তারপর চলত তার উপর অমানুষিক অত্যাচার। ইংরেজের সে নৃশংসতার তুলনা নেই।

জলপথে ডিঙ্গি করে রাত্রিবেলা কয়েদী পালালে প্রথমেই যে দ্বীপ থেকে পালিয়েছে সেই দ্বীপে একটি নীল আলো জ্বলে উঠত, তাই দেখে ধারে কাছের অন্য সব দ্বীপেও নীল আলো জ্বালিয়ে দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ করে সহরশুদ্ধ লোককে জানিয়ে দেওয়া হত ভাগোড়া কয়েদীর কথা। তারপরই বেরিয়ে পড়ত সশস্ত্র বাহিনীশুদ্ধ দুইটি মোটর লঞ্চ, একটি উত্তরে, একটি দক্ষিণে। পনের দিনের মধ্যে ভাগোড়া কয়েদী ধরা না পড়লে ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভারতবর্ষের প্রত্যেক সহরে, এমন কি বর্মা,

মালয়, সিঙ্গাপুর, পেনাঙের বন্দরে বন্দরে কয়েদীদের নাম-ধাম ও চেহারার প্রতিকৃতিশুদ্ধ হুলিয়া বার করতে অনুরোধ জানাতেন।

নানারকম রোগে, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ায় কয়েদীরা খুব বেশী রকম মারা যাচ্ছিল। চিকিৎসার সন্তোষজনক কোন ব্যবস্থা ছিল না। এত কয়েদী মারা যাবার কি কারণ জানবার জন্য ভারত সরকার কমাণ্ডার-ইন-চীফ সার রবার্ট নেপিয়ারকে ১৮৬৩ সনে আন্দামানে পাঠালেন। রবার্ট নেপিয়ার সব দেখে শুনে গভর্ণমেণ্টকে জানালেন, "কয়েদীদের জন্য উপযুক্ত বাড়ীঘরের একান্ত অভাব, চিকিৎসার কোন সুবন্দোবস্ত নেই এবং কয়েদীদের পুষ্টিকর খাদ্য ও ভাল জামাকাপড় দেওয়া প্রয়োজন। এই অভাবগুলি পূরণ হলে মৃত্যুর হার অনেক কমে যাবে।"

১৮৬৪ সনে আন্দামানের শাসনকার্যের দায়িত্ব দেওয়া হল ব্রিটিশ বার্মার চীফ কমিশনারের হাতে। ১৮৬৭ সনে চীফ কমিশনারের সেক্রেটারী মেজর নেলসন ডেভিস আন্দামানে সেট্‌ল্‌মেণ্ট পরিদর্শন করতে এলেন এবং তিনি প্রতি পদে জেল কর্তৃপক্ষের গলদ বার করলেন। নয় বছরের পুরান উপনিবেশটি যে বিন্দুমাত্র উন্নতি লাভ করেনি তাঁর রিপোর্টে সেইটাই প্রমাণিত হল।

১৮৮৬ সনে ভারত গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সি. জে. লায়াল এবং ইন্‌স্‌পেকটার জেনারেল অব জেল্‌স্‌ এ. এস. লেথব্রিজকে আন্দামানে আবার পাঠান হল জেল তদারকির কাজে। এঁরা দুইজন আন্দামানে এসে জেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ফিরে গিয়ে বললেন, "কয়েদীরা ভারতবর্ষের বন্দীশালা থেকে আন্দামান বেশী পছন্দ করে। কয়েদীরা মুক্তি পেয়েও যাতে দ্বীপে পাকাপাকি ভাবে বসত করে, সরকার থেকে তার চেষ্টা করা উচিত। তাদের জন্য একটি বহু কুঠুরিযুক্ত কয়েদখানা প্রয়োজন এবং মেয়েদের পৃথক ভাবে ভিন্ন জেলখানায় রাখা উচিত।"

মাঝে মাঝে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ পরিদর্শকরা এসে সেট্‌ল্‌মেণ্ট

দেখে যেতে লাগলেন এবং ফিরে গিয়ে ভূরি ভূরি প্রশংসা করতে লাগলেন। কিছুদিন পর আন্দামানের শাসনকার্যের ভার আবার বর্মা থেকে ভারত গভর্ণমেণ্টের হাতে এল।

সেলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। নিস্তব্ধ কুঠুরিগুলির পাশ দিয়ে হাঁটবার সময় আমাদের জুতোর আওয়াজগুলি বড় বেশী জোরে কানে বাজছিল। মনে হচ্ছিল এখুনি সেলের ভেতর থেকে হয়ত কেউ বলে উঠবে, 'একটু আস্তে। আমাদের বড় কষ্ট, চাবুক মেরে পিঠ ফাটিয়ে দিয়েছে। দাঁড়া হাতকড়াতে ঝুলে শরীর অসাড় হয়ে গিয়েছে। আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দাও।' মনটা অনেক বছর পিছিয়ে গেল। কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম কুঠুরিতে কুঠুরিতে কয়েদীরা কেউ বসে, কেউ শুয়ে কেউ দাঁড়িয়ে। গরাদের গায়ে কেউ মাথা ঠুকছে, কেউ চীৎকার করছে, কেউ গালাগালি করছে। কোথাও কোথাও টিণ্ডেল জমাদারদের শাসন চলছে, চাবুক মারছে, বেটন মারছে, অসভ্য ভাষায় গালাগালি করছে। সর্বত্র খালি গোলমাল আর গোলমাল।

সেলুলার জেলে ঘুরতে ঘুরতে অন্য একটি মহলে গেলাম। তিনতলায়। লম্বা টানা বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে জেলার মিঃ হর্ষে একটি কুঠুরির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই সেলে বীর সাভারকর থাকতেন।' তাকিয়ে দেখি দরজার ওপরে ইংরেজীতে লেখা আছে 'ভি. ডি. সাভারকর এই সেলে বন্দী ছিলেন'। সেলের ভেতর সাভারকরের একটি ছবিও টানানো রয়েছে। বললাম, "ইস্ কি সাংঘাতিক কথা, সাভারকর এই সেলে বন্দী ছিলেন?" মিঃ হর্ষে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এই উইংগ্স্এ তিনি একেবারে একলা থাকতেন, কথা বলা বা কথা শোনার জন্য ধারে কাছে কোন সেলে কয়েদী রাখা হত না। এটা ছিল সাভারকরের শাস্তি—'সলিটারি কনফাইনমেণ্ট'। আর ঐ দিকের উইংগ্স্এ থাকতেন বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাই পরমানন্দ, পণ্ডিত জগৎরাম।" পর পর তিনি আরও অনেকের নাম বলে গেলেন।

সবাই যে নরহত্যা, লুণ্ঠন, জালিয়াতি ইত্যাদি সমাজবিরোধী কাজের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হত তা নয়। কোন কারণে বিদেশী শাসকদের বিষ নজরে পড়লেই প্রাণদণ্ডের চেয়েও কঠিনতর শাস্তি ছিল কালাপানির পারে নির্বাসন। ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়িয়ে মাতৃভূমির দাসত্ব শৃঙ্খল মোচনের জন্য যে সব বিপ্লবীরা শপথ গ্রহণ করেছিলেন, ইংরেজ সরকার তাদের বন্দী করে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নির্বাসন দিলেন আন্দামানে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে. বিশেষ করে বাংলা দেশে ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে নানা গুপ্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। গোপনে গোপনে বৈঠক বসত, পরামর্শ হত কেমন করে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে আবার দেশকে স্বাধীন করা যায়। বাইরেও কাগজে কাগজে তীব্র সমালোচনা করে, অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দিয়ে সকলে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশ করতেন। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার চেষ্টায় অনেকে মরণপণ করলেন। বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উঠল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। একদল বিশ্বাসী হল সশস্ত্র বিপ্লবে। ইংরেজ বিপদ বুঝে এই সব লোকেদের রাজদ্রোহিতার অপরাধে বন্দী করে জেলে পুরলেন। কিন্তু বিপদ এতে বন্ধ হল না। জেলের ভিতরেও রাজবন্দীরা বক্তৃতা দিতে লাগলেন এবং জেলের সাধারণ কয়েদীরা রাজবন্দীদের ভক্ত হয়ে পড়ল, তারাও স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতে লাগল। এই গুরুতর পরিস্থিতিতে ইংরেজ সরকার রাজবন্দীদের সকলকে আন্দামানে পাঠানোই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন।

বাংলা দেশ, উত্তর প্রদেশ এবং বোম্বাই প্রদেশ থেকে প্রথমদল রাজবন্দীদের আন্দামানে পাঠানো হল উনিশ শ' নয় সনে। সেই সঙ্গে এই নির্দেশও পাঠানো হল—

(১) রাজবন্দীদের বিশেষ বিপজ্জনক আসামী বলে যেন গণ্য করা হয়।

(২) বাঙ্গালী কয়েদীদের যেন রাজবন্দীদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া না হয় কারণ বাঙ্গালী বিপ্লবীর সংখ্যা ছিল সব চেয়ে বেশী।

(৩) রাজবন্দীদের কেরানীর কাজ বা অন্য কোন রকম লেখা-পড়ার কাজ যেন দেওয়া না হয়।

(৪) সকলকে অত্যন্ত কঠিন কায়িক পরিশ্রমের কাজ যেন দেওয়া হয় এবং

(৫) রাজবন্দীদের পরস্পরের সঙ্গে যেন দেখা শোনা না হয়।

এই সব নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে সাধারণ কয়েদীদের চেয়েও খারাপ ব্যবহার করা হত রাজবন্দীদের ওপর! অসম্ভব পরিশ্রমে, ওয়ার্ডার ও জেলারের অভদ্র উদ্ধত ব্যবহারে সকলের প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে উঠত। তারপর সভ্যদেশের অন্যান্য রাজবন্দীদের মত কোন সুবিধাই আন্দামানের রাজবন্দীদের দেওয়া হত না। সামান্য কারণে রোগীর পথ্য কঞ্জি ভক্ষণ, চটের কাপড় পরিধান এবং নির্জন কারাবাস তাঁদের নিত্য প্রাপ্য ছিল।

বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর আন্দামানে এসেছিলেন ১৯১০ সনে—পঞ্চাশ বছরের মেয়াদে। সে সময় জেলার ছিলেন মিঃ ব্যারী। সেলুলার জেলের ইতিহাসে ব্যারী সাহেবের নাম অমর হয়ে থাকবে তাঁর অত্যাচারের জন্য। ব্যারী সাহেব ছিলেন নররূপী শয়তান, তাঁকে বলা হত কালাপানির সম্রাট। কয়েদীরা ভয় করত যমের মত কিংবা তার থেকেও বেশী। প্রথম থেকেই কয়েদীদের মনে ব্যারী সাহেব এই ধারণা ঢুকিয়ে দিতেন যে ইহকালের পরকালের একমাত্র দেবতা তিনি নিজে। ভগবান পোর্টব্লেয়ারের ধারে পাশেও নেই, কাজেই যদি ব্যারী সাহেবের তুষ্টিবিধান কয়েদীরা করতে পারে তবে ভালই, নইলে কি হবে কেউ বলতে পারে না।

সাভারকরকে ব্যারী সাহেব সহ্য করতে পারতেন না একেবারেই, কাজেই ব্যবহার করতেন পশুর মত। সাভারকরকে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে একটি উইংগ্‌স্‌-এ রাখা হয়েছিল। জঘন্য অপরাধে অপরাধী

পাঠান ওয়ার্ডার তাঁর জন্য প্রহরী নিযুক্ত হয়েছিল। সে সময় মুসলমান প্রহরীদের অত্যাচারে হিন্দু কয়েদীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। মুসলমান প্রহরীরা সর্বক্ষণ চেষ্টায় থাকত তাদের রান্না খাইয়ে বা কলমা পড়িয়ে হিন্দুদের মুসলমান করার। জেল কর্তৃপক্ষও সজাগ ছিলেন যাতে হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব না থাকে। তাই বেছে বেছে মুসলমান কয়েদীদের ওয়ার্ডার ও টিণ্ডেলের কাজ দেওয়া হত।

সাধারণ কয়েদী পাঁচ বছর জেল খাটবার পর উপরওয়ালাকে খুশী করতে পারলে ওয়ার্ডার, পেটি অফিসার, টিণ্ডেল ও জমাদারের পদে প্রমোশন পেত। বলা বাহুল্য বেশীর ভাগই এরা ছিল মুসলমান। জেলের ছোটখাট কর্তৃত্বের ভার ছিল এদেরই ওপর।

ব্যারী সাহেবের দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল জেলের মধ্যে। কয়েদীরা সাভারকরকে সমীহ করে ডাকত 'বাবু'। ব্যারী সাহেব অনেক চেষ্টা করে, অনেক ভয় দেখিয়েও 'বাবু' কথাটা বন্ধ করতে পারলেন না। এবং কিছুদিন পর নিজেও সাভারকরকে 'বাবু' বলতে সুরু করলেন। সাভারকরের টিকিটে লেখা ছিল 'বদমাস সে বদমাস'। একদিন কয়েদীদের প্যারেডের সময় সাভারকর প্রথম জানতে পারলেন যে তাঁর ভাই গণেশ পন্থ সাভারকরও আন্দামানে নির্বাসনে এসেছেন।

মানিকতলা বোমা মামলার আসামী ইন্দুভূষণ রায় জেলখানার অপমানে অসহিষ্ণু হয়ে একদিন রাত্রিবেলা ফাঁসী দিয়ে আত্মহত্যা করেন। সেটা ছিল ১৯১২ সন।

উল্লাসকর দত্তকে জেলের বাইরে ইঁট তৈরীর কাজে লাগান হয়েছিল। শরীর অসুস্থ থাকায় মেডিক্যাল অফিসার রোদে কাজ করতে তাঁকে বারণ করেছিলেন। ডাক্তারটি ছিলেন বাঙ্গালী। তাই ব্যারী সাহেব তাঁর কথায় কান দিলেন না। উল্লাসকর দত্ত বাইরে কাজ করতে অস্বীকার করলে তাঁর জন্য সাতদিন দাঁড়া হাতকড়ার ব্যবস্থা হল। কিন্তু সাতদিন পূর্ণ হবার অনেক

আগেই দেখা গেল প্রবল জ্বরে অচৈতন্য হয়ে উল্লাসকর দত্ত দাঁড়া হাতকড়াতে ঝুলছেন। এর পরই তিনি পাগল হয়ে যান। পরে তাঁকে মাদ্রাজের পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ব্রহ্ম ষড়যন্ত্রের আসামী রামরাক্ষা ছিলেন জাতে ব্রাহ্মণ। আন্দামানে আসবার পর তাঁর পৈতা কেড়ে নেওয়া হয়। প্রতিবাদে তিনি অনশন করতে সুরু করেন এবং অনশনেই প্রাণত্যাগ করেন।

১৯১৩ সন। এই সময় নানারকম উড়োখবর ভারতবর্ষে পৌঁছাতে লাগল এবং জনমত আন্দামানের রাজবন্দীদের বিষয়ে সঠিক খবর জানতে চাইল।

উত্তর প্রদেশের এক রাজবন্দী লাদ্দারাম একটি চিঠিতে আদ্যোপান্ত সমস্ত অত্যাচারের কাহিনী লিখে এক ঝাড়ুদারের হাত দিয়ে কেমন করে যেন কলকাতায় পাঠান। 'বেঙ্গলী' কাগজের সম্পাদক সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর হাতে সে চিঠি গিয়ে পৌঁছায় এবং তিনি তা তাঁর কাগজে প্রকাশ করেন। আন্দামানের রাজবন্দীদের প্রতি নির্দয় ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা 'বেঙ্গলী' কাগজে বার হল। লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকাতেও আন্দামানের অত্যাচারের কাহিনী ছাপা হল। জনতা দাবী করল এক কমিশন পাঠানো হোক আন্দামানে, সেখানকার জেল ব্যবস্থার কথা জানবার জন্য।

এর পর ভারত গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সার রেজিল্যাণ্ড ক্র্যাডক আন্দামানে এলেন। কয়েদীরা তাঁর কাছে নালিশ করলে তিনি তা বিশ্বাস করলেন না, রাজবন্দীদের কথা তো কানেই তুললেন না। উপরন্তু জেলার সাহেব যা বোঝালেন তাই বুঝলেন।

যাই হোক ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে অনেক কথা গোপন করলেও ক্র্যাডক সাহেব এ কথা স্বীকার করেছিলেন যে আন্দামানের 'পেনাল সিস্টেম'এর প্রভূত পরিবর্তন প্রয়োজন। ক্র্যাডক সাহেব রাজ-বন্দীদের সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ

"Some of these prisoners were of a specially

dangerous type and had shown qualities of leadership by guiding political and revolutionary movement. These convicts could therefore easily use thousands of convicts as their tools."

কাজেই এই ধরনের বন্দীদের বাইরে রাখা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। বিশেষ করে সাভারকরের মত বিপজ্জনক আসামীকে কোন প্রকারেই বাইরে রাখা নিরাপদ নয়। সেলুলার জেলের বাইরে পাঠালে লোক্যাল লোকেদের ঘুষ দিয়ে স্টীমার জোগাড় করে পালাবে, নয়ত সমুদ্র সাঁতরে পালাবে। এমনকি ভারতবর্ষে পাঠালেও সেখানকার জেল থেকে পালাবে। কাজেই অন্যান্য রাজবন্দীদের দেশে ফেরত পাঠালেও, সাভারকরকে যেন কোনদিনই পাঠানো না হয়।

ঘানি ঘুরানর পরিশ্রম, পানীয় জলের কষ্ট, জেলকর্তৃপক্ষের অত্যাচার, কথায় কথায় ডাণ্ডাবেড়ী, সব মিলিয়ে রাজবন্দীরা ক্ষেপে উঠলেন। সাধারণ কয়েদী অর্থাৎ খুনী, ডাকাতদের যে সুবিধা দেওয়া হত তার কোনটাই তাঁদের দেওয়া হত না।

এই সুবিধা পাবার জন্য রাজবন্দীরা অনশন ধর্মঘট সুরু করেন। লাদ্ধারাম এবং ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এ কাজে প্রথম অগ্রণী হন। তাঁদের দাবির মধ্যে ছিল ভাল খাওয়াপরা, অমানুষিক পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি এবং পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুবিধা।

কর্তৃপক্ষের শত সাবধানতা সত্ত্বেও ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত এবং ননীগোপাল মুখার্জীর কথা দেশে গিয়ে পৌঁছাল। ননীগোপাল মুখার্জীকে অনশনের মধ্যেই দাঁড়া হাতকড়ায় ঝুলিয়ে রেখেছিল।

সঠিক অবস্থাটা জানবার জন্য সার পার্সি লুকাস্ (ডাইরেক্টর অব মেডিক্যাল সারভিস) আন্দামানে এলেন। তিনি আসাতে রাজবন্দী এবং জেলকর্তৃপক্ষের মধ্যে একটা রফা হল, এর পর রাজবন্দীদের পরিশ্রমের পরিমাণ খানিকটা কমে গেল। অনেককে জেলের বাইরে

কাজ করতে পাঠান হল, তা ছাড়া কিছু বইও পড়তে অনুমতি দেওয়া হল।

লুকাস সাহেব চলে গেলে নিয়ম করে রাজনৈতিক বন্দীদের বাইরে কাজ করতে পাঠানো সুরু হল। কিছুদিন পর হঠাৎ গুজব শোনা গেল মানিকতলা বোমা মামলার আসামীরা বোমা তৈরী করছে এবং বোমা ফেলে সমস্ত সেলুলার জেল উড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করছে। সেল্‌ফ সাপোর্টার কয়েদীরা এবং অন্যান্য সাধারণ কয়েদীরা রাজবন্দীদের সহযোগিতা করছে। জেল সুপার ভয় পেয়ে সব রাজবন্দীদের বাইরের কাজ বন্ধ করে দিলেন এবং সকলকে আবার জেলের মধ্যে পুরলেন।

যাই হোক বছরে বছরে অসংখ্য রাজবন্দী আন্দামানে আসতে লাগল এবং জেলে স্থানাভাব হয়ে পড়ল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর এক জেল কমিটী আন্দামান দেখে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিল—

"The retention of transportation to the Andamans at the present scale, even if an increased and improved staff was provided, was undesirable and should not be attempted······Depotation to the Andamans should cease except in regard to such prisoners as the Governor General in Council may by special or general rule direct."

জেল কমিটী জেল তদারক করে ফিরে গেলে জেলের বিধি-ব্যবস্থার সামান্য উন্নতি হল।

১৯১৫ সনে এলো গদর পার্টির শিখরা, রাজদ্রোহিতার অপরাধে বন্দী হয়ে।

পাঞ্জাবের একদল শিখ ভারতবর্ষের বাইরে বর্মা, হংকং,

ফিলিপাইন হয়ে আমেরিকা যায় জীবিকার সন্ধানে। সেখানে গিয়ে সকলে দিনমজুরের কাজ নেয়। মজুরি ভাল, খাওয়া দাওয়া ভাল, হাতে পয়সাও জমে ভাল, কাজেই সকলেই মহাখুশী। স্বাধীন দেশের স্বাধীন আবহাওয়ায় থাকতে থাকতে কিছুদিন পর এই শিখদের মনে একটা পরিবর্তন এল। তারা ভাবল 'এ আমরা কি করছি? পরের দেশে গোলামী?' পয়সা পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু সম্মান কোথায়? তা ছাড়া সাদা চামড়ার মজুরদের চেয়ে বেশী কর্মঠ হলেও ব্যবহার পায় ভিন্ন রকমের। এর কারণ নিশ্চয়ই তারা পরাধীন দেশের লোক বলে।

এই সময় থেকেই ভারতীয় শিখ মজুরেরা স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতে লাগল। লালা হরদয়ালের নেতৃত্বে ভারতীয়দের এক বিরাট সভা বসল। এই সভায় প্রথম সৃষ্টি হল 'গদর পার্টি'র। গদর শব্দের অর্থ বিপ্লব। সভ্যরা শপথ গ্রহণ করল ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ রাজত্ব উৎখাত করার চেষ্টায় সকলে জীবন পণ করবে। ভারত এবং ভারতের বাইরে প্রচার করার জন্য নূতন পত্রিকা বার হল 'এল গদর'। সম্পাদক ছিলেন রামচন্দ্র। সানফ্রানসিস্‌কোর এক ছাপাখানা থেকে 'গদর' পত্রিকা ছাপা হতে লাগল। টাকা আসতে লাগল চারদিক থেকে হু হু করে। উদ্দীপনাময় বাণী ও কবিতা ছাপা হতে লাগল। আমেরিকার সমস্ত ভারতীয় মজুর সাগ্রহে এই পত্রিকা পড়তে লাগল।

কানাডাতেও হাজার হাজার শিখ গিয়েছিল। মজুরের কাজ ছাড়া ক্ষেত জঙ্গল এবং কারখানায়ও এরা সব কাজ করত। কিছুদিনের মধ্যেই তারাও সকলে গদর পার্টির সভ্য হল এবং একটি বেশ বড় দল সংগঠিত হল। গদর পার্টির সভ্যদের সংখ্যাধিক্যে এবং প্রতাপ দেখে কানাডা সরকার ভবিষ্যৎ গোলমালের আশঙ্কায় ভারতবর্ষ থেকে আর মজুর আনাতে অস্বীকার করলেন। ওজর দেখানো হল জাহাজের অভাব। গদর পার্টির এক সভ্য গুরুদত্ত সিং সিঙ্গাপুরে তখন

ঠিকাদারের কাজ করতেন। কানাডা সরকারের বাহানা শুনে তিনি 'কোমাগাতামারু' নামে এক জাপানী জাহাজ ভাড়া করেন। এই জাহাজে করে কলকাতা থেকে চারশ' জন গদর সভ্য কানাডা রওনা দিল। কিন্তু কানাডা সরকার তাদের নামতে অনুমতি না দেওয়ায় তাদের আবার ফিরে আসতে হল। ১৯১৪ সনে প্রায় একশ' জন গদর সভ্য গোপনে আমেরিকা থেকে 'কোমাগাতামারু' জাহাজে করে পালিয়ে এল ভারতবর্ষে। বজবজে এই যাত্রীরা ধরা পড়ল। অনেকে সংঘর্ষে মারা পড়ল, অনেকে বন্দী হল। বজবজে সেই পবিত্র স্মৃতি বহনকারী এক স্মৃতিস্তম্ভ সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে এবং স্তম্ভ গাত্রে সুন্দর ভাবে সেই ঐতিহাসিক সংঘর্ষের অনেকগুলি চিত্র খোদিত হয়েছে।

গদর পার্টির সভ্যরা অনেকেই পরে লাহোর ষড়যন্ত্রে যোগদান করেছিল। ধরা পড়ায় বিচারে তাদের প্রথমে ফাঁসীর হুকুম হয়, পরে ফাঁসী রদ হয়ে আঠারজন দ্বীপান্তরের দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র বাইরে থেকে এনে গদর পার্টির সভ্যরাই সরবরাহ করত।

অন্য রাজবন্দীদের থেকে গদর পার্টির রাজবন্দীরা ছিল ব্যতিক্রম। ছয় ফুট লম্বা, দেড়শ পাউণ্ড ওজনের দৈত্যের মত মানুষগুলি সেলুলার জেলে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গোলমাল সুরু করল। সামান্য ভাত, দুই টুকরো রুটি, জলের মত ডাল ও কতকগুলি লতাপাতা সিদ্ধ খেয়ে তাদের পেটের অর্ধেকও ভরে না, তার উপর অমানুষিক পরিশ্রম তো আছেই। ক্ষিধেয় তারা পাগলের মত ছটফট করে আর কর্তৃপক্ষের মুণ্ডপাত করে।

ঝাঁসীর মানুষ ভাই পরমানন্দ এবং কলকাতার আশুতোষ লাহিড়ী একদিন ব্যারী সাহেবের অশ্লীল গালাগালে উত্যক্ত হয়ে তাকে তুলে আছাড় মারেন। শাস্তিস্বরূপ দুইজনেই দারুণ ভাবে প্রহৃত হন। গদর দলের সকলে প্রতিবাদ স্বরূপ ধর্মঘট করে বসে রইল। চীফ

কমিশনার এসে তাদের কাজে যোগ দিতে বললে তারা অস্বীকার করল। প্রত্যেকের টিকিটে লিখে দেওয়া হল 'ছয়মাস নির্জন কারাবাস, ছয়মাস ডাণ্ডাবেড়ী, ছয়মাস রোগীর পথ্য ও সাতদিন দাঁড়া হাতকড়া'।

সর্দার পৃথ্বী সিং অনশন ধর্মঘট করায় জোর করে নল দিয়ে তাঁকে খাওয়ান হত। এই অত্যাচারের ফলে পৃথ্বী সিং-এর অবস্থা মরণাপন্ন হয়ে পড়ল।

গদর পার্টির সভ্যরা ধর্মঘট, অনশনের পর অনশন করে জেল কর্তৃপক্ষকে উত্যক্ত করে তুলেছিল। জেলের অত্যাচারে গদর দলের আটজন পাঞ্জাবী মারা যায়। ১৯২১ সনে গদর দলের সকলে আন্দামান থেকে ভারতবর্ষে ফিরে যায়। ১৯২৬ সনে বাকী রাজ-বন্দীদেরও সকলকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

রাজবন্দীদের আর দ্বীপান্তরে পাঠানো হবে না সরকার থেকে শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই সরকারের মত বদলে গেল। ১৯৩২ সন থেকে আবার সুরু হল রাজবন্দীদের দ্বীপান্তরে নির্বাসন। অল্প কয়েকমাসের ব্যবধানে প্রায় তিনশ' রাজবন্দী আন্দামানে এসে পড়লেন। এবার যাঁরা এলেন তাঁদের রাজনৈতিক বন্দী না বলে বলা হল বিপ্লবী টেরারিস্ট্—সন্ত্রাসবাদী। এই বিপ্লবীদের মন্ত্র ছিল,

'অমর মরণ রক্ত চরণ নাচিছে সগৌরবে
সময় হয়েছে নিকট এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।'

সেলুলার জেলের প্রচলিত বিধিব্যবস্থা এই নূতন বিপ্লবীরা মানতে চাইলেন না। সেলের দেয়ালগুলি অর্ধভগ্ন, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, কুঠুরীগুলি অন্ধকার, শোবার জন্য খাট নেই, চিকিৎসার ভালো বন্দোবস্ত নেই, খাবার জিনিস দেওয়া হয় অতি নিকৃষ্ট ধরনের। অল্প দিনের মধ্যেই বিপ্লবীরা রক্ত আমাশয়, ম্যালেরিয়া, কৃমিবিকার প্রভৃতি নানারকম রোগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

বিভিন্ন টেরারিস্ট্ পার্টির সভ্যরা আসতে লাগলেন। তারমধ্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা, কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সভ্যরাই ছিলেন সংখ্যাধিক।

১৯৩৩ সনে বিপ্লবীরা অনশন ধর্মঘট সুরু করলেন। মহাবীর সিং নামে একজন রাজপুত বিপ্লবীকে নল দিয়ে দুধ খাওয়াতে যাওয়ায় তিনি মারা যান। এরপর অনশনকারীদের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়তে লাগল। হাজার ভয় প্রদর্শন করে বা মিথ্যা স্তোকবাক্য বলেও তাদের অনশন বন্ধ করা গেল না। আবার জোর করে দুধ খাওয়াতে গিয়ে মোহিত কুমার মৈত্র এবং মোহন কিশোর মারা যান। চিকিৎসার অভাবে মানকৃষ্ণ নাম দাস নিউমোনিয়ায় মারা যান।

চারজন বিপ্লবীর মৃত্যুসংবাদ যখন ভারতবর্ষে গিয়ে পৌঁছাল তখন সেখানে তুমুল আন্দোলন সুরু হল।

সারা ভারতবর্ষের লোক গভর্ণমেণ্টের কাছে এর প্রতিকারের জন্য দাবি জানাল। এবার অনুসন্ধানের জন্য এলেন কর্ণেল বার্কার, ইনস্পেক্টার জেনারেল অফ পুলিশ। তিনি এসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একজোট হয়ে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধেই মতামত দিলেন। তাঁর পরামর্শে অনশনকারী বিপ্লবীদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জল খেতে দেওয়া হল না, ফলে অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, তবুও কিছুতেই আত্মসমর্পণ করলেন না। অবশেষে কর্ণেল বার্কার একটা রফা করতে রাজী হলেন।

ছেচল্লিশ দিন পর বিপ্লবীরা অনশন ভঙ্গ করলেন। বিপ্লবীদের দাবি এরপর কর্তৃপক্ষ মেনে নিলেন। বিছানাপত্র, মশারি, খাট, টেবিল, চেয়ার রাজবন্দীদের দেওয়া হল। খাবার ব্যবস্থারও উন্নতি হল। রান্নাঘরের তদারকির ভারও তাঁদের ওপর দেওয়া হল। সবচেয়ে বড় কথা হল এই অনশনের পরে জেল কর্তৃপক্ষের ব্যবহার অনেক ভদ্র হয়ে গেল। একটি লাইব্রেরী খোলা হল। এর পরের কয়েক বছর রাজবন্দীদের অবস্থার অনেক উন্নতি হল। সকলে

প্রচুর পড়াশোনা করতে লাগলেন, হাতে লিখে একটি ম্যাগাজিন বার করলেন 'Call'।

আন্দামানের লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার মিঃ এন. এইচ্. ইয়াং প্রায় ত্রিশ বছর হয় এখানে আছেন। তিনি একসময়ে সেলুলার জেলের জেলার ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে সময় রাজবন্দীদের অবস্থা কেমন ছিল। মিঃ ইয়াং বলেছেন, "প্রথম দিকে রাজবন্দীদের উপর খুবই অত্যাচার করা হত কিন্তু উনিশশ' তিরিশের পর থেকে ব্যবস্থা অনেক বদলে যায়। আমি নিজে অনন্ত সিং, লোকনাথ বল এবং আরও অনেকের সঙ্গে ভলিবল খেলেছি, ব্যাডমিণ্টন খেলেছি। থিয়েটারে যোগ দিয়েছি। দুর্গাপূজার সময় তাদের সাহায্য করেছি। ভাল খাবার দাবার দেওয়া হত এবং রিক্রিয়েশনের বন্দোবস্তও ছিল।"

মিঃ ইয়াং জাতে ফিরিঙ্গি। ছিলেন জেলার সাহেব, কাজেই তাঁর কথা কিছুটা অতিরঞ্জন হলেও রাজবন্দীদের অবস্থার যে উন্নতি হয়েছিল সেটা ঠিকই।

অনন্ত ভট্টাচার্যের 'আন্দামান বন্দী' থেকে সে সময়ের একটা চিত্র পাওয়া যায়ঃ

"পড়াশোনা চলতে লাগল পুরোদমে। বাস্তবিকই আন্দামান একটা ইউনিভার্সিটি হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রচুর বই, প্রচুর শিক্ষা। কেউ কেউ আঠার ঘণ্টা, বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রতিদিন পড়ত।

কলকাতা থেকে, ভারতের বাইরে থেকে অর্থশালী কমরেডরা বিখ্যাত বিখ্যাত বই আনাতেন। নানা দেশী বিদেশী সাময়িক পত্রিকা আসত।"

"বছরে দুবার করে আনন্দ উৎসবও চলত। সেবার প্রচুর উদ্যমে 'সীতা' নাটক অভিনয় করা হল। আর একদিন পাল্লা দিয়ে 'জনা' যাত্রাভিনয়ও হল—থিয়েটারের চেয়ে কোন অংশে খারাপ হয়নি সে যাত্রাভিনয়।"

"নিজে না পারলেও হাসপাতালে বসে বসে খেলা দেখতাম। ফুটবল, ভলি, ব্যাডমিণ্টন—ব্যায়াম। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল অনন্ত সিংএর কাঠের রাইফেল দিয়ে ছেলেদের মিলিটারি প্যারেড।"

"মে ডে পালন করতে হবে। আলোচনা সুরু হল কি করে এই দিনটি সাফল্য মণ্ডিত করা যায়। অথরিটীর সঙ্গে চলছে খুব বিবাদ। অথচ তারই মধ্যে আমাদের মে ডে উদযাপন করতে হবে। আয়োজন চলতে লাগল।

মে ডে এল।

গেট থেকে তিন নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত নিজেদের পাহারা বসিয়ে তিন তলাতে সভা আরম্ভ করে দিলাম। ···বৈকালে লাল রং-এর কাপড় রাঙিয়ে অভিনব কায়দায় রঙ্গমঞ্চ বাঁধা হল। অভিনয় সুরু হল গর্কির 'মাদার'-এর নাট্যরূপ—আমরাই দিয়ে নিয়েছিলাম। অভিনয় দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আজ পর্যন্ত যত অভিনয় দেখেছি তত মুগ্ধ আর কোনদিন হইনি।"

সব ব্যাপারেই নিয়ম কানুন এত বদলে গিয়েছিল যে ভাবলে অবাক হতে হয়। জেল কম্পাউণ্ডের ভেতর রাজবন্দীরা নানা উৎসব পালন করতেন, মে ডে পালন করতেন, দুর্গাপূজা করতেন, নাটকাভিনয় করতেন। এই সব উৎসবে জেলার সাহেব থেকে অন্য সব অফিসার ও কর্মচারীরা দর্শক হয়ে আসতেন।

পরবর্তী যুগে জেলের মধ্যে রাজবন্দীদের ভিন্ন ভিন্ন দল গঠিত হয়েছিল। অনুশীলন পার্টি, যুগান্তর পার্টি, চিটাগাং পার্টি, কম্যুনিস্ট পার্টি, রিভোল্টিং পার্টি, শ্রী সংঘম্ পার্টি এবং আরও অনেক পার্টি। তার উপর বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী এবং মহারাষ্ট্রীয় রাজবন্দীদের মধ্যে কিছুটা প্রাদেশিকতা এবং দলাদলিও দেখা দিয়েছিল।

কিছুদিন পর আবার সুরু হল গোলমাল। সামান্য কারণে রাজবন্দীদের চাবুক মারা এবং অন্য শাস্তি দেওয়া সুরু হল। রাজ-বন্দীরাও কম যেতেন না। ফাঁক পেলেই জেল কর্তৃপক্ষের ওপর

শোধ নিতেন, যে কোন উপায়ে। জেলার সাহেবকে কাছে পেলে কেউ হয়ত হাতকড়া শুদ্ধ হাত উঠিয়ে তার মাথায় আঘাত করে বসতেন। কেউ হয়ত হাতের কাছে জুতো পেলে তাই দিয়েই দু'ঘা মেরে বসতেন। ফল হত অবশ্য অত্যন্ত খারাপ। চীফ কমিশনারের কাছে নালিশ গেলে শাস্তি হত চাবুকের বাড়ি (flogging), দাঁড়া-হাতকড়া এবং ডাণ্ডাবেড়ী (cross bar fetters)।

ধীরে ধীরে আবার অসন্তোষের গুঞ্জন উঠল। যে সব সুবিধা রাজবন্দীরা পাচ্ছিলেন তা কমে যেতে লাগল।

এই সময় দেশে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস দাবি করল আন্দামান থেকে রাজবন্দীদের ফিরিয়ে আনা হোক। ভারতের সমগ্র জনতা কংগ্রেসের সঙ্গে একমত হল। কেন্দ্রীয় পরিষদে আন্দামানের বন্দীদের বিষয় বহু প্রশ্ন করা হল। এই অবস্থায় ভারত গভর্ণমেণ্টের হোম সেক্রেটারী সার হেনরি ক্রেক (Henry Craik) পোর্টব্লেয়ারে অবস্থাটা দেখতে এলেন। রাজবন্দীরা তাঁর কাছে কয়েকটি দাবি পেশ করলেন ঃ

'সদয় ব্যবহার, লেখাপড়া শেখার সুবিধা, পরীক্ষা দেবার সুযোগ, মাসিক পত্রিকা ও বই কেনার স্বাধীনতা, ভাল জামাকাপড় এবং সামান্য মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা। সর্বশেষ সমস্ত রাজবন্দীদের দেশে ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করা।'

সার হেনরি ক্রেক সিমলাতে ফিরে গিয়ে প্রেস কনফারেন্সে বললেন, 'আন্দামান স্বর্গের মত সুন্দর—এ প্যারাডাইস।' তিনি আরও বললেন, আন্দামানের রাজবন্দীরা সেখানে অনেক সুখে আছে, তাছাড়া তাদের সেরকম কোন নালিশও নেই। রাজবন্দীরা হেনরি ক্রেকের কাছে যে দাবি করেছিলেন তিনি তার উল্লেখও করলেন না।

সার হেনরি ক্রেকের এই রিপোর্ট শুনে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ-নৈতিক দলগুলি ক্ষেপে উঠল মিথ্যা প্রচারের জন্য। কেন্দ্রীয় পরিষদের একজন সভ্য বিদ্রূপ করে বললেন, "আন্দামান যখন এতই

সুন্দর তখন রাজধানী দিল্লী থেকে সরিয়ে আন্দামানে নিয়ে যাওয়া হোক।”

জনমতের দাবি অগ্রাহ্য করতে না পেরে গভর্ণমেণ্ট আবার এক ডেপুটেশন পাঠালেন আন্দামানে। কংগ্রেসের মেম্বার রায়জাদা হংসরাজ এবং মুসলীম লীগের মেম্বার মহম্মদ ইয়াসিন খাঁ। রায়জাদার সঙ্গে পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের আলাপ ছিল। তিনি পরিদর্শনে এসে সব দেখলেন এবং শুনলেন। সমস্ত দেখে শুনে তিনি বললেন, ‘এবার আমি হোম মেম্বার মহাশয়কে কিছুদিন এই ভূস্বর্গে বাস করবার জন্য পাঠিয়ে দেবো।’ যাবার সময় তিনি একসেট বই রাজবন্দীদের লাই-ব্রেরীতে উপহার দিয়ে গেলেন। রায়জাদা হংসরাজ এবং ইয়াসিন খাঁ ফিরে গিয়ে আসল অবস্থাটা গভর্ণমেণ্টকে জানালেন।

সর্বশেষে অনশন শুরু হয় ১৯৩৭ সনের ২৫শে জুলাই। দাবি দেশে ফিরে যাওয়া। আন্দামানের অনশনের খবর পেয়ে ভারতবর্ষে দেওলি, বহরমপুর, এবং আলিপুর জেলেও রাজবন্দীরা অনশন সুরু করলেন। কংগ্রেস থেকে পীড়াপীড়ি সুরু হল আন্দামানের বন্দীদের ফিরিয়ে আনার জন্য।

ফজলুল হক, ভুলাভাই দেশাই, সত্যমূর্তি আন্দামানে টেলিগ্রাম পাঠালেন অনশন বন্ধ করার জন্য। কোন ফল হল না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর তরফ থেকে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু টেলিগ্রাম পাঠালেন, তাতেও কিছু হল না। ২৮ শে আগস্ট মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর তরফ থেকে টেলিগ্রাম পাঠালেন অনশন বন্ধ করার জন্য। তিনি জানালেন, ‘বিপ্লবের পথ ছেড়ে শান্তির পথে থেকে যুদ্ধ কর। হিংসার পথে না গিয়ে অহিংসার পথে যাও। সমগ্র দেশ এবং আমি তোমাদের দাবি মেনে নিয়েছি। তোমাদের সংগ্রাম বন্ধ কর।’

গান্ধীজীর টেলিগ্রাম পেয়ে রাত্রিবেলা সেলুলার জেলে সভা বসল এবং সকলে জাতির জনকের অনুরোধ রক্ষা করার জন্য অনশন ভঙ্গ

করতে রাজী হলেন। রাজবন্দীরা গান্ধীজীকে জানালেন, "আমরা যে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করতাম, সে বিশ্বাস আমাদের ভেঙ্গে গিয়েছে, আমরা বুঝতে পেরেছি দেশোদ্ধারের জন্য এ পথ ভুল পথ।'

অনশন ভঙ্গের খবর পেয়ে ভারতবর্ষে সকলে দারুণ খুশী হয়ে উঠল। এর কিছুদিন পরই রাজবন্দীরা দেশে ফিরে যান। ১৯৩৭ সনের ২২শে সেপ্টেম্বর রাজবন্দীর দল পোর্টব্লেয়ার থেকে 'মহারাজা' জাহাজে করে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

আন্দামানে কোন মেয়ে, রাজনৈতিক বন্দী হয়ে দ্বীপান্তরে আসেনি। কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, শান্তি চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজনের দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত সে আদেশ বাতিল করা হয়।

নিষ্ঠুরতম অত্যাচারেও বিপ্লবীরা কোনদিন 'ব্রিটিশ ইম্পিরিয়া-লিজম্'-এর কাছে হার মানেন নি। বিভিন্ন পার্টির সদস্যরা সকলে একমন একপ্রাণ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। মুক্তি পেয়ে যখন সকলে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন তখন সকলেই প্রায় অশক্ত, পঙ্গু এবং বিকলাঙ্গ।

সমস্ত জেলখানাটি ঘুরে বিপ্লবীদের উইংস্-এর সামনে দাঁড়িয়ে সকলের অলক্ষ্যে হাত জোড় করে স্বাধীনতার পূজারীদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম। মনে মনে বললাম, 'ওগো বিস্মৃত অগ্নিসাধকের দল, আজ তোমরা কে কোথায় আছ জানি না। তোমাদের উদ্দেশ্যে জানাই আমার প্রণতি।'

বাইরে এসে সেলুলার জেলের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। ভাবছিলাম এই ভগ্নপ্রায় কুঠুরিগুলির মধ্যে আজ কোন চিহ্ন নেই, কিন্তু এক সময় এর ভেতরে হাজার হাজার দোষী নির্দোষী মানুষ ইংরেজের নিষ্ঠুর অত্যাচারে পাগল হয়ে গিয়েছে। তাদের বুকভাঙ্গা আর্ত চীৎকার জেলের পাঁচিলের এ পারে এসে পৌঁছাত না। মার

খেয়েছে, পড়ে পড়ে অত্যাচার সয়েছে, কেঁদেছে। তাদের সে কান্নার সাক্ষী ছিলেন একমাত্র অন্তর্যামী ভগবান।

আজ এতদিন পরে সেলুলার জেল আমাদের কাছে একটি ঐতিহাসিক স্মৃতি সৌধের মত মনে হয়। সকলেই অবশ্য দ্রষ্টব্য স্থান বলে দেখতে আসেন। কিন্তু এর পেছনকার বিভীষিকাময় দিনগুলির কথা আজ কেউ কল্পনাও করতে পারবেন না। আন্দামানের সেলুলার জেলের অত্যাচারের সঙ্গে ব্যাস্টিলের অত্যাচারের তুলনা করা হয়। অনেকে আন্দামানকে বলতেন 'আন্দামান ভারতের ব্যাস্টিল'।

'যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর' শাস্তির উদ্দেশ্য ছিল নির্জন কারাবাসে রেখে, আত্মীয় স্বজন থেকে বহুদূরে নির্বাসিত করে, নিয়মাধীনে রেখে কয়েদীদের চরিত্র সংশোধন করা। উদ্দেশ্য যা ছিল তা কোন-দিনই সফল হয়নি।

ইংল্যাণ্ডের অস্ট্রেলিয়াতে নির্বাসন দণ্ড এবং রাশিয়ার সাইবেরিয়াতে নির্বাসন দণ্ড একই রকমের বিভীষিকার চিহ্ন এঁকে রেখেছে।

'There was much that was good and healthy in transportation, but the guilt and stain round the rocks of these dreadful prisons will hang and linger in the memory of mankind, till the ocean of time, which is vaster than Pacific, ·engulfs them and sweeps them and us, away'. (Ives)

পোর্টব্লেয়ারের আশে পাশে বহু ছোট বড় গ্রাম। একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব খুব বেশী নয়। এই সব গ্রামের লোকেরা ক্ষেত খামার, হাঁস মুরগী, গরু বাছুর, বাগ বাগিচা নিয়ে বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। মেহনতও করে প্রচুর। এই সব গ্রামবাসীরা জীবন আরম্ভ করে-ছিল সেলফ্‌ সাপোর্টার হয়ে।

সেলুলার জেলে থাকাকালীন সৎস্বভাব ও সদ্ব্যবহারের পরিচয় দিলে তিন বছর পর কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া হত। তারা নিজের ইচ্ছামত জীবিকা বেছে নিত। যেমন কোন ব্যবসা করা, সরকারী কাজে জনমজুর খাটা, ক্ষেতিবাড়ী করা ইত্যাদি। জেলখানার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক থাকত না, শুধু হাজিরা দেওয়া ছাড়া। কয়েদীদের টিকিটের বদলে তাদের 'টিকেট অফ লিভ' বা সেলফ্ সাপোর্টারের টিকিট পরতে হত কিন্তু কয়েদীর পোশাক পরতে হত না। যেখানে ইচ্ছা সেখানে এই কয়েদীরা যেতে পারত না। জীবিকার জন্য যে কাজই করুক না কেন নিজের এলাকার বাইরে যাবার হুকুম ছিল না। যেমন হ্যাডোর সেল্ফ্ সাপোর্টার জংলীঘাট বা ডিলানিপুর যেতে পারত না; তাকে হ্যাডোতেই থাকতে হত। এই ধরনের গণ্ডীবদ্ধ জীবনে তারা বেশ আনন্দেই থাকত এবং এই জীবনে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ত যে পরে মুক্তি পেয়েও অনেকে ফিরে যেতে চাইত না।

পোর্টব্লেয়ারের বর্তমান ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকে সেল্ফ্ সাপোর্টার হয়ে জীবন আরম্ভ করেছিল।

আন্দামানে যে সব কয়েদী দ্বীপান্তরে আসত তারা ছিল সমাজের অবাঞ্ছিত জীব। এখানে থাকাকালীন কঠোর নিয়মের মধ্যে থেকে তারা নানাধরনের কাজ করার শিক্ষা পেত। দশ বছর শিক্ষানবিশ থাকবার পর কয়েদীরা স্বাধীনভাবে নিজেদের বাড়ীঘর করে থাকার অনুমতি পেত। এই ভাবে পনের কুড়ি বছর থাকবার পর কয়েদীরা সম্পূর্ণ বদলে যেত এবং দেশে ফিরে গিয়ে নাগরিক জীবনে তাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হত না। মিঃ বডেন ক্লস বলেছেন:

"The difference between transportation to Port Blair and imprisonment in a jail, is, that Port Blair returned convict is a man fitted to support himself, whereas the prisoner released from a jail, is not only a pauper but has been pauperised".

পোর্টব্লেয়ারের কয়েদী উপনিবেশের প্রতিটি গঠনমূলক কাজের পিছনে রয়েছে কয়েদীদের রক্তজলকরা পরিশ্রমের ফল। নির্যাতন ও নিপীড়নে তারা বাধ্য হয়েছে জীবন পণ করে জঙ্গল কেটে, জলা পরিষ্কার করে, রাস্তা তৈরী করে, কুঠীবাড়ী নির্মাণ করে সর্বরকমে বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর সুখের আয়োজন করতে। কয়েদীদের পরিশ্রমে ও চেষ্টায় একটি অরণ্যময় দ্বীপ ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে সুন্দর একটি লোকালয়ে। স্বাধীনতার পর ভারত গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় আন্দামানের দিন দিন উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু যারা এই লোকালয়ের পত্তন করেছিল, যাদের জীবনের বদলে এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তাদের দানের কথাও আমাদের মনে থাকবে চিরকাল।

পোর্টব্লেয়ারে আসবার পর গুপ্তসাহেব খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কাজকর্ম নিয়ে। বিশেষ করে রাস্তার কাজ দেখতে অনেক দূরে দূরে যেতে হচ্ছিল। আন্দামানের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পূর্ত বিভাগ। জনতার দিক দিয়েও পূর্ত বিভাগের লোকই বেশী। কিন্তু পেনাল সেট্‌লমেণ্টের গোড়ার দিকে ছিল বনবিভাগের লোকই বেশী। সারা দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে বাড়ী ঘর, স্কুল, রিজারভর, জেটি সর্বপ্রকার নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সব চেয়ে বেশী হচ্ছে রাস্তা তৈরীর কাজ। ব্রিটিশ আমলেও এই দ্বীপপুঞ্জে রাস্তা তৈরীর কাজই হত বেশী। পোর্টব্লেয়ারের বুক চিরে নানা দিকে নানা রাস্তা তৈরী হচ্ছে, যার ফলে আজ সহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত 'বাস সারভিস' চালু হয়েছে। সহরের বাইরেও প্রতিটি উদ্বাস্তু কলোনীর সামনে দিয়ে পাকা রাস্তা চলে গিয়েছে। দক্ষিণ আন্দামান থেকে উত্তর আন্দামান পর্যন্ত একটি বিরাট লম্বা রাস্তা তৈরী হচ্ছে—গ্রেট আন্দামান ট্রাঙ্ক রোড। লম্বায় প্রায় দুশ' মাইল। এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যেতে হলে যে প্রণালী পার হতে হয় সেখানে তৈরী হবে 'পণ্টুন ব্রিজ'। ভবিষ্যতে 'উইক এণ্ড' করার জন্য পোর্টব্লেয়ার

থেকে রওনা হয়ে লং আয়ল্যাণ্ড, রঙ্গত, মায়াবন্দর ও ডিগলিপুর যাওয়া খুব সহজ হয়ে পড়বে। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, পাহাড়ের বুকের ওপর দিয়ে, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে এই রাস্তা তৈরী করতে হয়। অনেক সময় জারোয়া এলাকার পাশ দিয়ে রাস্তা তৈরীর সময় মজুরেরা জারোয়ার হাতে প্রাণ দেয়।

আন্দামানে জলের বড় অভাব। যদিও চারিদিকে জল থৈ থৈ করছে কিন্তু গ্রীষ্মকালে এমন অবস্থা হয় যে রান্না হয়তো স্নান হয় না, স্নান হয়তো রান্না হয় না। 'জল' 'জল' করে চারিদিকে হাহাকার পড়ে যায়। ভগবানের দয়ায় বৃষ্টি যদি নামে তবে সবার বাড়ীতেই টিনের চালের নীচে ড্রাম বসে যায় জলের জন্য। এমনিতেও বৃষ্টির জলের ওপরই ভরসা। বৃষ্টির জল জমিয়ে সারা বছর সরবরাহ করা হয়। ইংরেজরা পঞ্চাশ বছর আগে একটি রিজারভর তৈরী করেছিল 'ডিল থাম্মান ট্যাঙ্ক'। জনসংখ্যা কম ছিল বলে একরকমে কুলিয়ে যেত। সম্প্রতি ডেয়ারি ফার্মের কাছে তিনপাহাড়ের মাঝখানে বিরাট একটি রিজারভর তৈরী হয়েছে। আশানুরূপ বৃষ্টি হলে পোর্টব্লেয়ারে এরপর আর জলের কষ্ট থাকবে না। ১৯৬৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এসেছিলেন পোর্টব্লেয়ারে। তিনি রিজারভরটির নামকরণ করলেন 'জহর সরোবর।'

শাস্ত্রীজী ছিলেন ভারী রসিক মানুষ। সব সময় তাঁর কথাবার্তার মধ্যে একটা হাল্কা সুর মেশানো থাকত। রিজারভরের উদ্বোধন ও নামকরণের দিন তিনি বললেন, "আমাকে এই জলাশয়ের নামকরণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। উদ্যোক্তারা প্রথমেই নাম ঠিক করে শ্বেত পাথরে খোদাই করে রাখেন, পরে নামকো ওয়াস্তে পাথরে ঢাকা পর্দাটুকু সরিয়ে আমরা নামকরণ পর্ব শেষ করি। কালকেও এইভাবে হাসপাতালের নামকরণ করেছি। আজও তাই করব। কিন্তু দেখুন গিয়ে নাম লেখা ফলকটুকু আগেই সাজিয়ে রাখা হয়েছে, শুধু পর্দাটুকু সরানোর অপেক্ষা।"

নূতন হাসপাতাল 'গোবিন্দ বল্লভ পন্থ' হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন শাস্ত্রীজী। সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার খুব গর্ব করে বললেন, 'আমাদের এখানে কোন ছোঁয়াচে রোগ নেই। বসন্ত, টাইফয়েড, কলেরা এ দ্বীপে আজ পর্যন্ত ঢোকেনি' ইত্যাদি ইত্যাদি। শাস্ত্রীজী জবাবে বললেন, 'আন্দামানে আসবার আগে যাত্রীদের যে পরিমাণ সূঁইয়ের ফোঁড় খেতে হয়, রোগেরা তাইতেই বাপ বাপ বলে পালিয়ে যায়। সাগর পার পর্যন্ত আসতে আর সাহস করে না।'

সেণ্ট্রাল পি. ডব্লিউ. ডি. থেকে এঞ্জিনিয়াররা ডেপুটেশনে আসেন তিন বছরের জন্য। যাঁরাই আন্দামানে ডেপুটেশনে আসেন, তাঁরাই 'আন্দামান এলাওয়েন্স' শতকরা ৩৩⅓ টাকা বেশী পান। এ ছাড়া যাঁরা মেনল্যাণ্ড রিক্রুটেড হয়ে আসেন তাঁরাও এই এলাওয়েন্স পান। এবং সেই সঙ্গে বছরে একবার করে সপরিবারে সরকারী খরচে দেশে বেড়িয়ে আসতে পারেন।

যাই হোক গুপ্তসাহেব রাস্তার কাজ দেখতে যখনই যেতেন নূতন জায়গা দেখার আগ্রহে আমিও সঙ্গী হতাম। এক রবিবার ভোরবেলা আমরা রওনা দিলাম উইম্বারলিগঞ্জের দিকে। এই সুদীর্ঘ রাস্তাটি ভারী চমৎকার। রাস্তার দুই ধারে বিরাট বিরাট গাছ। কোথাও পাহাড়, কোথাও জঙ্গল, কোথাও সবুজ ধানের ক্ষেত, আবার কোথাও বা উদ্বাস্তু কলোনী। রাস্তার ধারে ধারে গাছগুলি শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কত রকমের অর্কিড তাদের শাখায় শাখায়। কত বেত ঝোপ, কত সুদৃশ্য পামগাছ আর কত যে হরেক রকমের ফার্ণ পাহাড়ের গায়ে। গাছে গাছে পাতার ঠাসবুনানি, স্তরের পর স্তর ঘন সবুজের সমারোহ। আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম জঙ্গলের মধ্যে বড় গাছের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আগাছা আর বুনো লতার জন্ম হয়েছে। মোটা মোটা লতাগুলি একগাছ থেকে অন্য গাছে জড়িয়ে জঙ্গলের পথ আরও দুর্গম করে তুলেছে। আন্দামানের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ এখনও অরণ্যময়।

আন্দামানের কাহিনী বলতে আগে বোঝাত বন বা বনবিভাগের কাহিনী। আজ যেখানে বিরাট বিরাট কুঠীবাড়ী, পাকারাস্তা, ফলের বাগান ও ধানের ক্ষেত রয়েছে, আগে সেখানে লতাগুল্ম বেষ্টিত নিবিড় অরণ্য ছাড়া আর কিছু ছিল না। স্থায়ী ভাবে কয়েদী উপনিবেশ স্থাপন করা হলে এর প্রথম যে কাজ আরম্ভ হল, তা বনবিভাগের কাজ। জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করা এবং সেই জঙ্গলের কাঠ দিয়ে বাড়ীঘর তৈরী করা একসঙ্গে চলতে লাগল। ১৮৮৩ সনে প্রথম বনবিভাগ দপ্তর খোলা হয়। জঙ্গলের মধ্যে বেশীর ভাগ প্যাডক গাছ এবং প্যাডক অনেকটা আমাদের দেশের সেগুণ কাঠের মত। এই কাঠ বাড়ীঘর, আসবাবপত্র, জাহাজ এবং স্টীমারের পক্ষে খুব উপযোগী। প্রথম মহাযুদ্ধের পর অন্যান্য গাছ, যেমন—গর্জন বাদাম, পিমা, চুগলম্, মারবল্, সিলভার গ্রে এবং পপিতা গাছের দিকে সকলের নজর পড়ল। পপিতা গাছ সম্বন্ধে ভারী মজার একটা গল্প আছে। হিন্দীতে পেঁপে গাছকেও বলে পপিতা গাছ। একবার দিল্লী থেকে অডিট পার্টি এল আন্দামানে। ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট অডিট করার সময় তারা জিজ্ঞেস করল, দক্ষিণ আন্দামানে এই যে হাজার হাজার পপিতা গাছ আছে সেই গাছের পপিতা বিক্রী করে কত আয় হয়েছে? প্রথমটা না বুঝে অফিসাররা হাঁ হয়ে গেলেন, শেষে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন।

ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষেও কাঠ রপ্তানি সুরু হল।

স্বাধীনতার পর আন্দামানের ইতিহাসের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের এই দ্বীপে পুনর্বাসন এবং সব চেয়ে বড় দায়িত্ব পড়ল বনবিভাগের ওপর। গভীর অরণ্য কেটে পরিষ্কার করে চাষের উপযোগী জমি বার করে উদ্বাস্তুদের সেখানে বসাবার দায়িত্ব আন্দামান সরকার বন বিভাগের ওপর দিলেন। গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে জঙ্গল পরিষ্কার করে উদ্বাস্তুদের সেখানে বসানো হল।

জঙ্গল কাটা ছাড়া জঙ্গল রক্ষার দিকেও এরপর বনবিভাগের নজর পড়ল। উপনিবেশ স্থাপনের প্রথমদিকে একদিক থেকে শুধু জঙ্গল কাটাই হয়েছে (forest clearance), নূতন করে গাছ লাগাবার কথা কারুর মনে হয়নি। সকলের হয়ত ধারণা ছিল কুবেরের ধনের মত আন্দামানের অরণ্যও অফুরন্ত, এর ভাণ্ডার কোনদিন নিঃশেষ হবে না। কিন্তু দেখা গেল এ ধারণা ভুল। নির্বিচারে জঙ্গল কেটে চললে একদিন না একদিন নিঃশেষ হবেই এবং তখন হবে এই দ্বীপের সর্বনাশ। তাই নূতন করে বৃক্ষ রোপণ করে জঙ্গল কাটার ক্ষতিপূরণ হচ্ছে।

বনরক্ষার আরও উদ্দেশ্য আছে। এখানে এত জঙ্গলের জন্য বর্ষা বেশী হয় এবং সেই বর্ষার জল জমিয়ে আন্দামানের অধিবাসীদের সরবরাহ করা হয়; তা ছাড়া সমুদ্রের বুকে দ্বীপগুলিকে এই জঙ্গল ভূমিক্ষয় (soil erosion) থেকে রক্ষা করে। অতিরিক্ত গাছ কাটলে ভূমিক্ষয় হবার সম্ভাবনা আছে। একদিন হয়ত দেখা যাবে সমুদ্রের বুকে রুক্ষ এক সারি পাথুরে দ্বীপ ছাড়া আর কিছুই নেই।

আগের কথায় ফিরে আসি। মুগ্ধ হয়ে আমরা রাস্তার দুই পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। প্রায় ছাব্বিশ মাইল এসে আমরা উপস্থিত হলাম উইম্বারলিগঞ্জে।

পোর্টব্লেয়ার থেকে ছাব্বিশ মাইল দূরে উইম্বারলিগঞ্জ। দেশী বিদেশীর জগা খিচুড়ীতে অদ্ভুত নাম। উইম্বারলিগঞ্জে বেশীর ভাগই কেরালার লোক। ১৯২১ সনে মালাবার বিদ্রোহের পর ১৪০০ মোপলা কয়েদী হয়ে আন্দামানে এল। এরা দক্ষিণ ভারতের লোক। জাতে মুসলমান। আরবদেশ থেকে পুরাকালে যে সব মুসলমান মালাবারে এসে বাস করত, তাদের বলত মোপলা।

আন্দামানের সঙ্গে মালাবারের সাদৃশ্য খুব বেশী। জলবায়ুর দিক থেকেও, প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক থেকেও। কাজেই মোপলাদের

এখানে বিশেষ অসুবিধা হল না। মালাবারের মতই তারা মাছ ধরা ও চাষবাস করার কাজে ব্যস্ত রইল। মোপলারা তাদের আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদে অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী। আজও এখানকার মোপলা মেয়েদের সাজ পোশাকে বিন্দুমাত্র আধুনিকতার ছোঁয়াচ লাগেনি। মোপলারা নিজেদের সমাজ নিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে বাস করে। আন্দামানের কয়েদী সমাজের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই।

তা বলে উইম্বারলিগঞ্জের সমস্ত লোকই যে কেরালার এমন মনে করার কোন কারণ নেই। যদিও মোপলার সংখ্যাই বেশী, লোক্যালবর্ণ, বাঙালী উদ্বাস্তু এবং প্লান্টেশনের কাজেও অনেকে এসে এখানে পাকাপাকি ভাবে বসত করেছেন। এ ছাড়া পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের মত বহু কেরালাবাসী সরকার থেকে জমিজমা পেয়ে সেট্‌ল্ করেছেন। উইম্বারলিগঞ্জে শতকরা নব্বই জনই কেরালার লোক। কেরালা দেশের মতই তারা নানা প্রকার আনন্দ উৎসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কোন কেরলীয় যদি উইম্বারলিগঞ্জে বেড়াতে আসেন, তাঁর মনে হবে নিজের দেশেরই এক অংশ তিনি এসে পড়েছেন। মোপলারা সকলেই অল্প-বিস্তর হিন্দী বোঝে।

উইম্বারলিগঞ্জ থেকে গেলাম আমরা ব্যাম্বু ফ্ল্যাট-এ। প্রচুর বাঁশঝাড় আছে বলে বোধহয় জায়গাটার নাম ব্যাম্বু ফ্ল্যাট। এখানে বেশ বড় একটা টি. বি. হাসপাতাল আছে পাহাড়ের ওপরে। ঘন জঙ্গলে ঢাকা চমৎকার একটি ইংরেজ আমলের রিজার্ভের অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ব্যাম্বু ফ্ল্যাট এমনিতে খুবই ছোট্ট জায়গা, তবে এখানকার জেটি থেকেই এ পারের সমস্ত গ্রামের লোকেরা যাতায়াত করে বলে জায়গাটির গুরুত্ব বেশী। দিনে চার পাঁচ বার ফেরী বোট ব্যাম্বু ফ্ল্যাটে প্যাসেঞ্জারদের পারাপার করে।

এর পর সমুদ্রের পাশদিয়ে খানিকটা গিয়ে পৌঁছলাম সাউথ আন্দামানের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় 'মাউণ্ট হ্যারিয়েট'-এর চূড়ায়।

গোষ্পদকে যদি সমুদ্র বলা যায় তবে মাউন্ট হ্যারিয়েটকেও মাউন্ট বলা যায়—যার উচ্চতা মাত্র ১২০০ ফুট। জীপ গাড়ী যাবার একটি মাত্র পাকা রাস্তা, অব্যবহারের দরুন অনেক জায়গায় ভেঙে গিয়েছে, তা ছাড়া ঝোপ ঝাড়ে রাস্তা একেবারে ভর্তি। রাস্তার দুই পাশে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। মাথার ওপর দুই পাশের গাছগুলি হেলে পড়েছে। সাপের মত মোটা মোটা বুনো লতাগুলি গাছের ওপর থেকে মাটি পর্যন্ত নেমে এসেছে। তারই মাঝে মাঝে জঙ্গলের মধ্যে নাম-না-জানা কত রকমের বুনো ফুল ফুটে রয়েছে। যতক্ষণ চড়াই উঠলাম বেশ অন্ধকার মনে হচ্ছিল, ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার রোদের দেখা পেলাম। মাউন্ট হ্যারিয়েটের ওপর চীফ কমিশনারের বাংলোর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলাম। ব্রিটিশ আমলে এখানে চীফ কমিশনার ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের 'সামার রেসিডেন্স' ছিল। সে সময় রাস্তাঘাট ঝক্‌ঝক্ করত, ফুলের বাগানে চারদিক আলো হয়ে থাকত। তখন মাউন্ট হ্যারিয়েটকে বলা হত আন্দামানের গ্রীষ্মাবাস সিমলা শৈল। স্থান নির্বাচন করা হয়েছিল উপযুক্ত জায়গায়। এমন সুন্দর 'বিউটি স্পট' যার তুলনা হয় না। সামনে ধূ ধূ করছে উন্মুক্ত সমুদ্র। প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে ডান দিক থেকে দেখা যায় পর পর সার হিউ রোজ দ্বীপ, নীল দ্বীপ, হ্যাভলক দ্বীপ এবং তার পাশে লরেন্স দ্বীপ। এর পরেই ছোট বড় কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে রিচিস আর্চিপিলেগো (Ritchie's Archipillago). তার পরই নিঃসীম পারাবারহীন সমুদ্র।

মাউন্ট হ্যারিয়েট পাহাড়ের নীচে ছবির মত দেখা যায় রস্ দ্বীপ, মনে হয় এক চাপড়া ঘাস ভাসছে জলের ওপর। ডান দিকে নীচে দেখা যায় একটি বিরাট উপত্যকা, তারই মাঝখানে উইম্বারলিগঞ্জ। ঠিক যেমন দেখা যায় মুসৌরী থেকে দেরাদুন সহর। পেছন দিকে দেখা যায় দূরে গভীর জঙ্গলে ঢাকা পশ্চিম উপকূল। সম্পূর্ণ জারোয়া অধিকৃত এলাকা।

চারদিক ঘুরে জাপানীদের তৈরী পিলবক্স এবং ম্যাগাজিনগুলো দেখে চা খেয়ে নীচে নেমে এলাম।

ডান দিকের রাস্তা ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে এসে উপস্থিত হলাম হোপ টাউন জেটিতে।

হোপ টাউনে ভারতবর্ষের ভাইসরয় লর্ড মেয়ো এক কয়েদীর হাতে নিহত হন।

১৮৭১ সন। লর্ড মেয়ো তখন ভাইসরয় অফ ইণ্ডিয়া। আন্দামান সম্বন্ধে লর্ড মেয়োর খুব আগ্রহ ছিল। তিনি অনেক ভাল ভাল প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন আন্দামানের উন্নতির জন্য। তিনিই প্রস্তাব করেছিলেন দ্বীপান্তরের আসামীরা যদি সৎস্বভাব এবং সদ্ব্যবহারের পরিচয় দেয় তবে কুড়ি পঁচিশ বছর আগেই যেন তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। ১৮৭২ সনে লর্ড মেয়ো নিজে সপরিবারে এলেন আন্দামান পরিদর্শন করতে।

পোর্টব্লেয়ারের সব কাজ শেষ করে তিনি ফিরে যাবার আগের দিন মাউণ্ট হ্যারিয়েটের ওপর কোন স্যানাটোরিয়াম করা যায় কিনা দেখবার জন্য দলবল নিয়ে পাহাড়ে উঠলেন। সারাদিন পর সূর্যাস্ত দেখে তিনি নীচে নেমে এলেন। কাছেই হোপ টাউনের জেটিতে তাঁর মোটর বোট অপেক্ষা করছিল। সমস্ত দলটি হেঁটে জেটির দিকে চলল। সবে অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। ঠিক যখন জেটির কাছে সিঁড়ি দিয়ে লর্ড মেয়ো নামছেন এমন সময় পেছনে একটা দ্রুত পদধ্বনি শোনা গেল। কিছু বোঝবার আগেই মশালের আলোয় সকলে দেখলেন উন্মুক্ত ছোরা হাতে এক ব্যক্তি উল্কার মত দৌড়ে গিয়ে লর্ড মেয়োর পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টাল সামলাতে না পেরে লর্ড মেয়ো জলের মধ্যে পড়ে গেলেন। সঙ্গীদের সম্বিত ফিরে এলে তাঁরা দৌড়ে গিয়ে ভাইসরয়কে জল থেকে তুলে আনলেন। রক্তে তখন তাঁর পিঠের জামা ভেসে যাচ্ছে। বাকী লোকেরা ইতিমধ্যে আততায়ীকে গ্রেপ্তার করল। এদিকে প্রচুর রক্তপাতে লর্ড মেয়ো

অবসন্ন হয়ে পড়ছিলেন। রাস্তার ওপর গ্রামবাসীদের একটি গরুর গাড়ী ছিল, তার ওপর ধীরে ধীরে তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হল। তিনি শুধু একবার শেষ কথা বললেন, আমার বেশী লাগেনি, তোমরা ব্যস্ত হোয়োনা। বলতে বলতেই ঢলে পড়লেন, আর উঠলেন না।

যে লোকটি লর্ড মেয়োকে খুন করেছিল সে ছিল একজন পাঠান কয়েদী। কি কারণে সে খুন করল সেটা রহস্যই রয়ে গেল। পোর্টব্লেয়ারের গল্প বলে, কয়েদীর মা তাকে চিঠি দিয়েছিল লাটসাহেব কালাপানি গেলে সে যেন বদলা নেয়। এই গল্পও অবিশ্বাস্য। কারণ কয়েদীদের চিঠিপত্র সর্বদা সেন্সার করা হত, তা ছাড়া একজন কয়েদীর নির্বাসন ব্যাপারে ভাইসরয়ের কি হাত থাকতে পারে?

হোপ টাউনের জেটিতে দাঁড়িয়ে সমস্ত ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! কোথাকার মানুষ কোথায় এসে মারা পড়ল। কোথায় ইংল্যাণ্ড আর কোথায় সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আন্দামানের হোপ টাউন।

পোর্টব্লেয়ার থেকে বেরিয়ে এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে ডান দিকে একটি রাস্তা চলে গিয়েছে উইম্বারলিগঞ্জের দিকে, আর বাঁ দিকের রাস্তাটি গিয়েছে দক্ষিণ আন্দামানের শেষপ্রান্ত চিড়িয়া টাপুতে। এই বাঁ দিকের রাস্তা ধরে খানিকদূর গেলে লোক্যালবর্ণদের ছোট একটি গ্রাম পড়ে, নাম বিডনাবাদ। তারপর মাইলের পর মাইল পাকা রাস্তা চলে গিয়েছে জঙ্গলের বুক চিরে। দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে গভীর জঙ্গল ও দুই পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে ভুল হয় বুঝি কাশ্মীরের শ্রীনগরে যাবার রাস্তা দিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে ছোট-ছোট গ্রাম পড়ে, আবার সুরু হয় গভীর জঙ্গল। বার তের মাইল যাবার পর দেখা গেল সরকারী নারকেল বাগিচা। হাজার হাজার নারকেল গাছ। এইখান থেকেই সুরু হল রঙ্গাচঙ্গের সমুদ্র সৈকত। সমুদ্র ও নারকেল গাছে ঘেরা অপরূপ জায়গা। সামনে কোন দ্বীপ

নেই, অবারিত সমুদ্রের রূপ। ভাটার টানে জল অনেক নীচে নেমে যাওয়ায় দেখতে পেলাম অনেক দূর পর্যন্ত তীরের পাশে পাশে কংক্রীটের পোস্ট এবং তাতে কাঁটাতারের বেড়া। আগেই শুনেছিলাম জাপানীরা সমস্ত পোর্টব্লেয়ার ঘিরে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছিল, যাতে শত্রুপক্ষের কেউ তীরে নামতে না পারে। অন্য কোথাও এই বেড়া এখন আর নেই একমাত্র রঙ্গাচঙ্গ ছাড়া।

রঙ্গাচঙ্গে একটি সরকারী 'কয়ার ইণ্ডাস্ট্রী' আছে। নারকেলের ছোবড়া থেকে নানা রকম কার্পেট, পাপোষ ইত্যাদি তৈরী করে। এই ইণ্ডাস্ট্রীতে বেশীর ভাগ কেরালার মেয়েরা কাজ করছে দেখলাম। সরকার থেকে বাড়ী ঘরও এরা পেয়েছে।

রঙ্গাচঙ্গের নারকেল বাগিচা ছাড়িয়ে আবার সুরু হল জঙ্গলের পথ। বিরাট বিরাট প্যাডক গর্জন আর ধূপ গাছ। গাছের গোড়ায় গোড়ায় স্তূপীকৃত ধূপ জমে রয়েছে। আরও খানিকটা যাবার পর সুরু হল কাঁচা রাস্তা। কাঁচা রাস্তা ধরে অনেকটা এগিয়ে জঙ্গলের মধ্যে আমাদের জীপ থামল। চারদিকে বড় বড় গাছে ঢাকা আধো অন্ধকার জায়গাটি। একেবারে কিনারে সমুদ্রের ধারে ঘন ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। এই হল দক্ষিণ আন্দামানের শেষ প্রান্ত, নাম চিড়িয়াটাপু। টাপু মানে দ্বীপ। এখানে প্রচুর হরিয়াল পাখী পাওয়া যায় বলেই বোধহয় কেউ নাম রেখেছেন চিড়িয়াটাপু। উল্টোদিকে খানিকটা দূরে রাটল্যাণ্ড দ্বীপ, তারও চল্লিশ মাইল দূরে ওঙ্গিদের দেশ লিট্‌ল্ আন্দামান। চিড়িয়াটাপু একটি চমৎকার পিকনিক স্পট্। মাঝে মাঝে সকলে দল বেঁধে এখানে এসে ছুটির দিন কাটিয়ে যান। এ ছাড়া যাঁরা পাখী শিকার করতে ভালবাসেন তাঁরা শেষ রাতে এখানে এসে উপস্থিত হন। ভোর বেলা ঝাঁকে ঝাঁকে নানারকম পাখী, বিশেষ করে হরিয়াল পাখী গাছের ওপর এসে বসে।

ভারত সরকারের তরফ থেকে প্রতি বছর জিওলজিস্টদের এক পার্টি আসে পোর্টব্লেয়ারে। তাঁরা প্রায় ছ'মাস ধরে আন্দামানের

বিভিন্ন দ্বীপে ক্যাম্প করে দ্বীপগুলি জরীপ করেন। এই দলের নেতা ডাঃ করুণাকরণকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আন্দামানের মাটিতে তাঁরা কোন খনিজ পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন কিনা। তিনি জবাব দিয়েছেন যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে তবে আশানুরূপ অনুসন্ধান এখনও তাঁরা করে উঠতে পারেননি, তাতে সময় এবং অর্থ দুয়েরই প্রয়োজন।

অনাবিষ্কৃত দেশগুলিতে মানুষের যখন পদার্পণ হয়, কত সময় কত খনিজ পদার্থ সে সব দেশ থেকে বার হয়, ফলে সে দেশটার চেহারাই বদলে যায়। আন্দামানের ভাগ্যই আলাদা, তার বুকে এখনও সে রকম কোন খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেলনা। অথচ অতীতকালে সোনার দেশ বলে আন্দামানের খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৮৩৯ সনে রাশিয়ান জিওলজিস্ট ডাঃ হেলফার সোনার খনির সন্ধানে আন্দামানে এসেছিলেন। জাহাজ থেকে কয়েকটি লস্কর নিয়ে রোজ তিনি জমি পরীক্ষা করতে তীরে নামতেন। যতটা সাবধান হওয়া প্রয়োজন ছিল তিনি তা হন নি। পোর্ট কর্ণওয়ালিসের কাছে একদিন তিনি যখন জমি পরীক্ষায় ব্যস্ত, একদল আন্দামানী নৃশংস ভাবে তাঁকে হত্যা করে।

এরও বহু আগে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীতেও ঠিক এমনি একটি গল্প রটেছিল আন্দামান সম্বন্ধে 'সোনার দেশ' বলে। নিকোলো কন্টি (Nicolo Conti) আন্দামান সম্বন্ধে বলেছেন 'আয়ল্যাণ্ডস অফ গোল্ড।' তিনি বলেছেন, দ্বীপগুলির মধ্যে কোথাও একটি জলাশয় আছে যার জলের ছোঁয়ায় লোহাও সোনা হয়ে যায়।

গল্প আছে, একটি ইংরেজ জাহাজ পথ হারিয়ে আন্দামানে এসে পড়েছিল। তীরে জাহাজটি নোঙর করে যখন খালাসীরা বসে গল্পগুজব করছিল, তখন একজন আন্দামানী হাতে একটি শঙ্খ ভর্তি জল নিয়ে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। কৌতূহলের সঙ্গে জাহাজটি নিরীক্ষণ করে আদিবাসীটি খানিকটা জল নিয়ে জাহাজের গায়ে ঝোলানো একটি শিকলের ওপর ছিটিয়ে দেয়। দেখতে দেখতে

শিকলটি সোনার মত ঝক ঝক করতে থাকে। দারুণ উত্তেজনায়, প্রচণ্ড লোভে শঙ্খটি আয়ত্ত করবার জন্য খালাসীরা আন্দামানীকে মেরে ফেলে। শঙ্খের জলও মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। কাজেই সেই জল বা জলের কোন সন্ধান তাদের কাছে অজানাই রয়ে গেল।

এদিকে নাবিকরা নানা দেশে গল্প করে বেড়াতে লাগল, আন্দামানের জঙ্গলে এক আশ্চর্য জলাশয় আছে, সেই জলের ছোঁয়ায় লোহা সোনা হয়ে যায়। ওলন্দাজদের বহুদিন যাবৎ আন্দামানের ওপর লোভ ছিল, এবার তারা এগিয়ে এল। তীরের কাছাকাছি হবামাত্র ঝাঁকে ঝাঁকে তীরবৃষ্টি ওলন্দাজদের কাহিল করে তুলল। শেষ পর্যন্ত আন্দামান অধিকার না করেই তারা ফিরে গেল।

এই গল্পও কিন্তু রূপকথা বলেই মনে হয়, তা না হলে তারপর আন্দামান দ্বীপের কত ওলট পালট হল, কত বন জঙ্গল পরিষ্কার হল, কত বসতি স্থাপন হল, কত মানুষ এল গেল কিন্তু সেই আশ্চর্য জলাশয়ের সন্ধান কেউ পেল না কেন?

আরও একটি গল্প—বহুকাল আগের কথা। তখনও সভ্য দুনিয়ার নজর পড়েনি এই দ্বীপপুঞ্জের ওপর। আন্দামানীরা তখন প্রায়ই ছোট ছোট ডিঙ্গি করে নিকোবরে যেত এবং সেখানকার নিরীহ অধিবাসীদের লুটপাট করে চলে আসত। একবার এই রকম একটি সংঘর্ষে আন্দামানীদের একটি ছোট ছেলে নিকোবরীদের হাতে ধরা পড়ল। নিকোবরীরা পরে সেই ছেলেটিকে সুমাত্রার এক মুসলমান ব্যবসায়ীর কাছে প্রচুর জিনিসের বিনিময়ে দিয়ে দিল। ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি আন্দামানী ছেলেটিকে লেখাপড়া শেখালেন, তারপর নিজের ব্যক্তিগত পরিচারকরূপে রেখে দিলেন। ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর ছেলেটি মুক্তি পেয়ে ডিঙ্গি বেয়ে আন্দামানে ফিরে আসে। এতদিনে সে বেশ বড় হয়ে গিয়েছে। তার আত্মীয়েরা কেউ তাকে চিনতে পারেনি প্রথম দিকে। পরে তারা খুব খুশী হয়ে চীৎকার করে উঠল।

দিন যায়। সভ্যজীবনে অভ্যস্ত ছেলেটির বন্যজীবন আর ভালো লাগে না। কি করা যায়। ভেবে ভেবে সে আবার ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রচুর পারদ (quicksilver) সংগ্রহ করে আবার সুমাত্রায় ফিরে গেল। সে সুমাত্রার ব্যবসায়ীদের কাছে গল্প করেছে আন্দামানের জঙ্গলে প্রচুর পারদ পাওয়া যায়। এরপর আরও দুই তিন বার সে আন্দামান থেকে পারদ নিয়ে গিয়েছে। সুমাত্রার মুসলমান ব্যবসায়ীরা অনেকে ছেলেটিকে অনুরোধ করেছিল আন্দামানে তাদের নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু তাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোন আশ্বাস দিতে না পারায় শেষ পর্যন্ত কোন ব্যবসায়ী পারদের খোঁজে আন্দামানে আসতে সাহস করেনি।

তৃতীয় গল্প হল, একবার একটি ইংরেজ জাহাজ আন্দামান দ্বীপ-পুঞ্জের কোন একটি দ্বীপের সামনে নোঙর করেছিল। কাঠ কাটবার জন্য কয়েকজন খালাসী ও লস্কর তীরে নেমেছিল এবং সমুদ্রতীর থেকে একটু দূরে আগুন জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করছিল। খানিক পরে দেখা গেল একটি রূপোলী স্রোত আগুনের তলা দিয়ে গলে বেরিয়ে বয়ে যাচ্ছে। খালাসীরা ভাবল নিশ্চয়ই সেখানকার মাটিতে রূপো মেশানো আছে। এই বিশ্বাসে জাহাজ ভরে সকলে মাটি বোঝাই করে ফিরে চলল। পথে উঠল তুমুল ঝড়। বাধ্য হয়ে জাহাজের বোঝা কমাবার জন্য সেই মাটি জলে ফেলে দিতে হল।

তারপর বহুবার দ্বীপটির সন্ধান করা হয়েছে, কিন্তু একই চেহারার আন্দামানের দুশ' চারটি দ্বীপের মধ্য থেকে আর সেই দ্বীপটি খুঁজে বার করা যায়নি।

এখনও কিন্তু এখানকার লোকেদের ধারণা, পশ্চিম উপকূলে জারোরা অধিকৃত এলাকায় সোনার খনি আছে। কোনদিন যদি জারোয়াদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন সম্ভব হয় তবে হয় ত তাদের এলাকার সোনার খনির সন্ধান পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

সোনা থাক বা না থাক পোর্টব্লেয়ারের বাইরে ফেবারগঞ্জের

কাছে জারোয়া এলাকার ভেতর আছে 'সোনা নালা' এবং তার থেকে অনেক দূরে 'সোনা পাহাড়'। নাম মাহাত্ম্যের ফলে জাপানীরা চেষ্টা করেছিল সোনা আবিষ্কারের, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি।

এবার আন্দামানের আদিবাসীদের কথায় আসা যাক। অনেকের হয় ত ধারণাই নেই আন্দামানের জঙ্গলে জঙ্গলে আজও কতগুলি জংলী মানুষ ঘুরে বেড়ায়। তারা কাপড় পরতে জানে না, বাড়ীঘর বানাতে জানে না, রান্না করতে জানে না। আজও তারা গাছের ফলমূল খায়, জন্তু জানোয়ার পুড়িয়ে খায়। যাযাবরের মত আজকে এ বনে কালকে সে বনে ঘুরে বেড়ায়। জঙ্গলের জোঁক, পোকা-মাকড়, সাপ-বিছে তাদের একমাত্র সঙ্গী-সাথী।

পেনাল সেট্‌লমেন্টের জন্য ইংরেজরা এ দ্বীপে হানা না দিলে কোনদিনই এদের কথা কেউ জানতে পারত না। আন্দামান বলতে সাধারণত বোঝায় চোর ডাকাত এবং খুনীদের দেশ। সেখানে যে একদল জংলী মানুষ থাকে সেটা অনেকেরই অজানা।

এখানকার আদিবাসীদের 'ওরিজিন' নিয়ে নানাজনের নানা মত আছে। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা কেউ বলেন এরা আফ্রিকার নিগ্রোদের বংশধর, কেউ বলেন মালয় দেশের সেমাঙ জাতির বংশধর, কেউ বলেন ফিলিপাইন দ্বীপের 'এইটা' জাতির বংশধর, আবার কেউ বা বলেন ভারতবর্ষের কিরাত জাতির বংশধর।

যখন দ্বীপগুলি ব্রহ্মদেশ থেকে সুমাত্রা পর্যন্ত যুক্ত ছিল, এই আদিবাসী মানুষগুলি স্থলপথে হোক বা জলপথে হোক কোন রকমে এখানে এসে পড়েছিল।

শ্রীযুত এস. কে. গুপ্ত (আন্দামানের তদানীন্তন ডেপুটী কমি-শনার) বলেছেন, আন্দামানীদের সঙ্গে ভারতবর্ষের কিরাত বা সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালীদের সাদৃশ্য আছে এবং তিনি বিশ্বাস করেন আন্দামানীরা সাঁওতালদেরই বংশধর।

"I am quite convinced that the aborigines of Andamans are the same people who in dim past, inhabited the marshy land of Bengal, the uplands of Santhal Parganas or the dense forests of Burma and Malaya. They are of that race of hunters and fishers who practically ruled this part of the world, away from the ravages of the Purusada (cannibalistic) Rakshasas. The local tribes had either drifted away in their frail craft or saved themselves somehow during the cataclysm."

নানা দেশের নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা আন্দামানীদের নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে কেউই পৌঁছাতে পারেন নি। নৃতত্ত্ববিদ্‌দের চুলচেরা গবেষণায় এরা যে জাতির বংশধর বলেই গণ্য হোক না কেন, আমাদের মত আনাড়ীদের চোখে আন্দামানীদের আফ্রিকার নিগ্রো ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তেমনি কুচকুচে কালো রং, তেমনি অদ্ভুত কোঁকড়ান চুল।

প্রকাশ রাওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আদিবাসীরা এত হিংস্র হল কেন? কেন এরা সভ্য মানুষকে সহ্য করতে পারে না, যার জন্য অতীত কাল থেকে সুরু করে উপনিবেশ গঠনের পরও বার বার তারা বিদেশীদের বাধা দিয়েছে?' তিনি বলেছিলেন, 'এ সব ব্যাপারের সঠিক কারণ কেউই বলতে পারে না, তবে অনেকের ধারণা বহুযুগ থেকে মালয়ীরা পাখীর বাসা (edible birds nest) এবং 'ট্রেপাঙ'-এর খোঁজে আন্দামানে আসত। মালয়ীদের স্বভাবে অদ্ভুত একটা নিষ্ঠুরতা ছিল। নিরীহ আদিবাসীদের যন্ত্রণা দেওয়া, তাদের ওপর শারীরিক অত্যাচার করা মালয়ীদের মস্ত বড় একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। তারা আন্দামানে এলেই আদিবাসীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে

জাহাজে নিয়ে তুলত, তার পর তাদের নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস হিসাবে শ্যাম, কাম্বোডিয়া, বর্মা, ইন্দোচীন প্রভৃতি নানা দেশে চালান দিত। সে সময় ক্রীতদাসদের বাজার দর ছিল অত্যন্ত চড়া। মালয়ীদের বাণিজ্যের মস্ত বড় মূলধন ছিল আন্দামানের আদিবাসীরা।

একে তো নিজেদের ক্রীতদাস জীবনের যন্ত্রণাময় পূর্বস্মৃতি, তার ওপর সভ্য মানুষদের বিশ্বাসঘাতকতা, সব মিলিয়ে আদিবাসীরা অত্যন্ত হিংস্র হয়ে পড়ল। আর তারা বিদেশী মানুষকে বিশ্বাস করে না। তাদের রাজ্যে পা দিলেই তীর ছুঁড়ে, বর্শা দিয়ে নৃশংস ভাবে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়।'

' নরখাদক বলে যে অপবাদ আন্দামানীদের সম্বন্ধে বহুকাল যাবৎ চলে আসছিল পরে দেখা গেল তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

অভিযাত্রীরা এবং নাবিকরা নানা গল্প এদের সম্বন্ধে বলে গিয়েছেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয় ত তাঁদের কারুরই ছিল না। সম্পূর্ণ জনশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে সে সব গল্প প্রচার করা হয়েছিল।

স্মরণাতীত কাল থেকে এই মানুষগুলি বঙ্গোপসাগরের এক কোণে এই দ্বীপগুলিতে বাস করে এসেছে, সভ্যদেশের কোন সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছায় নি। কল্পনাও করে নি তাদের রাজ্যে বিদেশীদের কোনদিন নজর পড়বে। বারবার সংঘর্ষে তাদের হয়েছে লোকক্ষয়। বারবার নিজেদের রাজ্যেই একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পালিয়ে যেতে হয়েছে, গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে। তাদের মনের দিকে কেউ চেয়ে দেখেনি। নিরুপায় আক্রোশে তারাও কি চোখের জল ফেলেনি!

আন্দামানের আদিবাসীদের সাধারণতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়। (১) আন্দামানী, (২) ওঙ্গি, (৩) জারোয়া, (৪) সেন্টিনেলিজ।

এদের মধ্যেও অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শাখা আছে, বিশেষ করে আন্দামানীদের মধ্যে।

আন্দামানকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়, গ্রেট আন্দামান

এবং লিটল আন্দামান। গ্রেট আন্দামানের আদিবাসীদের বলে 'আন্দামানী', লিটল আন্দামানের আদিবাসীদের বলে 'ওঙ্গি'। ওঙ্গি জাতেরই একটা শাখা গ্রেট আন্দামানে জঙ্গলের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে বাস করে, তাদের বলে 'জারোয়া' এবং সেন্টিনেল নামে একটি ছোট দ্বীপ আছে তার আদিবাসীদের বলে 'সেন্টিনেলিজ'। এরাও ওঙ্গি জাতের মধ্যেই পড়ে।

যদিও এখানকার আদিবাসীদের 'ওরিজিন' নিয়ে নানা মতভেদ আছে, ডাক্তার লিডিও সিপ্রিয়ানি (প্রোফেসর অফ্ অ্যান্থ্রপলজি, ইউনিভার্সিটি অফ্ ফ্লোরেন্স) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন আন্দামানীরা মালয় দেশের সেমাঙ জাতির বংশধর। এই বন্য জাতটার সঙ্গে সেমাঙদের চেহারার ও আচার-ব্যবহারে সাদৃশ্য অত্যন্ত বেশী। সেমাঙদের মতই এরা শিকার করতে, মাছ ধরতে, ফলমূল খেতে ভালবাসে। আরাকান পর্বতমালা থেকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর প্রায় হাজার বছর ধরে আদিবাসীরা এই দ্বীপগুলিতে বাস করে আসছে আর হাজার বছর ধরে তাদের স্বভাব এবং আচার-ব্যবহার একই রকমের রয়ে গিয়েছে। প্রফেসর আওয়েল এদের সম্বন্ধে বলেছেন,

"It is impossible to imagine any human being to be lower in the scale of civilization than are the Andaman savages. Entirely destitute of clothing, ultterly ignorant of agriculture, living in the most primitive and rudest form of habitations, their only care seems to be the supply of their daily food".

কবে আদিবাসীরা প্রথম আন্দামানে এসেছিল সে সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। সাধারণতঃ সকলে বিশ্বাস করেন এক পর্তুগীজ জাহাজ এখানে এসে ভেঙ্গে যাওয়ায় নিগ্রো ক্রীতদাসরা আন্দামানে এসে পড়েছিল এবং তারাই আন্দামানীদের পূর্বপুরুষ। ডাঃ সিপ্রিয়ানি

বলেছেন, পর্তুগীজরা ভারতবর্ষে আসবার অনেক আগেই আন্দামানীরা এখানে এসেছিল।

আদিবাসীদের তাদের স্বভাব অনুযায়ী ভাগ করলে দেখা যায়, একদল হল অরণ্যচারী বা 'এরেমটাগা', অন্যদল হল সমুদ্রতীরবাসী বা 'এরিয়োটো'। প্রথম দলের মধ্যে পড়ে আন্দামানী এবং জারোয়া, দ্বিতীয় দলের মধ্যে পড়ে ওঙ্গি এবং সেন্টিনেলিজ।

'এরেমটাগা'রা জঙ্গলে থাকে। জঙ্গলের রাস্তাঘাট সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান বেশী। ধনুক দিয়ে মাছ ও শূয়োর শিকার করতে পটু। Fauna এবং Flora সম্বন্ধে পরিচয় বেশী। ধূর্ত কিন্তু ভীরুস্বভাবের।

এরিয়োটোরা সমুদ্রতীরে বাস করে। সমুদ্র থেকে মাছ, কচ্ছপ, শামুক, গুগ্‌লি ধরে ধরে খায়। সাঁতারে পটু হয় এবং জল সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক বেশী হয়। তীর ধনুক দিয়ে এরাও মাছ ধরতে পটু হয়। স্বভাবে কষ্টসহিষ্ণু এবং সাহসী।

আন্দামানী পুরুষরা শিকার করে, মেয়েরা ফলমুল আহরণ করে। আন্দামানের সমস্ত আদিবাসীই মাকুন্দা, দাড়ি গোঁফের বালাই কারুরই নেই এবং লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশী কেউ হয় না।

শ্রীপ্রকাশ রাও গল্প করেছেন, আন্দামানীদের বিয়ের সময় কনেকে একটি নির্জন ঝোপড়িতে বসিয়ে রাখে আর বর জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকে। বিয়ের সময় বন্ধুরা ধরে নিয়ে আসে। এরপর কনেকে বরের কোলে বসিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ে শেষ। বর-কনেকে ঘিরে সকলে হাত ধরাধরি করে গান করে এবং নাচে। অল্পক্ষণ পরে বর-কনে সকলের চোখের আড়ালে বাসর জাগতে যায়।

বিয়ের পর এদের ছাড়াছাড়ি হয় না কিন্তু একজনের মৃত্যু হলে অন্যজন বিয়ে করতে পারে।

মরার পরও কতকগুলি নিয়ম আন্দামানীরা মেনে চলে। কেউ মারা গেলে তার মৃতদেহ গাছের ওপর মাচা করে ঝুলিয়ে রাখে এবং তিন মাসের মধ্যে সে জায়গা কেউ মাড়ায় না। শোকের সময় তারা

নাচগান করে না, ভোজ খায় না। শোকের চিহ্ন হিসাবে মাথায় সাদা মাটির প্রলেপ লাগিয়ে রাখে। তিন মাস পর মৃতের হাড়গোড় বার করে নিয়ে পরে টুকরো টুকরো করে অলঙ্কারের মত ব্যবহার করে এবং আন্দামানীরা বিশ্বাস করে শারীরিক যে কোন যন্ত্রণায় মৃতের হাড় একটু ঘষে দিলে আরাম পাওয়া যায়। তিন মাস পর অশৌচ শেষ হলে মাথার মাটির প্রলেপ ধুয়ে ফেলে এবং নাচগান করে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "কি করে আন্দামানীরা তিন মাসের হিসেব রাখে ?" প্রকাশ রাও উত্তর দিয়েছিলেন, "হিসেব কেউই রাখে না। আন্দাজে কিছুটা সময় পার করে এরা অশৌচ শেষ করে। তবে বহুকাল থেকে নানা জনের কাছ থেকে শুনে শুনে সকলের একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে আন্দামানীদের অশৌচের সময়টা তিন মাসের বেশী হয় না।" আন্দামানীরা আগুন জ্বালতে জানে না, মোটা মোটা গাঠের গুঁড়ি দিয়ে আগুন জিইয়ে রাখে।

ভগবানে আন্দামানীরা বিশ্বাস করে না। ভগবানে বিশ্বাস না করলেও তারা বিশ্বাস করে পৃথিবীতে এমন কেউ আছেন, যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, বাঁচিয়ে রেখেছেন। ঝড়-তুফান, রোদ-বৃষ্টি তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আন্দামানীদের ভাষায় সেই সর্বশক্তিমান পুরুষের নাম 'পুলগা'। থাকেন তিনি আন্দামানের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় 'স্যাড্‌ল্ পিক্'-এর চূড়ায়। কিন্তু পুলগার উদ্দেশ্যে আন্দামানীদের মধ্যে কোন রকম পূজা বা প্রার্থনার চল নেই। এই দেবতাকে কেউ ভাল না বাসলেও মনে মনে ভয় করে, কারণ পুলগা নাকি অসন্তুষ্ট হলে তাদের রাজ্যে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। আন্দামানীরা নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদ নিয়ে থাকতে ভালবাসে। এরা গান করে বেসুরো সুরে, তাল দেয় কাঠের গায়ে ঠুকে ঠুকে।

এই দ্বীপপুঞ্জে অতীতকালে আন্দামানীর সংখ্যাই ছিল সব থেকে বেশী। এদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শাখা ছিল দশটি। তার মধ্যে প্রধান হল আকাবিয়া, আকা-কোরা, আকা-জেরু এবং আকা-বোয়া। প্রত্যেক

শাখার ভাষা আলাদা। দশটি শাখার মধ্যে অনেকগুলি শাখার আন্দামানী বর্তমানে লোপ পেয়ে গিয়েছে।

১৮৫৮ সনে দ্বিতীয় বার যখন উপনিবেশের পত্তন হয় তখন সব মিলিয়ে আন্দাজ করা হয় দশ হাজার আন্দামানী গ্রেট আন্দামানে বাস করত।

আন্দামানীদের সাধারণতঃ পোর্টব্লেয়ারে সব সময় দেখা যায় না. কালে ভদ্রে দুই একজন চোখে পড়ে যায়। একদিন বাজারে যাবার সময় পাঁচটি আন্দামানী পুরুষ আর একটি বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পেলাম। তাদের দেখে গুপ্তসাহেব গাড়ী থামালেন। বুশ সার্ট পরে, হাফ প্যান্ট পরে দিব্যি ভদ্রলোক সেজে রয়েছে সবাই। কি কালো রং, যেন কেউ আলকাতরা মাখিয়ে দিয়েছে। রোদ পড়ে কালো রংটা যেন আরও চক্‌চক্ করছিল। চুলগুলি অদ্ভুত কোঁকড়ান। একটি গাঁট্টাগোট্টা আন্দামানী গুপ্তসাহেবকে দেখে নমস্কার করল। গুপ্তসাহেব বললেন, ‘এই হচ্ছে এদের নেতা, নাম লোকা। কিছুদিন আগে সরকারী কাজে আন্দামানীদের গ্রামে গিয়ে আলাপ হয়েছিল।’ আমাদের প্রশ্নের উত্তরে আন্দামানীরা হিন্দীতে জবাব দিল, তারা বুশ পুলিশে কাজ করে, সহরে বেড়াতে এসেছে। বাচ্চাটি বলল, সে স্কুলে পড়বে। তার হাতে দেখলাম অনেকগুলি ম্যাঙ্গোস্টিন ফল। এই ফল আন্দামানে প্রচুর পাওয়া যায়। নাম জিজ্ঞাসা করতে লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে পড়ল। ছেলেটির কাণ্ড দেখে অন্য আন্দামানীরা সাদা ঝক্‌ঝকে দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

আন্দামানীদের দেখে আমার ইচ্ছা করছিল এরা যদি জামা-কাপড় না পরে, তীর ধনুক নিয়ে একবার দাঁড়াত তবে স্বচক্ষে এদের আদিম রূপটা দেখে নিতাম। কি নিরীহ মানুষগুলি, অথচ এককালে এরা গোটা আন্দামানে রাজত্ব করেছে, বাইরের লোকের কাছে এরা ছিল মূর্তিমান বিভীষিকা। এদের ভয়ে নাকি কোন জাহাজ নোঙর করতে চাইত না, এরা নাকি নির্বিচারে বাইরের লোককে হত্যা করত।

যে কয়জন আন্দামানী বর্তমানে বেঁচে রয়েছে তাদের আচার-ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন এসে গিয়েছে। এরা এখন অনেকে সভ্য মানুষের মত কাপড় পরে, সরকারের কাজ করে, বিশেষ করে বুশ পুলিশের কাজে ধড়াচূড়া পরতেও কোন আপত্তি করে না। তবে সহরের ধারে কাছে আজও তারা বাস করতে চায় না। সভ্য জাতির সংস্পর্শে আন্দামানীরাই প্রথমে এসেছিল এবং এরাই সর্বপ্রথম বশ্যতা স্বীকার করেছিল। 'আন্দামান হোমের' কল্যাণে অনেকে সামান্য লেখাপড়াও শিখেছিল। সভ্য জাতির সঙ্গে মেলামেশার ফলে একটা জাত কেমন করে ধ্বংস হয়ে গেল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আন্দামানীরা।

এবার বলি ওঙ্গিদের সম্বন্ধে। পোর্টব্লেয়ার থেকে চল্লিশ মাইল দূরে লিট্‌ল্ আন্দামান। ওঙ্গিদের শীতকালে মাঝে মাঝে পোর্টব্লেয়ারে দেখতে পাওয়া যায়। সরকারী কাজে মাঝে মাঝে অফিসাররা লিট্‌ল্ আন্দামানে যান, বিশেষ করে এগ্রিকালচার এবং অ্যানথ্রপলজির অফিসাররা। একবার আমরা রওনা দিলাম লিট্‌ল্ আন্দামানে। সঙ্গে ছিলেন ডাইরেক্টার অফ্ এগ্রিকালচার মিঃ আনন্দ, মিসেস আনন্দ এবং নৃতত্ত্ববিভাগের অফিসার প্রকাশ রাও।

পোর্টব্লেয়ার ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে পড়ল সিঙ্ক দ্বীপ, ব্রাদার দ্বীপ, এবং সিস্টার দ্বীপ। এই দ্বীপগুলিও পাহাড়ী এবং অজস্র গাছে ঢাকা। সিঙ্ক দ্বীপের বালুবেলাটি চমৎকার। জোয়ারের সময় দ্বীপটি দুই ভাগ হয়ে যায় এবং ভাঁটার সময় আবার এক হয়ে যায়। প্রচুর হরিণ এই দ্বীপে। পোর্টব্লেয়ার থেকে প্রায়ই উৎসাহী শিকারীরা দলবল নিয়ে সিঙ্ক দ্বীপে শিকার করতে আসেন।

সব সময়েই লিট্‌ল্ আন্দামানের সমুদ্র অশান্ত থাকে বলে সকলেরই সন্দেহ ছিল নামতে পারবে কিনা। ভাগ্য প্রসন্ন থাকায় সমুদ্র সেদিন অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল। স্টীম লঞ্চ থেকে নেমে ছোট আউটবোটে করে ঢেউ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কোন রকমে তীরে

গিয়ে পৌঁছালাম। তীরে নেমে দেখি প্রায় [redacted] পঁচিশ ওঙ্গি দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাশ রাও বললেন, "তোমরা জানলে কি করে যে আমরা আসব?" একজন বুড়ো ওঙ্গি জবাব দিল, "আজ সকালে লাল চিড়িয়া দেখেছি, তাইতেই বুঝেছি মেহমান আসবে।" কথাগুলি ভাঙ্গা হিন্দীতেই বলল। আমরা তো শুনে অবাক। এমন অদ্ভুত কথা বিশ্বাস করি কি করে যে লাল চিড়িয়া দেখলে মেহমান আসে!

চারদিকে তাকিয়ে দেখি যেন অন্ধকারের দেশ। কালোয় কালোময়। যেদিকে তাকাই শুধু কালো কালো মানুষ। সকলেরই বেশ খুশী খুশী ভাব। নৃতত্ত্ববিভাগের একটি ঘর আছে লিট্‌ল্‌ আন্দামানে। আমরা সেখানে গিয়েই উঠলাম। ওঙ্গিরা দল বেঁধে সামনে দাঁড়াল। মেয়েগুলিও দারুণ উত্তেজনায় নিজেদের মধ্যে কিচির-মিচির করতে লাগল।

ওঙ্গিরা নিজেদের দ্বীপে প্রায় উলঙ্গ হয়ে থাকে। সামান্য একটি নেংটি থাকে পুরুষদের পরণে আর মেয়েদের কোমরে দড়ি বেঁধে ঠিক সামনে একটি ঘাসের গুচ্ছ ঝুলিয়ে দেয়। মাটিতে বসবার সময় গুচ্ছটি ওপরে তুলে হাঁটুমুড়ে বসে। কি অসম্ভব নোংরা জাত! সামনে বসলে গায়ের গন্ধে ভূত পালায়! কি কারণে জানি না সকলেরই প্রায় চর্মরোগ আছে। দেখলে কেমন গা শির শির করে। দেখতে ঠিক আন্দামানীদের মতই তবে এদের চুলগুলি ভারী মজার। এক এক জায়গায় থোকা থোকা করা। ঠিক মনে হয় কেউ যেন ন্যাড়া মাথায় আঠা লাগিয়ে তারপর জায়গায় জায়গায় চুলগুলি লাগিয়ে দিয়েছে।

ওদের মধ্যে একটি অল্পবয়সী ছেলেকে দেখতে ভারী সুন্দর লাগছিল। যেন কষ্টি পাথরে গড়া একটি পুতুল। মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম অদ্ভুত নরম চুলগুলি। এদের যে ইংরেজরা 'woolly haired' বলে তা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা এরপর চললাম ওঙ্গিদের গ্রামের দিকে। গ্রাম বলতে এখানে বোঝায় বিরাট বিরাট এক একটি

'কম্যুন্যাল হাট'। একসঙ্গে ত্রিশ চল্লিশজন থাকতে পারে। শোবার জন্য প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মাচান আছে। শোবার ঘরেই রান্না করে অর্থাৎ আগুনে মাছ মাংস ঝলসে নেয়; আবার কেউ মরে গেলে শোবার ঘরেই মাচানের নীচে কবর দেয়। দিনের বেলা ওঙ্গিরা বেশীর ভাগ জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, রাতের বেলা ঘরে ফিরে আসে। এদের ঘরগুলিকে বলে 'কোরেল'। প্রত্যেক মাচানের কাছে শুয়োরের খুলি সাজানো। শুভ চিহ্নের প্রতীক।

ওঙ্গিরা গাছের ফল-মূল, মধু, কচ্ছপ এই সব খেতে ভালবাসে। নৃতত্ত্ব বিভাগের অফিসার প্রায়ই এসে এদের সুখ সুবিধা দেখে যান। রাস্তায় যেতে যেতে দেখলাম এক জায়গায় কয়েকটি ওঙ্গি বাঁশের চোঙে মধু নিয়ে বসে রয়েছে। ওঙ্গিরা জানে পোর্টব্লেয়ার থেকে সাহেবরা এলেই মধু নিয়ে যায়, তাই খবর পেয়েই মধু নিয়ে এসেছে। শুনেছিলাম লিট্‌ল্ আন্দামানে চাক ভাঙ্গা মধু পাওয়া যায়, তাই আমার নেবার ইচ্ছা ছিল। প্রকাশ রাওকে বলেওছিলাম সে কথা। কাছে গিয়ে দেখি ওঙ্গিরা কাঠি দিয়ে মধু তুলে চেটে চেটে খাচ্ছে, আবার কাঠিটা মধুতে ডুবিয়ে রাখছে। দেখেই তো সকলের মধু খাবার শখ মিটে গেল। প্রকাশ রাও বললেন, "ম্যাডাম, মধু নেবেন?" আমি বললাম, "রক্ষে করুন, আর মধু নিয়ে আমার কাজ নেই।" হাসতে হাসতে সবাই এগিয়ে যেতেই ওঙ্গিরা চীৎকার করে ডাকাডাকি করতে লাগল।

লিট্‌ল্ আন্দামানে প্রচুর মধু পাওয়া যায়। 'টোনিওগে' নামে একরকম বুনো লতার রস গায়ে মেখে ওঙ্গিরা মৌচাক কেটে আনে। বুনো লতার গন্ধে মৌমাছিরা উড়ে পালিয়ে যায়। টোনিয়োগে পাতার রস কিছু গায়ে মেখে, কিছু পাতা চিবিয়ে মুখে নিয়ে ওঙ্গিরা গাছে ওঠে। মৌচাকের কাছে গিয়ে থু থু করে রস ছিটাতে থাকে। গন্ধে সব মৌমাছিরা পালিয়ে গেলে তারপর মৌচাক কেটে আনে।

একটু এগিয়ে যেতেই দেখি একপাল ওঙ্গি মেয়ে হাতে কতকগুলি

গাছের কন্দজাতীয় ফল নিয়ে যাচ্ছে। প্রকাশ রাওকে দেখে সবাই হৈ হৈ করে উঠল। প্রকাশ রাও বললেন, "কিরে, সাহেবদের নাচ দেখাবি না?" একটু লাজুক লাজুক মুখ করে সবাই আমাদের দিকে তাকাল তারপর ফলগুলি ফেলেদিয়ে হাত ধরাধরি করে নাচতে সুরু করল।

ওঙ্গি মেয়েদের মাথাগুলি ন্যাড়া। কাঁচের টুকরো দিয়ে এরাও মাথা কামিয়ে ফেলে। কেন যে এখানকার আদিবাসী মেয়েরা মাথার চুল পছন্দ করে না জানি না। আন্দামানীদের মত ওঙ্গিরাও সাদা ও লাল মাটি (red ochre) দিয়ে শরীর চিত্রিত করতে ভালবাসে। কয়েকজন ওঙ্গিকে দেখলাম সারা মুখে দাগ কেটে বসে রয়েছে। আমাদের কাছে ওঙ্গিদের চিত্রিত করা চেহারাগুলি ঠিক ভূতের মত লাগছিল, অন্ধকারে দেখলে আঁতকে উঠতে হয়।

এমনিতে ওঙ্গিরা বেশ শান্ত স্বভাবের, তবে অল্পেতেই রেগে ওঠে। নাচ দেখতে দেখতে উলঙ্গ ওঙ্গি মেয়েদের চেহারার যেটা সব চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা এদের নিতম্বদেশ। এমন অদ্ভুত নিতম্ব আগে কখনও চোখে পড়েনি। যেমন বড়, তেমনি ভারী। কেউ যেন মনে করবেন না এরা কবির বর্ণিত "শ্রোণীভারাদলসগমনা"। অলস-গমনা ঠিকই তবে এদের পেছন দিকটা বিশ্রী রকমের বাইরের দিকে বার করা। এমন গুরু নিতম্বিনীর রূপ কবি কালিদাসও কোনদিন কল্পনা করতে পারেন নি বোধহয়! নৃতত্ত্ববিদ্‌রা ফিতে দিয়ে মেপে দেখেছেন একটি তিন-চার বছরের ছেলে অনায়াসে মায়ের পাছার ওপর দাঁড়াতে পারে। গল্প আগেই শুনেছিলাম বলে অবাক হয়ে ওঙ্গি মেয়েদের পাছার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তালে তালে পা ফেলে নাচবার সময় বুক ও পাছা দুইই নাচছিল। পরিবেশের জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক এই নগ্নকায় স্ত্রী-পুরুষগুলির সামনে আমরাও বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করছিলাম না। বাচ্চাগুলি দেখতে কিন্তু ভারী মিষ্টি লাগছিল, যেন কালো পাথরে গড়া কতকগুলি পুতুল।

আজকাল ওঙ্গিদের দেখলে বিশ্বাস হয় না যে এরাও এককালে বিদেশী দেখলেই নৃশংস ভাবে হত্যা করত।

কয়েদী উপনিবেশ স্থাপনের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পোর্টব্লেয়ার ও তার আশ পাশের দ্বীপ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, চল্লিশ মাইল দূরে লিট্‌ল আন্দামান নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি।

১৮৬৭ সনে জলের জন্য ইংরেজ জাহাজ 'আসাম ভ্যালী' লিট্‌ল আন্দামানে নোঙর করলে যে সব খালাসীরা তীরে নেমেছিল ওঙ্গিরা তাদের সবাইকে হত্যা করে। এই খবর পেয়ে পোর্টব্লেয়ার থেকে এক জাহাজ গেল খালাসীদের খোঁজে। ওঙ্গিদের ঝাঁকে ঝাঁকে তীরের বর্ষণ সহ্য করতে না পেরে জাহাজটি ফিরে আসে। চীফ কমিশনার জেনারেল স্টুয়ার্ট ১৮৭১ সনে লিট্‌ল আন্দামানে নিজে গেলেন ওঙ্গিদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপনের আশায়। সেখানে গিয়ে ধারে কাছে একটি ওঙ্গিকেও দেখতে না পেয়ে প্রচুর উপঢৌকন রেখে চলে এলেন। কয়েকবার এই রকম জিনিসপত্র রেখে আসার পর মনে হল ওঙ্গিরা বিদেশীদের ধীরে ধীরে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে।

মিঃ পোর্টম্যানই প্রথম ব্যক্তি যিনি ওঙ্গিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে সক্ষম হন। একবার অনেক কষ্টে অনেক কায়দায় সিঙ্ক দ্বীপে কয়েকটি ওঙ্গি যখন মাছ ধরতে ব্যস্ত তখন তাদের বন্দী করে আনেন। কিছুদিন ধরে তাদের নানা ভাবে পরীক্ষা করে, অনেক জিনিসপত্র দিয়ে আবার তাদের লিট্‌ল আন্দামানে ফেরত পাঠিয়ে দেন। মিঃ পোর্টম্যানের সদয় ব্যবহারে ওঙ্গিরা খুব খুশী হয় এবং তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। এর পর তারা কোনদিন বিদেশী জাহাজ আক্রমণ করেনি।

ওঙ্গিদের ভাষা, আচার ব্যবহার, তীর ধনুক সবই আন্দামানীদের থেকে আলাদা। এদের মধ্যেও সিফিলিস রোগ ছড়িয়েছে, তার ফলে বন্ধ্যাতার অভিশাপ এদের মধ্যেও লেগেছে। প্রতি দশটি ওঙ্গি মেয়ের মধ্যে চারটিই বন্ধ্যা। সভ্য জাতির প্রভাব থেকে এদের দূরে

রাখবার জন্য সরকারের তীক্ষ্ণ নজর আছে। সরকারী কর্মচারী ছাড়া সাধারণ লোকের লিট্ল আন্দামানে প্রবেশ নিষেধ। কেউ যেতে চাইলে তাকে সরকার থেকে অনুমতি নিতে হয়।

ওঙ্গিদের বিয়ের অনুষ্ঠানটি খুব সরল। বর কনের হাত ধরলেই বিয়ে হয়ে গেল। তবে বিয়ের আগে বর কনের মতামত নিতে হয়। আমরণ ওঙ্গি স্বামী স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গী হয়ে জীবন যাপন করে। মাছ ধরা, শিকার করা, জঙ্গলে ঘোরা, এমনকি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার সময়েও ওঙ্গি পুরুষের পিছনে ছায়ার মত তার সঙ্গিনী দাঁড়িয়ে থাকে।

ওঙ্গিদের জীবন যাপনের প্রণালী আজও সেই প্রস্তর যুগের মত। সভ্য জগতের কোন প্রভাব সেখানে পড়েনি। নিজেদের রাজ্যে নিজেদের রীতিনীতি নিয়ে মনের আনন্দে তারা বাস করছে। এরাও আগুন জ্বালিয়ে রাখে দিনের পর দিন। ছোট ছোট ডিঙ্গি করে ওঙ্গিরা মাঝে মাঝে পোর্টব্লেয়ারে আসে তামাক, চিনি, দা, কুড়ুল এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্য। তখন সারা সহরে ঘুরে বেড়িয়ে আবার এরা ফিরে যায়। চুট্টা (মোটা মোটা বিড়ি) খেতে এরা খুব ভালো-বাসে। টাকা হাতে পেলেই চুট্টা কিনবে। দরাদরি জানে না, হয়ত এক টাকা দিয়েই একটা চুট্টা কিনবে। সহরে আসবার সময় ওঙ্গি স্ত্রী-পুরুষ সকলেই গায়ে একটা যা হোক কাপড় চাপিয়ে আসে। দিনের শেষে দেখা যায় ওঙ্গি মেয়ে কাপড় বগলদাবা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশীক্ষণ গায়ে কাপড় রাখলে এদের অস্বস্তি বোধ হয়। এদিক দিয়ে পুরুষরা বরং কাপড় পরতে অভ্যস্ত বেশী।

ওঙ্গিরা প্রস্তরযুগে বাস করলেও এদের কয়েকটি জিনিস দেখলে অবাক হতে হয়। জংলী একরকম সরু সরু লতা দিয়ে মাছ ধরার জাল তৈরী করে। এরা তীর ধনুক দিয়েও মাছ ধরে। সুপুরি গাছের খোল কেটে তাইতে খাওয়া দাওয়া করে। বেত ও লতা দিয়ে ভারী সুন্দর চাটাই তৈরী করে। আমাদের এই রকম একটি চাটাই বিছিয়ে

দিয়েছিল বসবার জন্য। লাল ও সাদা মাটি চন্দনের মত ঘষে গায়ে লাগায়, তা ছাড়া ওষুধের মত ব্যবহার করে। এমন কি সাপে কামড়ালেও এই মাটি প্রতিষেধকের কাজ করে। এমনিতে সহজ সরল মানুষ হলেও মাঝে মাঝে ওঙ্গিরা খুব ধূর্ততা দেখায়। লিট্‌ল আন্দামানের কোন্ জায়গায় এই মাটি পাওয়া যায় আজ পর্যন্ত এরা কোন সভ্য মানুষকে তা জানায়নি।

ওঙ্গিরা নৌকা তৈরী করে গাছের গুঁড়ি গর্ত ক'রে। ইংরেজীতে যাকে বলে dug-out ; তারপর সেই নৌকা করে তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্র অনায়াসে পাড়ি দেয়।

ডাঃ সিপ্রিয়ানি লিট্‌ল আন্দামানে তিন মাস ওঙ্গিদের সঙ্গে বাস করেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর মতে ওঙ্গিরা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুখী জাত।

আর একটা হিংস্র আদিবাসী জাত হল সেন্টিনেলিজ। এদের সঙ্গে আজ পর্যন্ত কোন যোগাযোগ স্থাপন করতে না পারায় এদের সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। যতবার সেন্টিনেল দ্বীপে নামবার চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়ে আদিবাসীরা বাধা দিয়েছে।

কয়েক বছর আগে দিল্লী, কলকাতা থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এলেন সরকারী কাজে। তাঁদের মধ্যে ডাঃ নির্মল কুমার বোসও (ডাইরেকটার অফ অ্যানথ্‌পলজি) ছিলেন। ভদ্রলোকদের নিয়ে স্থানীয় কয়েকজন অফিসার লিট্‌ল আন্দামানে গেলেন ওঙ্গিদের দেখবার জন্য। সেখান থেকে ফিরে সকলে চললেন সেন্টিনেল দ্বীপের দিকে। দ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে দেখা গেল আট-দশটি সেন্টিনেলিজ তীরে মাছ ধরছে। বোট দেখেই তারা জঙ্গলে ঢুকে গেল। মিনিট পাঁচেক পরেই দেখা গেল দলে ভারী হয়ে প্রায় পঞ্চাশজন তীর ধনুক হাতে ফিরে এসেছে। সকলের মধ্যেই যেন একটা 'রণং দেহি'

ভাব। অগত্যা তাদের ভাল করে দেখবার বা জানবার আশা ত্যাগ করে সকলকে সেখান থেকেই ফিরতে হল। সেন্টিনেল দ্বীপটি একেবারে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় কোনদিন তারা সেট্‌লমেণ্টের ওপর হামলা করেনি। ভেলা করে বা ডিঙ্গি করেও তারা অন্য কোন দ্বীপে যায়নি। কি তারা খায়, কি ভাবে থাকে সে সম্বন্ধে এখনও সকলে অন্ধকারেই আছেন। সেন্টিনেলিজদের তীর সুপুরি গাছের কাঠ দিয়ে তৈরী করে।

আন্দামানী, ওঙ্গি, জারোয়াদের নিয়ে এত হৈ চৈ, এত গবেষণা, এত বই লেখা হয়েছে কিন্তু এদেরই একটা শাখা নির্বিবাদে এখনও লোকচক্ষুর অগোচরে বাস করে আসছে। তাদের আশপাশের দ্বীপগুলিতে সভ্য মানুষের বিজয় পতাকা উড়তে সুরু করলেও তাতে তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই।

'জারোয়া'। পোর্টব্লেয়ারে আসবার পর যে শব্দটা শুনলে হৃৎকম্প উপস্থিত হত তা হল 'জারোয়া'। চোখে কেউ জারোয়াদের দেখতে পায় না কিন্তু তাদের ভয়ে আন্দামানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাঁপে। অদ্ভুত হিংস্র এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ জাত। পেনাল সেট্‌লমেণ্টের গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত এদের স্বভাব একই রকমের রয়ে গিয়েছে।

বিভিন্ন দ্বীপের আন্দামানীদের বন্ধুত্বসূত্রে মিলাবার উদ্দেশ্যে রেভারেণ্ড করবাইন নানা জায়গায় অভিযানে যেতেন। এই রকম একটি অভিযানে গিয়ে তিনি প্রথম জানতে পারলেন যে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে আরও একটা হিংস্র জাত আছে। মিঃ বনিংটন যদিও বলেছেন, জারোয়ারা ওঙ্গি জাতেরই একটা শাখা, এ বিষয়ে কিন্তু অনেকের মতভেদ আছে। কারণ মূলগত দুইটি ভিন্ন স্বভাবের মানুষ ওঙ্গি এবং জারোয়া। জারোয়ারা অরণ্যচারী, ওঙ্গিরা সমুদ্রতীর-বাসী। বর্তমানে জারোয়াদের মত হিংস্র জাত আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে একটিও নেই। লোকালয় থেকে দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে

এরা বাস করে। স্বভাবে যাযাবর, আজ এখানে, কাল সেখানে। সভ্য মানুষকে আজও তারা পরমশত্রু বলে মনে করে। ১৮৫৮ সন থেকে আজ পর্যন্ত বহুবার বহুভাবে চেষ্টা করা হয়েছে জারোয়াদের সঙ্গে একটা আপস করার কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হয়নি। সভ্য জাতির ওপর তাদের প্রচণ্ড আক্রোশ। জঙ্গলে বাস করলেও সুযোগ পেলেই লোকালয়ের কাছে এসে আক্রমণ করে। জঙ্গলে কাজ করতে গিয়ে ফরেস্ট ও পি. ডব্লিউ. ডি-র অনেক মজুর জারোয়ার হাতে প্রাণ দিয়েছে। জারোয়া এলাকার কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে বুশ পুলিশের (Bush Police) বন্দোবস্ত আছে। বুশ পুলিশের কাজ হল ঘন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে জারোয়াদের গতিবিধি লক্ষ্য করা এবং তাদের আক্রমণ থেকে লোকদের রক্ষা করা। অনেক সময় বুশ পুলিশেরাও এদের হাতে মারা পড়ে। বুশ পুলিশের কাজে আন্দামানীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যোগদান করে। জঙ্গলের রাস্তাঘাট এবং জারোয়াদের গতিবিধি আন্দামানীরাই সব চেয়ে ভাল জানে বলে তাদের সাহায্য খুব প্রয়োজনীয়। বহু বর্মীও বুশ পুলিশে কাজ করে।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে গুপ্তচরের সন্ধানে জাপানীরা যখন ঘুরে বেড়াত, জারোয়াদের হাতে তাদের কিছু লোক মারা যায়। এর ফলে জাপানীরা আন্দাজে বেপরোয়া ভাবে এরোপ্লেন থেকে জঙ্গলের মধ্যে বোমা ফেলে। তাতে কতজন জারোয়া মারা যায় তার কোন হিসাব কেউ জানে না, তবে তারা এরপর আরও বেশী করে সভ্য মানুষের শত্রু হয়ে উঠল।

যে সব উদ্বাস্তু কলোনীগুলি জঙ্গলের ভিতর জারোয়া এলাকার কাছাকাছি, সে সব অঞ্চলে প্রায়ই জারোয়ারা এসে আক্রমণ করে। এই রকম একটি উদ্বাস্তু কলোনী তিরুর। হার্বাটাবাদের একেবারে লাগোয়া। দুইটি পাহাড়ের মাঝখানে ছোট একটি উপত্যকা তিরুর। দুই পাশের পাহাড় গভীর জঙ্গলে ঢাকা জারোয়াদের এলাকা।

উপত্যকার মাঝে ধানী জমি বার করে কয়েকজন উদ্বাস্তুকে দেওয়া হয়েছিল। জমির পাশেই তাদের ঘরগুলি। ধানী জমি যেখানে শেষ হয়েছে তার পরেই সুরু হয়েছে ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ী অঞ্চল। জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় জারোয়ারা সরে গিয়ে এই জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। দুর্গম গভীর জঙ্গলে লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা ঘুরে বেড়ায় এবং ফাঁক পেলেই উদ্বাস্তুদের আক্রমণ করে। কি যে তাদের এই আক্রমণের উদ্দেশ্য তাই বোঝা যায় না। একটা জিনিসও লুট করে না, কিংবা মানুষ মেরেও তাকে নিয়ে যায় না, একমাত্র হত্যা করাতেই তাদের আনন্দ।

মণিলাল চক্রবর্তী নামে এক উদ্বাস্তু ভদ্রলোক তিরুরে জমি পেয়েছিলেন। ব্যক্তিগত কাজে তিনি পোর্টব্লেয়ারে এসেছিলেন, ঘরে ছিল তাঁর তরুণী স্ত্রী একা। একদিন ভোর বেলা দরজা খুলে মেয়েটি বাইরে আসতেই জারোয়ারা তাকে আক্রমণ করল। চীৎকার করার সঙ্গে সঙ্গেই তীর এসে তার গায়ে লাগে। মেয়েটির চীৎকার শুনে অন্য ঘরের উদ্বাস্তুরা সাহায্য করতে এগিয়ে না এসে ভয় পেয়ে নিজেরাই পালাতে সুরু করল। জারোয়ারা উদ্বাস্তুদের পিছনে ধাওয়া না করে তাদের বাড়ীঘর ভেঙেচুরে দিয়ে চলে গেল। সম্প্রতি জারোয়াদের হাত থেকে এই সব উদ্বাস্তুদের রক্ষা করার জন্য বুশ পুলিশের ব্যবস্থা হয়েছে।

দক্ষিণ আন্দামান ও মধ্য আন্দামানের জঙ্গলে ঢুকতে মানুষের বুক কাঁপে। জঙ্গলে কোন হিংস্র জন্তুর ভয় নেই, কিন্তু জারোয়ার আতঙ্ক তার চেয়েও বেশী। বাঘ ভাল্লুক সামনে পড়লে তো দেখতে পাওয়া যায় এবং সাবধান হওয়া যায়। কিন্তু এখানে কখন কোথা থেকে যে জঙ্গল ভেদ করে বিষাক্ত তীর উড়ে এসে পড়বে তার ঠিক নেই। সভ্যজাতির বিরুদ্ধে দারুণ বিতৃষ্ণা ও প্রতিহিংসা নিয়ে জরোয়ারা শুধু সুযোগের প্রতীক্ষা করে, কখন কি ভাবে আক্রমণ করবে। অনেক সময় ফরেস্টের কাজে লোকজন গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। জারোয়ারা

যদি টের পায় তাদের এলাকায় মানুষ ঢুকেছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ (cooing) করে সবাইকে সাবধান করে দেয় এবং গাছের গুঁড়িতে ঢাকের মত ডুম ডুম আওয়াজ (buttress beating) করে সমরে প্রস্তুত হতে সঙ্কেত পাঠায়। তারপরই দলবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়ে শত্রুর উদ্দেশ্যে।

জারোয়ারা তীর বানায় লোহার ফলা দিয়ে এবং সুপুরি গাছের কাঠ দিয়ে। যাযাবর হলেও ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গাছের ডালপালা দিয়ে এবড়ো খেবড়ো করে একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই তৈরী করে।

বহু চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত কোন জীবিত জারোয়া ধরে তাকে রাখা যায় নি। সাহস এদের দুর্দান্ত। কাউকে তীর ছুঁড়ে মেরে তারপর কাছে এসে মৃত ব্যক্তির গা থেকে তীর খুলে নিয়ে যায়। তীরগুলি হারাতে তারা নারাজ। অ্যানথ্রপলজির মিউজিয়ামে আন্দামানীদের ছবি আছে, ওঙ্গিদের ছবি আছে, কিন্তু কোন জারোয়ার ছবি নেই। দেখতে তারা শুনেছি ওঙ্গিদের মতই।

জারোয়াদের সম্বন্ধে নিত্য নূতন মুখরোচক কাহিনী আন্দামানে শোনা যায়, প্রত্যক্ষদর্শী অবশ্য খুব অল্পই থাকে।

কয়েক বছর আগে মিড্‌ল আন্দামানে তিনটি জারোয়া ধরা পড়েছিল। তৎকালীন কনজারভেটার অফ ফরেস্ট মিঃ চেঙ্গাপ্পা, নিজের বাড়ীতে একটা ঘরে তাদের তালা বন্ধ করে রেখেছিলেন। বাইরে জানালার পাশে ছিল পুলিশ প্রহরী। ঘুমন্ত প্রহরীর পকেট থেকে চাবি বার করে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দরজার তালা খুলে তারা পালিয়ে গেল। পোর্টব্লেয়ারের উৎসুক জনতার ভাগ্যে তাদের দর্শন করার সুযোগ ঘটেনি।

আরেকবার বুশ পুলিশ জঙ্গলের মধ্যে একটি জারোয়া স্ত্রীলোককে দেখেছিল তিনটি শিশু নিয়ে অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে। জিজ্ঞসাবাদ করে কোন উত্তর না পেয়ে পুলিশরা স্ত্রীলোকটিকে

পোর্টব্লেয়ারে নিয়ে আসে। জড়ের মত বসে থাকতে থাকতে কিছুদিন পর স্ত্রীলোকটি মারা যায়। তার ছেলেমেয়েরা নিকোবরের বিশপ রিচার্ডসনের কাছে মানুষ হয়েছে। মেয়েটি বড় হলে অন্য একজন নিকোবরী বিশপ তাকে বিয়ে করে। আমরা যখন নিকোবর গিয়েছিলাম তখন এই মেয়েটিকে দেখেছিলাম। নিকোবরীদের মত লুঙ্গি ব্লাউজ পরা। কুচকুচে কালো এবং অদ্ভুত কুৎসিত দেখতে।

আমরা পোর্টব্লেয়ারে আসবার পর এই চার বছরে অন্তত ত্রিশজন লোককে জারোয়ারা মেরে ফেলেছে। যতদিন এদের পোষ মানানো না যায় এ ভাবেই চলবে হয়ত। অনেকে বলেন বোমা ফেলে সমস্ত জারোয়া এলাকা উড়িয়ে দিলেই তো আপদ চুকে যায়। কিন্তু গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। পৃথিবীর আদিমতম জাতির একটা শাখা এরা, নৃতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই এত শত্রুতা সহ্য করেও জারোয়াদের সঙ্গে আপস করার চেষ্টা চলছে।

আমরা যে বছর পোর্টব্লেয়ার এলাম সে বছর ছিল রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবার্ষিকী। এখানকার বাঙ্গালী ক্লাব 'অতুল সমিতি'তে বিরাট মিটিং হল সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে। প্রোগ্রাম ঠিক হল সপ্তাহব্যাপী উৎসব হবে এবং ইংরেজী, বাংলা, তামিল, তেলেগু, মালয়ালীজ ও হিন্দী ভাষায় একটি করে নাটক অভিনয় করা হবে। ইংরেজীতে Sacrifice, বাংলায় চিরকুমার সভা, তামিলে রাজা রানী, তেলেগুতে বিসর্জন, মালয়ালীজে কাবুলীওয়ালা এবং হিন্দীতে বৈকুণ্ঠের খাতা নির্বাচিত হল। স্যাক্‌রিফাইসে অপর্ণার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য অতুল সমিতির তরফ থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এসে আমার মেয়ে বীথিকে দিতে পারি কিনা জিজ্ঞেস করলেন। আমাদের নিজেদেরও এ বিষয়ে খুব উৎসাহ, তাই খুশী হয়েই রাজী হলাম। মোটামুটি সব কটি নাটকই বেশ ভালো ভাবে অভিনীত হয়েছিল।

যতগুলি কালচারাল অরগ্যানিজেশন পোর্টব্লেয়ারে আছে তার মধ্যে মালয়ানীজদের শিল্পজ্ঞানের প্রশংসা না করে পারা যায় না। এ সব নাটক ছাড়া নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'ও বেশ ভাল হয়েছিল।

বাঙ্গালী ক্লাব অতুল সমিতি স্থাপিত হয় ট্রেজারী অফিসার অতুল চ্যাটার্জীর নামে। এই ভদ্রলোক জাপানীদের হাতে নিহত হন। অতুল সমিতি যদিও স্থাপিত হয়েছিল বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্য কিন্তু এখানে এ সবের বদলে দলাদলি ও নিন্দাচর্চাতেই সকলের উৎসাহ বেশী। সমিতিতে মাঝে মাঝে অভিনয় করা ছাড়া দুর্গাপুজো কালীপুজো এবং সরস্বতীপুজো করা হয়। কালীপুজোর দিন খুব ঘটা করে খাওয়া দাওয়া হয়।

সেদিন ছিল একাদশী। রাম নাম সংকীর্তনের দিন। সারা বছরে বিভিন্ন লোকের বাড়ীতে ও মন্দিরে একাদশীর দিন রামনাম কীর্তন হয়। এবার ছিল রাধা-গোবিন্দজীর মন্দিরে। মন্দিরটি ছোট কিন্তু ভারী সুন্দর। সাউথ পয়েণ্টে সহর থেকে দূরে নির্জন পাহাড়ের ওপর নিরালা মন্দিরে মন আপনিই উদাস হয়ে যায়। ভিতরে রাধা-গোবিন্দের অষ্টধাতুর বিগ্রহ। অনেক লোক হয়েছিল কীর্তনে। সকলে মিলে শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তরশত নাম কীর্তন করল। এই কীর্তন আমি অনেকদিন আগে কন্যাকুমারিকায় বিবেকানন্দ লাইব্রেরীতে শুনেছিলাম, আবার এতদিন পরে শুনে খুব ভালো লাগল।

পোর্টব্লেয়ারে এতদিন ছোটখাট রকমের রামকৃষ্ণ সেণ্টার ছিল। মাঝে মাঝে সকলে এখানে মিলিত হতেন। রামকৃষ্ণ সেণ্টারের উৎসাহেই প্রতি একাদশীতে রামনাম সংকীর্তন হয়। ১৯৬২ সনের মে মাসে পোর্টব্লেয়ারের জনতার ঐকান্তিক আগ্রহে ও অনুরোধে দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন থেকে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী এলেন এখানে। সহরের সকলে দারুণ উৎসাহে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাল। অতুল স্মৃতি হলে সাতদিন ধরে সকালে বিকালে চলল ভজন, কীর্তন ও স্বামীজীর বক্তৃতা। এমন চমৎকার বক্তৃতা বহুদিন শুনিনি। বেদ, বেদান্ত এবং উপনিষদের মত

নীরস বিষয়ও জলের মত সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন স্বামীজী। ধূপের ধোঁয়ায়, ফুলের গন্ধে, রামনামের মহিমায় হলের মধ্যে বেশ একটা আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। কানে শুধু বাজছিল,

"শুদ্ধ ব্রহ্ম পরাৎপর রাম
কালাত্মক পরমেশ্বর রাম ॥
কৌশল্যাসুখ-বর্ধন রাম।
বিশ্বামিত্র প্রিয়ধন রাম ॥"

স্বামীজীর পোর্টব্লেয়ার আসার ফলে এখানে পাকাপাকি ভাবে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হল। চাঁদা তুলে উপস্থিত ছোটখাট একটি 'বিবেকানন্দ হল' তৈরী হয়েছে। মেনল্যাণ্ড থেকে কোন স্বামীজী এখানে না থাকায় কোন কাজই সুষ্ঠু ভাবে এগোচ্ছে না।

পোর্টব্লেয়ারে হিন্দুদের বেশ কয়েকটি দেবমন্দির আছে, এ ছাড়া আছে মুসলমানদের মসজিদ, ক্রীশ্চানদের গির্জা, শিখদের গুরুদ্বার এবং বর্মীদের ফুঙ্গিচাঙ্গ।

হ্যাডো থেকে বাজারে যাবার পথে ডিলানিপুরে বড় রাস্তার পাশে ফুঙ্গিচাঙ্গ। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছোট একটি চত্বর, তার মাঝখানে একটি স্তম্ভ এবং তার মাথায় একটি পিতলের ঝাড়বাতি। বহুদূর থেকে রাত্রিবেলা এই আলো দেখা যায়। চত্বরটির ডানপাশে ছোট একটি প্যাগোডা। সামনে গিয়ে দেখলাম প্যাগোডার সামনে বারান্দায় মাতুর পেতে বর্মী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা চোখে হাত ঢেকে গড়গড় করে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। আমরা গিয়ে দাঁড়াতে আঙ্গুলের ফাঁকে একবার দেখে নিয়ে আবার মন্ত্র পড়তে লাগলেন। আমাদের দেখে বড় ফুঙ্গি অর্থাৎ বৌদ্ধদের যিনি প্রধান তিনি এগিয়ে এলেন। তিনি অল্প অল্প ইংরেজী বুঝতে পারেন। আমাদের নিয়ে প্যাগোডার ভিতরে ছোট একটি ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। ভিতরে ধাতুনির্মিত অপূর্ব সুন্দর ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি। মনে মনে অবাক হলাম, এখানে এত বড় ও এত সুন্দর বুদ্ধমূর্তি দেখে। বর্মী ভাষায় সন্ন্যাসীকে বলে ফুঙ্গি। ফুঙ্গিচাঙ্গ অর্থ

যেখানে ফুঙ্গিরা থাকেন অর্থাৎ বৌদ্ধ শ্রমণদের বিহার। ১৯২৮ সনে বর্মীরা এই ফুঙ্গিচাঙ্গ তৈরী করে। এইটাই সব চেয়ে বড়। সহরের বাইরে অর্থাৎ বর্মীদের অন্যান্য গ্রামে, যেমন—রাইটমেয়ো, মেমিও, ওয়েবি এবং ডিমনানালাতেও ফুঙ্গিচাঙ্গ আছে। বড় ফুঙ্গিকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কোন সম্প্রদায়ের, মহাযান না হীনযান?" তিনি জবাব দিলেন, "আমরা থেরযান বা স্থবিরযান। হীনযান শব্দটা আমরা আপত্তিকর মনে করি তাই নিজেদের বলি থেরযান।"

এককালে আন্দামানে বর্মীর সংখ্যা ছিল অসংখ্য। কয়েদী হয়ে আসা ছাড়াও বহু বর্মী স্বাধীন ভাবেও বসবাস করতে আন্দামানে এসেছিল। কয়েকবছর আগে পর্যন্ত বর্মী গুণ্ডাদের অত্যাচারে সকলে রাত্রি বেলা নির্জন রাস্তা দিয়ে চলতে ভয় পেত। এখনও কথায় কথায় মাথায় লাঠির বাড়ি মারতে বা ছুরি চালাতে বর্মীরা পিছপাও নয়। স্বাধীনতার পর বর্মীদের অনেককে ব্রহ্মদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা হলেও বেশ কিছু সংখ্যক এখনও এখানে রয়েছে। আন্দামানের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জলবায়ু দুইই ব্রহ্মদেশের অনুরূপ হওয়ায় বর্মীদের এখানে অভ্যস্ত হতে বেশী অসুবিধা হয়নি। কয়েদী ছাড়া বর্মার আর একটা জাত স্বাধীন ভাবে এখানে বাস করতে এসেছিল, তারা হল 'কারেন'। বেশীর ভাগ কারেন মধ্য আন্দামানে বাস করে। মায়া বন্দরের কাছে ওয়েবি গ্রামে তাদের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। জীবিকার্জনের জন্য কারেনরা চাষবাস বেছে নিয়েছে। জাতে এরা খৃষ্টান। ওয়েবিতে তাদের একটি গির্জা আছে, আর একটি বর্মী স্কুল। 'ওয়েবি' শব্দের অর্থ স্বর্গ। নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, কৃষ্টি-সংস্কৃতি নিয়ে কারেনরা সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ওয়েবিতে স্বর্গ সুখেই বাস করছে।

অনেক ফিরিঙ্গি পরিবারও স্বাধীনভাবে এখানে বাস করতে এসেছিল।

আর একটা অপরাধ-প্রবণ জাত এখানে আছে, তারা হল মধ্য

ভারতের 'ভান্টু'। চলতি কথায় এখানে বলে 'ভাঁতু'। দেশে এদের পেশা ছিল চুরি ডাকাতি করা। দল বেঁধে যাত্রীদের আক্রমণ করা, লুটপাট করাই ছিল এদের প্রধান কাজ। এই ভাঁতুদের একটা দল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে এল। এখানে এসে তারা ধীরে ধীরে নিজেদের পেশা ভুলে গিয়ে শান্ত হয়ে বসবাস করতে লাগল এবং চাষবাসে মনোযোগী হল। ভাঁতুরা জাতে হিন্দু হলেও অনেকটা আমাদের দেশের অস্পৃশ্যদের মত। অনেকে আবার Indian Salvation Armyর মিশনারীদের কৃপায় খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। অনেক ভাঁতু লেখাপড়া শিখে সরকারী কাজকর্মও করছে। ক্যাডেলগঞ্জ এবং অ্যানিক্ষেতেই ভাঁতুদের বসতি বা বস্তি। আন্দামানের লোক্যালবর্ণ সমাজও ভাঁতুদের বেশ অবজ্ঞার চোখে দেখে।

বর্মীদের ফুঙ্গিচাঙ্গ ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলে ডানদিকে জাদোয়েত কোম্পানীর পেট্রোল পাম্প, তারই কাছে মহাত্মা গান্ধীর একটি প্রমাণ সাইজ প্রতিমূর্তি। পেট্রোল পাম্পের উল্টোদিকে 'মোহনপুরা টাউনশিপ'-এর জমি। জাদোয়েত কোম্পানীর অল্পদূরে বার্মাশেলের পেট্রোল পাম্প, তার পরেই বাজারের সুরু। বেশীর ভাগ দোকানপাটই কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয়দের।

পোর্টব্লেয়ারে যখন প্রথম এসেছিলাম, মনে হয়েছিল মাদ্রাজেরই কোন সহরে এসেছি, এত বেশী এখানে দক্ষিণ ভারতের লোকজন। কুলি-মজুর, মিস্ত্রী-কারিগর, ধোপা-নাপিত, চাকর-বাকর, দোকানদার, হোটেলওয়ালা ছাড়া অফিস আদালতেও বেশীর ভাগ মাদ্রাজী ও মালয়ালীজ। বাজারের চেহারাটা যে কোন পাহাড়ী সহরের মত। গায়ে গায়ে টিনের চাল দেওয়া কাঠের বাড়ীঘর। এবং এসব বাড়ীঘর বেশার ভাগ লোক্যালবর্ণদের।

এবার 'লোক্যালবর্ণ'দের সম্বন্ধে বলব। আন্দামানী, ওঙ্গি, জারোয়া এবং সেন্টিনেলিজদের যদি বলি আদিবাসী বা Son of

the soil, তা হলে পরে যারা এখানে বসবাস করতে এসেছে, কয়েদী হয়েই হোক বা স্বাধীন ভাবেই হোক, তাদের বলব ঔপনিবেশিক বা Emigrants. আন্দামানের অধিবাসী বলতে আজকাল এই ঔপনিবেশিকদেরই বোঝায়।

প্রথম প্রথম অনেককে বলতে শুনেছি 'অমুক লোক্যালবর্ণ'। আগে বুঝতে পারতাম না, পরে অবশ্য জেনেছি 'লোক্যালবর্ণ'-এর অর্থ হল কয়েদীর বংশধর।

কয়েদী উপনিবেশ স্থাপনের পর দেখা গেল, যে সমস্ত কয়েদী দণ্ড পেয়ে আন্দামানে আসে, সকলেই কবে ফিরে যাবে এই আশায় দিন গোনে এবং এই দ্বীপটার ওপর কারও প্রাণের টান থাকে না। গভর্ণমেণ্ট দেখলেন এভাবে চললে এ জায়গাটার কোন উন্নতি হবে না, নিজের দেশ বলে ভাবতে না পারলে এখানকার কোন কাজে কারও কোন উৎসাহ থাকবে না। তাই ১৯২০ সনে নূতন আইন জারী করা হল, দ্বীপান্তরের জন্য কোন কয়েদীকে জোর করে আন্দামানে পাঠানো হবে না; তার বদলে যারা স্বেচ্ছায় পাকাপাকিভাবে সেখানে বাস করতে চায় একমাত্র তাদেরই আন্দামানে পাঠানো হবে। কয়েদীদের বাড়ীঘর করার জন্য ও চাষবাস করার জন্য সরকার থেকে জমিজমা দেওয়া হবে। এ ছাড়া যে সব কয়েদী মুক্তি পেয়েও দেশে ফিরে যাবে না তাদেরও জমি দেওয়া হবে।

১৯২৩ সনে চীফ কমিশনার কর্ণেল ফেরার দুর্দান্ত প্রকৃতির কয়েদীদের সব দেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং অন্য কয়েদীদের দেশে গিয়ে পরিবার নিয়ে আসতে অনুমতি দিলেন। কয়েদীরা বড় আশা নিয়ে দেশে পরিবার আনতে গেল। লজ্জায় ঘৃণায় স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজন তাদের স্বীকার করতে চাইল না। মনের দুঃখে কয়েদীরা আবার আন্দামানে ফিরে এল এবং অনেকে মেয়ে কয়েদীদের বিয়ে করে পাকাপাকি ভাবে স্থিতি হল।

কয়েদীদের বৈবাহিক বন্ধনটিও ভারী অদ্ভুত ছিল। চীফ

কমিশনার এবং অন্যান্য অফিসারদের সামনে মাসে একবার করে মেয়ে কয়েদী ও পুরুষ কয়েদীদের প্যারেড হত। প্যারেডের পর একদিকে মেয়েদের ও অন্য দিকে পুরুষদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত। তারপর প্রত্যেক কয়েদীর স্বভাব ও গুণের পরিচয় দেওয়া শেষ হলে কয়েদীদের অনুমতি দেওয়া হত সঙ্গী নির্বাচন করার জন্য। নির্বাচন শেষ হলে চীফ কমিশনার তখন সেখানেই তাদের স্বামী-স্ত্রী বলে ঘোষণা করতেন। পরে রেজিস্ট্রীতে তাদের নাম লিখে নেওয়া হত। কিছুদিন ঘর করার পর পরস্পর বনিবনা না হলে আবার নতুন করে কয়েদীরা সঙ্গী নির্বাচন করতে পারত। তাদের জাতিগত দেশগত বা ধর্মগত কোন সমস্যা ছিল না। যে জায়গায় এই অপূর্ব বিবাহ পর্ব অনুষ্ঠিত হত সেই জায়গাটি এখন 'সাদিপুর' নামে পরিচিত। যে সব কয়েদীরা পাকাপাকি ভাবে বসত করতে চাইল তাদের জমিজমা দেওয়া হল, নাম হল 'ফ্রি কনভিক্ট'।

ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ শাসিত প্রায় সমস্ত দেশ থেকেই কয়েদী-দের আন্দামানে দ্বীপান্তরে পাঠাত। ভারতবর্ষ ছাড়া বর্মা, সিলোন, মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি সব দেশ থেকেই কয়েদী আসত। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন শিক্ষাদীক্ষার লোকগুলির ক্রমান্বয়ে বহু বৎসর একসঙ্গে বসবাস করার ফলে পরস্পরের প্রতি একটা বিশেষ ধরনের সমবেদনা, সহানুভূতি বা Compassion জন্মায়। তারা নিজেদের এক অখণ্ড জাত বলে মনে করে। সর্বদেশের, সর্বধর্মের, সর্বজাতির কয়েদীদের এই ধরনের মিলনে এক নূতন জাতির সৃষ্টি হল। তাদের সন্তান সন্ততিরা পরিচিত হল 'local born' নামে। শিক্ষাদীক্ষাহীন, ঐতিহ্যহীন, সংস্কৃতিহীন একদল বর্ণসঙ্কর।

লোক্যালবর্ণ শব্দটার মধ্যে কেমন একটা অপমান, কেমন একটা হীনতা মেশান আছে যার জন্য মেনল্যাণ্ডের লোকেরা যাঁরা এখানে সরকারী কার্যোপলক্ষে আসেন, তাঁরা লোক্যালবর্ণদের একটু

অবজ্ঞার চোখে দেখেন। সামাজিক জীবনেও সমানভাবে মিশতে ইতস্ততঃ করেন। তাঁদের সমাজে এরা অপাঙক্তেয়। লোক্যাল-বর্ণদের সামাজিক জীবন ও রীতি নীতি মেনল্যাণ্ডের লোকেদের থেকে আলাদা। এদের ধর্ম সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নেই, বিয়ের বাঁধনও খুব শক্ত নয়, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় কোন নিন্দা নেই। মেয়েরা ইচ্ছা করলে অনেকবার বিয়ে করতে পারে ও স্বামী ত্যাগ করতে পারে, তাতে লোক্যালবর্ণ সমাজে অবাক্ হবার কিছু নেই। 'মর‍্যালিটি' সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি নেই, তা ছাড়া যে কোন জাত বা যে কোন ধর্মের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করায়ও কোন আপত্তি নেই। কারও পাঁচ মেয়ে থাকলে কোন জামাই হিন্দু, কোন জামাই মুসলমান, কোন জামাই খৃষ্টান, কোন জামাই বর্মী অথবা কোন জামাই ইন্দোনেশিয়ান হলে অবাক্ হবার কিছু নেই।

আগে লোক্যালবর্ণরা মেনল্যাণ্ডের লোকেদের থেকে একটু দূরত্ব রেখে চলত। বোধহয় তাদের মনে খানিকটা বিরূপ ভাবও ছিল। এখন এদের মানসিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। আন্দামান সরকার শিক্ষার দিক দিয়ে সর্বরকমে এদের সাহায্য করছেন। স্কুলগুলি সব অবৈতনিক। এ ছাড়া লোক্যাল ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতিবছর মেনল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্ট কলেজে ছাত্র ও ছাত্রী পাঠান হয়। এখানকার ভাষা হিন্দুস্থানী ও উর্দু। ভাষাটাও কিন্তু শুদ্ধ হিন্দুস্থানী নয়, তার মধ্যে অন্য ভাষার বহু মিশেল আছে। উত্তর ভারত এবং মধ্য ভারতের হিন্দীভাষীরা এখানকার হিন্দীর নাম দিয়েছেন 'পোর্টব্লেরিয়ান হিন্দী'। আজকাল অনেক লোক্যালবর্ণ ছেলেমেয়ে মেনল্যাণ্ড থেকে উচ্চশিক্ষা পেয়ে সরকারী কাজে যোগদান করেছে। মেনল্যাণ্ড থেকে যে সব অল্পবয়েসী ছেলে আন্দামানে চাকরী করতে আসে, তাদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে লোক্যালবর্ণ সমাজে খুব গর্বের বিষয় হয়। লোক্যালবর্ণ

শব্দটা আপত্তিকর মনে হওয়ায় প্রকাশ্যে এদের বলা হয়, 'আন্দামান ইণ্ডিয়ান'—আড়ালে 'লোক্যাল'।

কয়েদী হয়ে এসে পরে পাকাপাকি ভাবে এখানে বাস করছে এরকম বহু পরিবারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হয়েছে। দুর্গাপ্রসাদ তাদের মধ্যে একজন। বয়স প্রায় সত্তর বছর। দুর্গাপ্রসাদ আমাদের কাছে গল্প করেছে:

"আমার বাবা ছিলেন সাহারানপুর জেলার এক্ গ্রামের তালুকদার। প্রতিবেশী তালুকদারের সঙ্গে দাঙ্গা হওয়ায়, তাকে খুন করেন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পেয়ে এলেন তিনি আন্দামানে। দীর্ঘদিন পরে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে গেলেন, কিন্তু আত্মীয় স্বজন তাঁকে স্বীকার করতে চাইল না। উপরন্তু আমার চাচা পুলিশকে খবর দিলেন আন্দামান থেকে তাঁর খুনী ভাই ফিরে এসে সম্পত্তির জন্য হামলা করছে, তাকে যেন গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ এসে বাবাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেল। বাবা পুলিশ অফিসারকে বললেন, 'এসব আমার ভাইয়ের কারসাজি। ঠিক আছে, আমি আবার কালাপানি ফিরে যাচ্ছি।' এরপর পিতাজী নিজের জমিজমার স্বত্ব ছেড়ে আন্দামানে চলে এলেন। এখানেই আমাদের জন্ম হয়েছে, এখানেই আমরা বড় হয়েছি। এখানেই আমরা মরব। এই আণ্ডেমানই আমাদের জননী জন্মভূমি।"

আর একজন কয়েদী ব্যাম্বুফ্ল্যাটের কাছে পাণিঘাটে থাকে, তার নাম দাতুলাল। তাকে খবর পাঠালে সে আমাদের বাড়ী এল। প্রায় আশিবছর বয়স লোকটির, কিন্তু এখনও কি লম্বা চওড়া, তাগড়া চেহারা! দাতুলালকে বললাম, "শুনলাম তুমি একজন খুব পুরোনো লোক আন্দামানের। আমি তোমার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।" দাতুলাল বলল, "হাঁ, হাঁ মেমসাব, কয়েক বছর আগে এক সাহেব এসেছিলেন আমার কাছে নাবিল (নভেল) লিখবে বলে।" আমি অবশ্য আগেই শুনেছিলাম সুরেশ বৈদ্য নামে এক জার্নালিস্ট তার

কাছে গিয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি করে তুমি এখানে এলে?" দাহুলাল বলল, "আমার মুলুক মধ্য প্রদেশের বালাঘাট জেলায়। আমাদের গ্রামের জমিদার ছিল বড় অত্যাচারী। মেয়েছেলেরা তার ভয়ে রাস্তায় বার হতে পারত না। ক্ষেতিবাড়ী নিয়ে আমি বেশ সুখেই ছিলাম। এর মধ্যে একদিন আমার ছোটবোন জল ভরতে গিয়ে আর ফিরে এলো না, শুনলাম জমিদার তাকে নিজের কুঠীতে নিয়ে গিয়েছে। অসহ্য রাগে আমার মাথায় খুন চড়ে গেল। গুপ্তিটা হাতে নিয়ে গেলাম জমিদার বাড়ী এর একটা বিহিত করতে। জমিদারকে বললাম, 'বহিনকে বের করে দাও।' জমিদার উল্টে আমাকে গালাগালি দিয়ে উঠল। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপর। ধড় থেকে মাথা কেটে ফেললাম, তারপর তার হাত পা টুকরো টুকরো করে কেটে ঘরে ফিরে এলাম।"

আমি—"জমিদার বাড়ীর লোকজন ছিল না?"

দাহুলাল—"সেদিন একটা পরব ছিল গ্রামে। সময়টা ছিল ভরা তুপুর, গ্রামের বেশীরভাগ লোকই মহুয়া তুলতে জঙ্গলে গিয়েছিল। তাইতো আমি মনের সুখে জমিদারকে টুকরো টুকরো করে কেটেছি, এমনকি তার রক্তও খেয়েছি।"

গুপ্ত সাহেব শিউরে উঠে বললেন, "রক্ত খেয়েছ? কি সাংঘাতিক কথা, মানুষে রক্ত খেতে পারে?"

দাহুলাল বলল, "সাহেব, তখন কি আর মানুষ ছিলাম। আক্রোশের বশে হয়ত খেয়েছিলাম। গরম রক্তে আমার মুখ ভেসে গিয়েছিল।"

আমার তো শুনে মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। কি বেপরোয়া লোকরে বাবা! কেমন বড়াই করে নিজের খুনের কথা বলছে!

জিজ্ঞেস করলাম, "ধরা পড়লে কি করে?"

দাহুলাল—"আমার গুপ্তিটা আমি ভুলে ফেলে এসেছিলাম। রাত প্রায় বারটার সময় পুলিশ এসে আমাকে গ্রেপ্তার করে।"

আমি—"ফাঁসী না হয়ে দ্বীপান্তর হল কেন ?"

দাতুলাল—"পুলিশকে বললাম নিজের জান বাঁচাতে জমিদারকে মেরেছি। ফাঁসীর হুকুমই হয়েছিল, পরে আপীল করাতে বিশ বছরের জন্য দ্বীপান্তর হয়। প্রবল বর্ষার সময় আমি এবং আরও একশ নব্বই জন কয়েদী 'মহারাজা' জাহাজে করে পোর্ট-ব্লেয়ারে এলাম। সেটা ছিল ১৯০৮ সন। সে জাহাজ এখন আর নেই। সে সময়ে খুনী আসামীদের সকলেই বেশ ভয় করত। সেলুলার জেলের মেয়াদ শেষ হবার পর আমাকে রাস্তা তৈরীর কাজে লাগিয়ে দিল। সে আমলে শুধু রাস্তা তৈরী হত। বন জঙ্গল কেটে কত পরিশ্রম করে আমরা এ সব রাস্তা তৈরী করেছি। আমাদের কত লোক যে জারোয়ার হাতে মারা পড়েছে তার ঠিক নেই।" গুপ্ত সাহেবকে উদ্দেশ করে বলল, "কি আপনাদের গভর্নমেণ্টের কাজ হয় ইঞ্জিনীয়ার সাব, আমাদের সময় যা কাজ হত তা কল্পনাও করতে পারবেন না। কোথাও রাস্তা ভেঙে গেলে রাতারাতি শ' শ' লোক লাগিয়ে সে রাস্তা মেরামত হত। ইংরেজ সাবরা বড়ই কাজের লোক ছিল।"

আমি বললাম, "দেশে ফিরে যাওনি এখানে আসার পর ?"

দাতুলাল—"জেলে থাকাকালীন আমার রিপোর্ট খুব ভালো থাকায় ১৪ বছর পর আমাকে মুক্তি দেয়। দেশে ফিরে গেলাম। কিছুদিন বাদে আমাদের গ্রামে একটা খুন হল; সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে আমাকে গ্রেপ্তার করল, কারণ আমি কালাপানি ফেরত খুনী আসামী। প্রমাণ অভাবে তাদের হাত থেকে ছাড়া পেলাম। আশে পাশের গ্রামে চুরি ডাকাতি হয়, আমাকেই সন্দেহ করে। শেষে ভাবলাম এখানে আর থাকব না। এমনিতেই সকলে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখে, তার উপর নিত্যদিন এরকম সন্দেহের পাত্র হয়ে থাকা সম্ভব নয়। এর চেয়ে আন্দামানে ফিরে যাওয়াই ভাল। শেষপর্যন্ত ফিরেই এলাম। সরকার থেকে জমিজমা পেলাম। আমার এখন

কোন দুঃখ নেই। তিন চারখানা বাড়ী আছে, দেড়শ জানোয়ার (গরু মহিষ) আছে, ক্ষেতি বাড়ী আছে ; আমি এখন বেশ সম্পত্তি-শালী। মেমসাব, এই আন্দামানের কত পরিবর্তন দেখলাম। জঙ্গল সাফ করে কত কুঠীবাড়ী হল, বিজলী বাতি হল, গাড়ী ঘোড়া হল। ইংরেজ গেল, জাপানী দুশমন এল, রাজত্ব করল, আবার ফিরে গেল। এই জিমখানা ময়দান পবিত্রভূমি। এখানে নেতাজী এসেছিলেন, রাজেন্দ্র প্রসাদজী এসেছিলেন। এখানেই নেতাজী প্রথম তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়িয়েছিলেন। আমি যখন কয়েদী হয়ে আসি তখন এই জায়গায় সমুদ্র ছিল। মেমসাব, বহুদিন হল এখানে এসেছি। ছেলেমেয়েদের বিয়ে কিন্তু এখানে কয়েদীদের ছেলেমেয়ের সঙ্গে দিইনি। দেশে গিয়ে বৌ জামাই ঠিক করেছি। এবার ভাবছি ছেলেদের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে এলাহাবাদ গিয়ে কিষণজীর নাম করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেব।”

আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, এঁর নাম যোগেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী। বিরাশী বছরের বৃদ্ধ, চলতে ফিরতে থর থর করে কাঁপেন। তিনি গল্প করেছেন : “আমি ১৯০৬ সনে আন্দামানে এসেছি। আমার বাড়ী বরিশাল জিলার মাহিলাড়া গ্রামে। মৈমনসিংএ আমি কেরানীর কাজ করতাম। একদিন অফিসে একজন সহকর্মীর সঙ্গে বচসা হওয়ার ফলে সে আমাকে রুলার ছুঁড়ে মারে। আমার তখন অল্প বয়স, রক্তের গরম বেশী। হাতে ছিল কাগজ কাটা ছুরি, হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে সেই ছুরি দিয়ে বার বার তাকে আঘাত করতে লাগলাম। অন্য সকলে যখন আমাকে সরিয়ে আনল সহকর্মীটি তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। হাসপাতালে সে পরে মারা যায়। বিচারে আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। আন্দামানে এসে সেলুলার জেলে তিন মাস থাকবার পর আমি একটু লেখাপড়া জানা লোক বলে অফিসে কাজ দেয়। সেখানে convict writer হিসাবে আমি বহু বছর কাজ করেছি। আমার কাজ ছিল সব

কয়েদীদের রেকর্ড রাখা। জাপানীরা সে সব কাগজ পত্র পুড়িয়ে ফেলেছে। আগে যত কয়েদী আসত তাদের সকলেরই পূর্ব ইতিহাস লিখে রাখা হত। মুক্তি পাবার পর সরকার থেকে জমিজমা পেলাম এবং এখানেই এক কয়েদীর মেয়েকে বিয়ে করে স্থিতি হলাম। দেশের কথা এখন আর মনেও হয় না। আত্মীয় স্বজন বলতে আমি এখানকার লোক্যালবর্ণদেরই মনে করি।"

এবার আর একজন কয়েদীর কথা বলব যাকে বাংলাদেশের অনেকেই নামে চেনেন। তার নাম গোপীনাথ চক্রবর্তী বা গোপী-গুণ্ডা। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষালের কয়েকটি বইতে গোপীগুণ্ডার কথা আছে। গোপী এখন এখানে ছাতা মেরামতের দোকান দিয়েছে।

একদিন সকাল বেলা একজন আধা-ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রৌঢ়লোক সঙ্গে একটি ছেলেকে নিয়ে গুপ্তসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এল। নাম বলল গোপীনাথ চক্রবর্তী। নামটা শুনেই আমরা খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। কারণ পোর্টব্লেয়ারে আসবার পরই গোপীগুণ্ডার অনেক গল্প শুনেছিলাম। গোপী বলল, তার ছেলে দাশনগর থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে, যদি পি. ডব্লিউ. ডি.-তে কোন কাজ পাওয়া যায়। ছেলেটি কিন্তু ভারী সুন্দর দেখতে। গুপ্তসাহেব বললেন, "তোমার ছেলেকে তো দেখছি রাজপুত্রের মত দেখতে। বাংলা জানে?" গোপী একগাল হেসে বলল, "ওর মা এখানকার মেয়ে কিনা তাই খুব সুন্দরী।" গুপ্তসাহেব বললেন, "কেন এখানকার মেয়েরা কি সবাই সুন্দরী?"

গোপী—"আজ্ঞে না সার, আমার বৌ এক পাঞ্জাবী কয়েদীর মেয়ে তাই সুন্দরী। বাড়ীতে সবাই হিন্দীই বলে, তবে দাসনগরে গিয়ে আমার ছেলে বাংলা শিখেছে।" গুপ্তসাহেব আশ্বাস দিলেন অফিসে ঢুকিয়ে দেবেন।

কয়েকদিন পর গোপীকে ডেকে পাঠালাম। সে এসে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি জানতে চান? পাগলা হত্যার কথা? আমি

পঞ্চানন ঘোষালের 'রক্ত নদীর ধারা' পড়েছি। সব কথা ঠিক লেখেনি, আমাকে তো মেরেই ফেলেছে।" আমরা সকলে এত কথা শুনে প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেলাম। কি অদ্ভুত লোকটা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি করে এখানে এলে?"

গোপী—"ছিলাম ভদ্রলোকের ছেলে, বাবা ছিলেন পোস্ট মাস্টার। স্কুলে থাকতেই কুসংসর্গে পড়ে বয়ে গেলাম। শেষে বাড়ী ঘর ছেড়ে চুরি ডাকাতি, খুন, মদ এবং মেয়েমানুষ নিয়েই ডুবে রইলাম।"

আমি—"তুমি তো খোকা গুণ্ডার সাকরেদ ছিলে, তাই না?"

গোপী জবাব দিল, "আমি কেন সাকরেদ হতে যাব, আমার মত গুণ্ডা তখন কলকাতায় কেউ ছিল না। খোকা গুণ্ডার নাম ছিল অবিনাশ নন্দী। আর ওটাতো একটা কাওয়ার্ড ছিল। আমার কথা না শুনে সে কোন কাজে হাত দিত না। আমি নিজে অনেক পাপ করেছি, অনেক খুন করেছি, কিন্তু পাগলাকে হত্যা করতে, চাইনি। তাকে অনেক বার বলেছি 'পালিয়ে যা, পালিয়ে যা।"

গোপী বলে চলল, "পাগলার নাম ছিল অতুলবাবু, পেশায় সে ছিল একজন তবলচী। আমাদের দলের খোকাবাবু একটি মেয়েমানুষকে ভালবাসত, তার মাম মলিনা। পাগলাও তাকে ভালবাসত এবং মলিনার তার উপর পক্ষপাতিত্বও ছিল। এটা খোকাবাবু সহ্য করতে পারত না। হিংসায় পাগল হয়ে শেষ পর্যন্ত পাগলাকে খুন করাই সে ঠিক করল।

আমাকে খোকাবাবু অর্থাৎ খ্যাঁদা সব সময়ই সব কাজের বিষয় জিজ্ঞেস করত। বুদ্ধি পরামর্শ সব আমিই দিতাম। আমাকে যখন বলল পাগলাকে খুন করবে, আমি ঠিক সায় দিতে পারিনি। কারণ পাগলাকে সকলেই বেশ ভালবাসত। মানুষটা ছিল গুণী এবং নিরীহ স্বভাবের।

একদিন খোকার সঙ্গে ট্যাক্সি করে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা গলির মধ্যে পাগলাকে দেখতে পেয়ে তাকে ট্যাক্সির মধ্যে টেনে তুলল।

পাগলা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। সে খুব ভালো করেই জানত খোকা তাকে বাগে পেলে খুন করবে, তবুও সে আমাদের সঙ্গে যেতে কোন আপত্তি করল না, এমনকি কোন শব্দও করল না। রাত প্রায় আটটার সময় আমরা গঙ্গার ধারে গেলে খোকা পাগলাকে বলল, 'যা ডুব দিয়ে আয়।' পাগলা বিনা বাক্যব্যয়ে গঙ্গায় ডুব দিয়ে এল। এর পর আমরা গেলাম একটা শিবের মন্দিরে। খোকা পাগলাকে বলল, 'যা মন্দিরে প্রণাম করে আয়।'

আমি পাগলার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে গেলাম এবং তাকে চুপি চুপি বললাম, 'পাগলা পালিয়ে যা, পালিয়ে যা।' সে একবার আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল, তারপর সাষ্টাঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করল।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা কুমারটুলির এক মেথর গলির মধ্যে পাগলাকে নিয়ে তুললাম। এ গলিতে লোকজনের যাতায়াত একেবারেই নেই, একমাত্র মেথররা দিনের বেলা এখানে কাজ করতে আসে। রাত্রিবেলা একেবারে নিরালা হওয়ায় আমাদের খুব সুবিধা হল। আমি আর আমাদের আর একজন বন্ধু কেষ্ট পাগলার দুই হাত দুই দিকে টেনে ধরলাম আর খোকাবাবু তার বুকে লম্বালম্বি ভাবে ছুরি চালিয়ে দিল।

আমি খোকাকে বললাম, 'এবার মুণ্ডুটা ধড় থেকে কেটে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আয়, আর ধড়টাকে ড্রেনের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখ।' আমার খুব ঘুম পাচ্ছিল তাই দেরী না করে বাড়ী ফিরে এলাম। পুরান আস্তানায় না গিয়ে হাওড়ায় নূতন আস্তানায় গেলাম। ভেবেছিলাম পুলিশ আমার নাগাল পাবে না। কিন্তু পুরান বাড়ীতে আমার ভাইকে দেখতে পেয়ে পুলিশ তার কাছ থেকে আমার খোঁজ পায় এবং রাত তিনটের সময় ঘুমন্ত অবস্থায় আমাকে গ্রেপ্তার করে। তবে আমি জোর করে বলতে পারি, জেগে থাকলে পুলিশের বাবাও আমার টিকির নাগাল পেত না। পরে অবশ্য খোকা ও কেষ্ট দুজনেই গ্রেপ্তার

হয়েছিল। খোকার ফাঁসী হয় আর কেষ্ট এখানে আসার কিছুদিন পর মারা যায়। বিচারে আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। মুক্তি পেয়ে দেশে একবার গিয়েছিলাম। সে সময় হিন্দু মুসলমানে খুব দাঙ্গা চলছিল। এমনিতেও কলকাতা আর ভাল লাগল না। আবার আন্দামানে ফিরে এসে বিয়ে থা করে এখানেই রয়ে গেলাম। সরকার থেকে জমিজমা পেলাম। ছাতা মেরামত করেও বেশ পয়সা পাই। বেশ ভালই আছি।"

জিজ্ঞেস করলাম, "শ্রীযুত পঞ্চানন ঘোষাল যখন এখানে এসেছিলেন, তুমি নাকি তাঁকে চিনতে পারোনি?"

গোপী—"কি করে চিনব? তখন ছিল ছোকরা আর এখন বয়স হয়ে কত চেহারা বদলে গিয়েছে। তবে চিনতে পারলে—" কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

সমস্ত ঘটনাটা বলবার সময় গোপী গুণ্ডার মুখের হাসি ও চক্‌চকে চোখ দেখে কেমন অবাক হয়ে গেলাম। এত বছর পরেও খুনের কথা বলতে লোকটার এত আনন্দ!

এবার একটি মেয়ে কয়েদীর কথা বলব। সাদিপুরে একবার ৺শ্রীশ্রী কালীপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপের একপাশে ফলটল কাটা হচ্ছিল। সেখানে গিয়ে আমিও ফল কাটতে বসলাম। বঁটিগুলিতে ধার ছিল না মোটেই তাই খুব অসুবিধা হচ্ছিল। এক কোণে একটি বিধবা বয়স্থা স্ত্রীলোক বসে বসে ফল কাটছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, "আমাদের গ্রামে যে বঁটি তৈরী হয় সে বঁটি দিয়ে মানুষের গলা কাটা যায়। সেবার যখন আমি কমলির গলা—"

বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে যে কটি প্রাণী ছিলাম সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, "হ্যাঁ, কি বলছ?"

স্ত্রীলোকটি প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, তারপর জোর দিয়ে বলে উঠল, "হ্যাঁ কেটেছিইতো বঁটি দিয়ে কমলির গলা।"

একজন ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, "কি পাগলের মত কথা বলছ

নিবাসী? সত্যিই নিজে হাতে মানুষের গলা কেটেছ? কি সর্বনাশ রে বাবা।" সকলে নিবাসীকে ঘিরে ধরলাম, "বল, তোমার খুনের গল্প বল।"

নিবাসী বলতে লাগল, "তারকেশ্বরের কাছে এক গ্রামে আমাদের বাড়ী ছিল। ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী গেল মরে। সংসারে অভিভাবক কেউ নেই, যা খুশি তাই করি। গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলেই আমার প্রেমিক। কিন্তু একটি ব্রাহ্মণ ছেলে ছিল, নাম হরিহর। যেমনি দেখতে সুন্দর, তেমনি দেবতার মত চরিত্র। তাকে পাওয়ার জন্য প্রাণ আমার আকুলি বিকুলি করে, কিন্তু সে আমার দিকে ফিরেও তাকায় না।

একদিন নিজেই গেলাম তার কাছে উপযাচিকা হয়ে। হরিহর আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল, বলল, 'তোমার মত বদ মেয়েমানুষকে আমি ঘেন্না করি। মুখুয্যে পাড়ার কমলার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে।'

রাগে জ্বলতে জ্বলতে ফিরে এলাম। পরদিন সন্ধ্যাবেলা কমলাদের খিড়কীর পুকুরঘাটে লুকিয়ে বসে রইলাম। খানিক বাদে কমলা এল কি যেন ধুতে। গায়ে কয়েকখানা নূতন গয়না। হাতে ছিল বঁটি। পিছন থেকে পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে ঘাড়ে দিলাম এক কোপ। শব্দ না করে কমলা পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি করে মাথা, ধড়, হাত-পা ফালা ফালা করে কেটে কচুরি পানার মধ্যে গুঁজে রেখে চলে এলাম। সঙ্গে গয়না কটা আনতে ভুললাম না।

ফেরার পথে হরিহরের সঙ্গে দেখা। কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে জিজ্ঞেস করল, 'একি তোমার কাপড়ে রক্তের দাগ কেন?' বললাম, 'মাছ কাটছিলাম, তারই রক্ত।'

খানিক পরে কমলার খোঁজ পড়ল। সারা গ্রাম তোলপাড় করেও কমলাকে পাওয়া গেল না! হরিহর ব্যাপারটা আঁচ করে

পুলিশকে খবর দিতে চলল। আমি এদিকে একটা কাঁচি ও ছুঁচ সুতো নিয়ে হরিহরের শোবার ঘরে সকলের অলক্ষ্যে ঢুকে তার বালিশের খোলের মধ্যে গয়না পুরে সেলাই করে দিলাম।

বাড়ী ফিরে আসবার খানিক পরেই পুলিশ এসে আমাকে ধরল। স্বীকার করলাম, বললাম, 'একাজে সাহায্য করেছে হরিহর। তার বালিশের মধ্যে দেখ গিয়ে কমলার গয়না।' হরিহরও ধরা পড়ল। বিচারে আমাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হল। 'মহারাজা' জাহাজে চড়ে আন্দামানে আসবার সময় হরিহরকে দেখতে পেয়ে বললাম, 'এবার আমরা দুটিতে একসঙ্গে থাকতে পারব।' হরিহর কথা না বলে ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিল।

এখানে আসবার পর হরিহরের সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি, শুনেছি অসুখে ভুগে জেলের মধ্যেই সে মারা গিয়েছে। জেলের মধ্যে আমরা মেয়েদের ওয়ার্ড 'জেনানা বারিকে' থাকতাম। ভীষণ তামাক খেতে ভাল বাসতাম, না খেতে পেয়ে খুব কষ্ট হত। একদিন জেলার সাহেব পাইপ মুখে দিয়ে আমাদের ব্যারাকে এলেন। অনেকদিন পর তামাকের গন্ধে প্রাণটা আনচান করে উঠল। জেলারকে আমরা বললাম, 'সাহেব, আমাদের তামাক খেতে দাও, নইলে বড় কষ্ট হয়।' সাহেব উল্টে গালাগাল দিয়ে উঠল। আর যায় কোথা—আমরা আটদশ জন মিলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আচ্ছা করে পিটিয়ে তবে থামলাম। পরে এর জন্য আমাদের সাতদিন হাত পা বেঁধে কঞ্জি খাইয়ে রেখেছে, আর মুখের সামনে এসে জমাদার টিণ্ডেলরা আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে তামাক খেয়েছে।"

ঘরের মধ্যে ছুঁচ পড়লে শোনা যায়।—"তারপর?"

—"তারপর একদিন বিয়ের প্যারেডে নিয়ে গেল। সাহেবদের মধ্যে কি সব কথাবার্তা হল, আর আমরা এক একজনের সঙ্গে ঘর করতে এলাম। আমার জুটেছিল একজন বাঙ্গালী কয়েদী। খুব ভালবাসা হয়েছিল তার সঙ্গে, আমাদের বলত 'ফিরি কয়েদী।'

আমার ছেলেপুলে না হওয়ায় আমার আদমী আবার বিয়ে করেছিল। সে মারা যাবার কিছুদিন পর সতীনটাও মারা গেল। এখন সতীনের ছেলেপুলে নিয়ে আমি সংসার করছি। আমাকে ওরা নিজের মায়ের মত ভালবাসে। মনে শুধু দুঃখ হয় হরিহরের কথা ভাবলে। নির্দোষ মানুষটাকে আমিই শেষ করলাম। হিংসায় আমি তখন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।”

এমনি আরও অনেক আছে। কেউ নিজে খুন করে এসেছে, কারুর বাপ মা খুন করে এসেছে। কেউ একটা খুন করেছে, কেউ-বা পাঁচটা খুন করেছে। এত খুনী একসঙ্গে দেখার সুযোগ একমাত্র আন্দামানে এলেই পাওয়া যায়।

পোর্টব্লেয়ারে ঢোকবার মুখেই একটি ছোট্ট দ্বীপ পড়ে, তার নাম রসদ্বীপ (Ross Island)। ব্রিটিশ আমলে রসদ্বীপেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেডকোয়াটার্স ছিল। চীফ কমিশনার এবং অন্যান্য ইংরেজ পদস্থ অফিসাররা রস-এই থাকতেন। পোর্টব্লেয়ারে থাকতেন ডেপুটি কমিশনার এবং দেশীয় অফিসাররা। কি রকম করে জীবন উপভোগ করতে হয় তা বোধহয় ইংরেজের মত কম লোকই জানে। এতদূরে সমুদ্র বেষ্টিত একটি ছোট্ট দ্বীপে সেই একশ বছর আগেও তারা যে কি পরিমাণ আরাম ও বিলাসে দিন কাটাত তার প্রমাণ পাওয়া যায় রস এ গেলে। গভর্ণমেণ্ট হাউস (চীফ কমিশনারের বাংলো), ক্লাবরুম, সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট, বাঁধান রাস্তাঘাট এখনও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ইউরোপীয় অফিসাররা বেশীরভাগ রস-এ থাকতেন বোধহয় কয়েদীদের কাছ থেকে একটা নিরাপদ দূরত্বে থাকবার জন্য। সর্বক্ষণ পোর্টব্লেয়ার ও রসদ্বীপের মধ্যে ফেরীবোট চলাচল করত। দৈনিক পাঁচশ' কয়েদী রাস্তাঘাট পরিষ্কার করত।

বর্তমানে রসদ্বীপ দেখলে বড় দুঃখ হয়। এত সুন্দর দ্বীপটা একেবারে জনমানব শূন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। একবার ভূমিকম্পের

ফলে রসদ্বীপের বহু জায়গা ধ্বসে যায়। জিওলজিস্টরা রসদ্বীপ পরীক্ষা করে বলেছেন রস ধীরে ধীরে ডুবছে। ১৯৪১ সনে রস একেবারে পরিত্যক্ত হল। অযত্নে, অবহেলায়, অব্যবহারে রস-এর বাড়ীঘর ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। এখন রস-এ পিকনিক করা ছাড়া কেউ বড় একটা যায় না। সরকার থেকে এখানে ন্যাশন্যাল পার্ক করার পরিকল্পনা আছে। ১৯০৩ সনে মিঃ বডেন ক্লস এসেছিলেন এখানকার 'ফনা' এবং 'ফ্লোরা' দেখবার জন্য। তিনি রস সম্বন্ধে বলেছেন, "বন্দরে ঢোকার মুখেই রস আয়ল্যাণ্ড, ছোট্ট একটি পাহাড়ী দ্বীপ, আয়তনে প্রায় ২০০ একর। ঘন জঙ্গলে ঢাকা দ্বীপটির একেবারে উঁচুতে চীফ কমিশনারের বাংলো, অনেকটা আমাদের দেশের 'উইণ্ডসর কাসল'-এর অনুকরণে তৈরী। তার কাছেই চার্চ এবং ইউরোপীয় প্রহরীদের ব্যারাক। তার নীচে সেট্‌লমেণ্ট অফিসারের বাংলো, মাঝে মাঝে সুদৃশ্য পাম এবং গাছপালার সারি। একেবারে নীচে সমুদ্রের ধারে তোষাখানা, এবং অন্যান্য সরকারী বাড়ীঘর। সমস্ত দ্বীপটির অনবদ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সুপরিকল্পিত বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট দেখে আমরা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। পৃথিবীর এককোণে এতদূরে এমন সুন্দর একটা জায়গা আছে আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।"

রসদ্বীপ থেকে বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্র দেখা যায়, সামনে বা ধারে কাছে আর কোনও দ্বীপ নেই। কাজেই শত্রুপক্ষের জাহাজের ওপর নজর রাখতে হলে রস হচ্ছে আদর্শ জায়গা। জাপানীরা আন্দামানে থাকাকালীন রস-এ বহু পিলবক্স, ম্যাগাজিন তৈরী করেছিল। কোন নূতন বাড়ীঘর করার প্রয়োজন হলে রস-এর বাড়ীঘর ভেঙে ইঁট কাঠ বের করে নিত।

ভূতত্ত্ববিদ্‌রা বলেছেন, রসদ্বীপ ধীরে ধীরে ডুবছে। অনেকের মতে আন্দামানও নাকি ডুবছে। প্রমাণ হিসাবে অনেকে বলেছেন, পোর্টকর্ণওয়ালিসের উপনিবেশ উঠে যাবার পর সেখানকার চ্যাথাম

দ্বীপের গুদামঘরটি ধীরে ধীরে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া রাশিয়ান জিওলজিস্ট ডাঃ হেলফার তাঁর স্টীমার নিয়ে যে সব খাড়ির মধ্যে অনায়াসে ঢুকে পড়তেন, সে সব জায়গায় এখন ছোট ডিঙ্গি নিয়েও ঢোকা যায় না। আরও একটা কারণ, বটানিস্টদের মতে অনেক গাছ আছে যা নাকি সমুদ্রের ধারে কিছুতেই জন্মাতে পারে না, সেইসব গাছ এখন অনেক জায়গায় সমুদ্রের ধারে দেখা যায়। তাতে মনে হয় আগে সেই গাছ অনেক ওপরে পাহাড়ের গায়ে জন্মেছিল, এখন পাহাড়গুলি ধীরে ধীরে সমুদ্রগর্ভে চলে যাওয়ায় জলের কাছে এসে পড়েছে। এই সব কারণ দেখিয়ে আন্দামান কমিটী গভর্ণমেণ্টের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছিল। মিঃ জি. এইচ. টিপার এবং মিঃ আর. বি. সোয়েল (Mr. G. H. Tipper এবং Mr. R. B. Swell) আন্দামান কমিটীর এ তথ্য অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে আন্দামান ডুবছে এ কথা সত্য নয়।

আন্দামান ডুবছে কিনা সত্যিই জানি না, তবে বর্ষাকালে মাঝে মাঝে যে রকম ধ্বস নামে তাতে মনে হয় তলা দিয়ে ক্ষয় হতে হতে কোন্‌দিন আন্দামান সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যায় তার ঠিক নেই।

আন্দামানের ইতিহাসে কয়েকটা বছরের ইতিহাস বড় করুণ। তা হল জাপানী রাজত্ব বা 'রেন অফ টেরার'।

১৯৪২ সন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অফিসার ও কর্মচারী রেখে বাকী সব ইংরেজ অফিসারদের ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হল। যে কয়জন বড় অফিসার রয়ে গেলেন তাঁরা হলেন চীফ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার এবং পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আন্দামান সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তার কারণ কারও ছিল না, কেউ আশঙ্কাও করেনি কোনদিন এখানে শত্রুপক্ষ আসতে পারে। একটা গুজব হঠাৎ শোনা গেল—জাপানীরা আন্দামানের দিকে রওনা দিয়েছে। ডেপুটি কমিশমার মিঃ রেডিডিশি, পুলিশ সাহেব

মিঃ ম্যাকার্থী এই খবর শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। জাপানীদের হাতে বন্দী হবার চেয়ে পালিয়ে যাওয়া ভাল। অনেক ভেবে তাঁরা কয়েকটি মোটর বোটে তিন মাসের রেশন নিয়ে সমুদ্রযাত্রার জন্য তৈরী হলেন। সব ঠিক করে শেষে চীফ কমিশনার মিঃ ওয়াটারফল্‌স্‌কে অনুরোধ করলেন তাঁদের সঙ্গী হবার জন্য। মিঃ ওয়াটারফল্‌স্‌ নিজের দায়িত্ব ছেড়ে কাপুরুষের মত পালাতে অস্বীকার করলেন।

অগত্যা ডেপুটি কমিশনার এবং পুলিশ সাহেব কয়েকজন সারেঙ্গ এবং খালাসী নিয়ে রাত্রিবেলা নিঃশব্দে লুকিয়ে পোর্টব্লেয়ার থেকে ত্রিশ মাইল দূরে শোল বে-তে (Shoal Bay) গেলেন। সেখান থেকে মোটর বোটে উঠলেন। বোট ছাড়ার পরও কারুর মনে শান্তি নেই। ভয় দুদিকেই। এক, পোর্টব্লেয়ারের লোকেরা যেন টের না পায়; দুই, জাপানীদের হাতে না পড়তে হয়। পোর্টব্লেয়ার ছাড়বার আগে মিঃ রেড্ডিশি ভারতবর্ষে বেতারে খবর পাঠালেন যে, এখান থেকে চারটি মোটর বোট রওনা দিচ্ছে, যে বন্দরেই তারা পৌঁছাক-না কেন তাদের যেন সর্বরকমে সাহায্য করা হয়।

'নোরা' বোটের সারেঙ্গ তুলসীরাম গল্প করেছে, "মেমসাব, আঁধার রাতে ভগবানের নাম নিয়ে আমরা চারটা বোট একসঙ্গে ছাড়লাম। অর্ধেক পথ যাবার পর 'ডগলাস' ও 'সুরমাই' বোট অচল হয়ে পড়ল। তাদের ছেড়েই আমরা এগিয়ে চললাম। ম্যাকার্থী সাহেব ছিলেন আমার বোটে। তাঁর প্রচণ্ড মনের বল ও সাহসের জোরে আমরাও মনে সাহস পেয়ে এগোতে লাগলাম। খাবার জিনিস এ কয়দিনে অর্ধেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে, জল ফুরিয়ে গিয়েছে। আমাদের শরীরে তাগদ কমে এসেছে কিন্তু তবু চলতে লাগলাম। চলতে চলতে বিশাখাপত্তনের কুড়ি মাইল দূরে বিমলিপত্তনে গিয়ে পৌঁছলাম। রাস্তায় আমাদের সঙ্গে একটি ব্রিটিশ নেভি জাহাজের দেখা হয়েছিল। 'নোরার' চেহারাটা ছিল অনেকটা সাবমেরিনের মত। নেভি জাহাজ বিশাখাপত্তনে খবর দেয় যে, একটি জাপানী সাবমেরিন

তারা ঐ দিকে আসতে দেখেছে। আমরা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে জাপানী চর ভেবে সবাইকে গ্রেপ্তার করা হল। তারপর ভাইজাগের নেভি অফিসে ম্যাকার্থী সাহেবকে নিয়ে গিয়ে সব কথা শুনে আমাদের ছেড়ে দিল। পরদিন নেভি জাহাজ পথের থেকে 'ডগলাস', 'সুরমাই' এবং 'সোরাব'-কে উদ্ধার করে আনে।"

নেহাত আয়ুর জোর থাকায় তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সকলে নিরাপদে পৌঁছাতে পেরেছিলেন।

এদিকে ২২শে মার্চ সন্ধ্যাবেলা প্রায় দশ বারটি জাপানী জাহাজ পোর্টব্লেয়ারের চারপাশে ভিড়ল। সহরের লোকেরা আলো নিভিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল কি হয়, কি হয়। প্রথম রাত্রিতে কিছু হল না। ভোরবেলা প্রায় ৪টার সময় জাপানীরা দলে দলে জাহাজ থেকে নামতে সুরু করল।

দলে দলে সৈন্য চারদিক থেকে নামতে থাকায় উপায়ান্তর না দেখে মিঃ ওয়াটারফল্‌স্‌ জেটিতে গিয়ে শ্বেত পতাকা হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন। জাপানীরা তাঁর হাত থেকে পতাকা ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে বন্দী করল এবং পোর্টব্লেয়ারে জাপানী পতাকা উত্তোলন করল।

তারপরই জাপানীরা খোঁজ করল কতজন ব্রিটিশার ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সহরে আছে। সবাইকে ধরে এনে রস্‌ দ্বীপে বন্দী করে রাখল। এরপর জাপানীদের প্রধান কাজ হল সহরে যত গাড়ী আছে, যত বন্দুক আছে সব বাজেয়াপ্ত করা। প্রাথমিক কাজগুলি শেষ হলে তারপর ম্যাপ দেখে দেখে বার করল কোথায় পাওয়ার হাউস আছে, কোথায় স-মিল আছে, কোথায় ওয়াটার ট্যাঙ্ক আছে ইত্যাদি। জাপানীরা স্থানীয় লোকেদের অনুরোধ করল তাদের সর্বরকমে সাহায্য করতে। বেশীর ভাগ লোকই স্বীকার করল না, কিন্তু সেটা বাইরে প্রকাশ করল না। তবে মীরজাফরের দল তো সব দেশেই আছে, এখানেও সেরকম লোকের অভাব হল না। নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় অনেকে জাপানীদের সর্বপ্রকার সাহায্য

করতে উঠে পড়ে লাগল। বিশেষ করে ব্যক্তিগত জীবনে যাদের সঙ্গে বিরোধ আছে, তাদের বিরুদ্ধে সত্যিমিথ্যে লাগিয়ে জাপানীদের কাছে তাদের শত্রু করে তুলল।

পোর্টব্লেয়ারে একসঙ্গে প্রায় কুড়ি হাজার জাপানী সৈন্য এসেছিল। জাপানীদের সব চেয়ে আক্রোশ ছিল ব্রিটিশদের ওপর। যতজন ইয়োরোপীয় অফিসার তখন এখানে ছিলেন, তাদের সবাইকে, এমন কি চীফ কমিশনারকে দিয়েও জাপানীরা রাস্তা ঘাট ঝাঁট দেওয়া, নালা পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজ করিয়েছে। প্রথম দিকে পোর্টব্লেয়ারের লোকেদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার বেশ ভাল ছিল। আমি দুর্গাপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "জাপানী দখলে যখন পোর্টব্লেয়ার চলে গেল, তখন আপনাদের কেমন লাগল?" দুর্গাপ্রসাদ বলেছিল, "আমরা প্রথমে কোন পরিবর্তন বুঝতেই পারিনি। জাপানীরা আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করত, খোলাখুলি ভাবে মিশত, আমাদের বাড়ীতে খানাপিনা করত, ভাঙ্গা ইংরেজীতে হাসি ঠাট্টা করত, তাই আমাদের তাদের বেশ ভালই লাগত।"

আমি বললাম, "তবে বিগড়ালো কখন?"

দুর্গাপ্রসাদ বল্‌ল, "যখন থেকে আমাদের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করতে লাগল। প্রথম ছ'মাস খুব শান্তি ছিল। জাপানীরা এক 'পীস্‌ কমিটী' তৈরী করেছিল স্থানীয় লোকেদের নিয়ে। আমাদের তারা বোঝাল, এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য। অন্য দেশের লোকের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তোমরা আমরা এক। আমরা সবাই স্বাধীন, আমরা তোমাদের বন্ধু। এখানে তোমরা Indian Independence League স্থাপন কর। তোমাদের নেতাজীই আমাদের পাঠিয়েছেন। আমাদের ওপর তোমরা ভরসা রাখো ইত্যাদি। সকলেই মহাখুশী। জাপানীরা যা বলে তাই করে। এর কিছুদিন পরেই জাপানীদের সন্দেহ হল আমরা গুপ্তচর, আর তখন থেকেই সুরু হল নির্যাতন। জাপানীরা প্রথম এসেই আন্দামানের জঙ্গল চষে ফেলেছিল সেখানে

কোন ব্রিটিশ সৈন্য বা গুপ্তচর লুকিয়ে আছে কিনা দেখবার জন্য। যখন দেখা গেল কোথাও কেউ নেই, তখন নিশ্চিন্ত মনে অন্য দিকে মন দিল।”

পোর্টব্লেয়ার কতটুকু জায়গা, কিবা তার সামর্থ্য। কুড়ি হাজার সৈন্যকে খেতে দেবার ক্ষমতা তার ছিল না। অগত্যা জাপানীরা বাইরে থেকে জাহাজে করে রেশন আনবার বন্দোবস্ত করল। রেশন ভর্তি জাপানী জাহাজ রস্‌দ্বীপের-কাছাকাছি পৌঁছাতেই ব্রিটিশ সাবমেরিন সেগুলি ডুবিয়ে দিতে লাগল, নয়ত প্লেন এসে বম্বিং করে যেতে লাগল। জাপানীরা দারুণ অসুবিধায় পড়ল। তারা বুঝতে পারল এখান থেকে কেউ তাদের সব খবরাখবর ইংরেজদের পাঠাচ্ছে!

জাপানীরা পোর্টব্লেয়ারে এসেই জেলের সব কয়েদীদের ছেড়ে দিল, খুব সম্ভব তাদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব এড়াবার জন্য। কয়েদীরা ছাড়া পেয়েই সুরু করল লুটপাট। বহুদিন পর ছাড়া পেয়ে গ্রামে গ্রামে মেয়েছেলের জন্য হানা দিতে লাগল। বেশীদিন অবশ্য কয়েদীদের এরকম উচ্ছৃঙ্খলতা চলতে পারল না, চুরির অপরাধে জাপানীরা বড় কঠিন শাস্তি দিতে লাগল।

দিনে দিনে সহরের খাদ্যদ্রব্য যা ছিল ফুরিয়ে এল। এই কুড়ি হাজার সৈন্যকে কি খেতে দেওয়া যায়? কোন উপায় না দেখে এবার জাপানীরা জোর করে সহরের লোকদের কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য আদায় করতে লাগল। তারপর যখন কিছুই আর পাওয়া যায়না তখন বাড়ী চড়াও হয়ে গরু-মোষ, হাঁস-মুরগী, গাধা-ঘোড়া, পাঁঠা-ছাগল সব জোর করে নিয়ে যেতে লাগল। যেই বাধা দিল, সঙ্গে সঙ্গে হয় তাকে গুলি করে মারল, নয় তাদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের হাতীগুলো ধরে ধরে খেতে লাগল।

স্থানীয় বহুলোকের কাছে আমরা জাপানী অত্যাচারের কথা শুনেছি। তাদের মধ্যে ভগবান সিং, লছমন সিং, রামাকৃষ্ণ এবং

দুর্গাপ্রসাদের কাছেই আমার বেশীর ভাগ জাপানী রাজত্বের গল্প শোনা।

যতজন এক্স-কনভিক্ট বা তাদের বংশধরের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছে সকলেই দেখেছি বেশ অবস্থাপন্ন লোক। জমিজমা, ক্ষেতি বাড়ী, হাঁস মুরগী, গরু ছাগল নিয়ে সবাই বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। সম্পত্তি বলতে টাকা পয়সা যত-না লোকের আছে, বাগান ভরা তরি তরকারী, গোলা ভর্তি ধান এবং গোয়াল ভর্তি গরু-মোষ সকলেরই আছে। প্রথম দিকে জাপানীরা এই সব গৃহস্থ লোক্যাল লোকেদের বাড়ী থেকে গরুবাছুর জোর করে ধরে আনত। সহরের যা খাবার জিনিস সব চলে যায় জাপানী সৈন্যের পেটে। লোকেরা কেউ এক বেলা, কেউ আধ বেলা খেয়ে দিন কাটাতে লাগল। মুখ খোলবার উপায় নেই কারুর। তা হলেই গুলি চালাবে। এর কিছুদিন পরই সুরু হল জাপানীদের অমানুষিক অত্যাচার।

পোর্টব্লেয়ার থেকে জাপানীদের প্রতিটি কার্যকলাপের কথা কারা যেন বেতারে বাইরে পাঠাচ্ছিল। জাপানীরা গুপ্তচর সন্দেহে সহরের যত ইংরেজী জানা লোকেদের গ্রেপ্তার করে জেলে ভরতে লাগল। তবুও চলতে লাগল নিয়ম করে দৈনিক খবর পাঠানো।

সত্যি সত্যি গভীর জঙ্গলের মধ্যে দুই তিনটি লোক বেতার যন্ত্র নিয়ে লুকিয়ে বসে থাকত এবং তাদের সহযোগীদের কাছ থেকে সহরের যা যা খবর পেত সব বেতারে বাইরে পাঠাত। তারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি।

পোর্টব্লেয়ারে বসে জাপানীরা শুনছে প্রতিদিন তাদের কথা কারা যেন বাইরে পাঠায়। কে খবর পাঠায়? কোথা থেকে পাঠায়? সন্দেহে সন্দেহে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। যাকেই সন্দেহ হয় গুপ্তচর বলে তাকেই গুলি করে মারে। কুকুর বিড়ালের মত পিটিয়ে, গুলি করে, জলে ডুবিয়ে কতরকমে যে মানুষ মেরেছে জাপানীরা তার ঠিক নেই।

দুর্গাপ্রসাদকে যখন জাপানীরা তাদের সাহায্য করতে বলল, সহরের সব গোপন কথা বলতে বলল, গুপ্তচরদের নাম করতে বলল, দুর্গাপ্রসাদ তখন কোনটাতেই রাজী হল না আর তখন থেকেই সে জাপানীদের বিষনজরে পড়ল। সুযোগ বুঝে অনেকে এই সময় দুর্গাপ্রসাদকে ইংরেজের চর বলে জানাল। আগে থেকেই রাগ ছিল, এখন আর দ্বিধা না করে, জাপানীরা দুর্গাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করল। দুই হাত বেঁধে দুইদিকে আটকে রেখে কাগজ পাকিয়ে গোল করে তাতে আগুন ধরিয়ে দুর্গাপ্রসাদের শরীরের বহু জায়গায় পুড়িয়ে দেয় জাপানীরা। বহু লোককে নখের মধ্যে ছুঁচ ফুটিয়ে দেয় এবং মাথায় ব্যাটারী চার্জ করে। অনেকে মাথায় ব্যাটারী চার্জ করায় পাগল হয়ে যায়। অসহ্য যন্ত্রণায় অনেকে মিথ্যে করেই বলে তারা শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। দুর্গাপ্রসাদ গল্প করছিল, "আমি যদি কোনদিন ক্ষমতা পাই তবে পৃথিবী থেকে জাপানীদের নিশ্চিহ্ন করে দেব। এরকম নিষ্ঠুর অত্যাচারী জাত পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ। তবু আমি স্বীকার করছি জাপানীদের যে তিনটি গুণ আমি দেখেছি তার তুলনা হয় না। এক—ডিসিপ্লিন; দুই—কর্মক্ষমতা; তিন—স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষা।

ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে জাপানীরা ছিল অত্যন্ত কড়া। সামান্য অপরাধে শাস্তি দিত অতি কঠিন। পরিশ্রম করতে পারত তারা অসম্ভব রকমের। উচ্চতম অফিসার থেকে সুরু করে নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই আসুরিক পরিশ্রম করত এবং সঙ্গে সঙ্গে লোক্যাল লোকেদেরও খাটিয়ে মারত।

জাপানীদের তরফ থেকে একজন সিভিল গভর্ণর ছিল এখানে, সেই ছিল সর্বেসর্বা। তাকে জাপানী ভাষায় বলত মিন-সি-বুচো।

সাধারণতঃ যখন কোন দেশ বিদেশী সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হয়, প্রথমেই বিজয়ী সৈন্যরা সুরু করে নানারকম অত্যাচার। বিশেষ করে মেয়েদের ওপর থাকে তাদের দারুণ লোভ। আন্দামানে

জাপানী সৈন্যরা মেয়েদের ওপর বিশেষ অত্যাচার করেনি শুনে খুব অবাক হয়েছিলাম, কি করে জাপানীরা এরকম ব্যতিক্রম হল ? অনেকদিন পর একজন নেভাল অফিসার গল্প করেছিলেন যে, তিনি রি-অকুপেশনের সময় আন্দামানে এসেছিলেন। তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আচ্ছা জাপানীরা এখানে মেয়েদের ওপর নাকি সেরকম কোন অত্যাচার করেনি, এটা কি সত্যি ? ওরা কি এতই ভদ্র ?" অফিসারটি জবাব দিয়েছিলেন, "জাপানীরা বর্মা, মালয়, সিঙ্গাপুরে মেয়েদের ওপর যা অত্যাচার করেছে তার তুলনা হয় না, তবে আন্দামানে সেরকম অত্যাচার সত্যিই করেনি, কারণ এটা নেতাজীর দেশ তাই।"

ডাক্তার দেওয়ান সিং ছিলেন পোর্টব্লেয়ারের সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার। জাতিতে শিখ। মানুষটি ছিলেন অতি চমৎকার। মধ্য ভারতের ভাঁতুরা ছিল অত্যন্ত নীচ জাতের হিন্দু। এখানকার মুসলমানরা চাইছিল তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে। ডাঃ দেওয়ান সিং তাদের এই প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়াতে, মুসলমানরা জাপানীদের কাছে নালিশ করে দেওয়ান সিং একজন গুপ্তচর।

মিন-সি-বুচোর আদেশে দেওয়ান সিং এবং তাঁর সঙ্গে আরও চল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হল। তারপর চলল তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন। হয় স্বীকার করো তুমি গুপ্তচর, নয় গুলিতে মর। এই ভাবে চলতে লাগল দিনের পর দিন। অনেকে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে জেলের মধ্যে ফাঁসী দিয়ে আত্মহত্যা করল। সেলুলার জেলের সেলগুলি নির্দোষ মানুষে ভর্তি হয়ে গেল। শুধু ছেলেরাই নয়, মেয়েদেরও এরা গ্রেপ্তার করে জেলে পুরতে লাগল। জাপানী অত্যাচারের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ছ্যাকা দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া।

দেওয়ান সিং শেষ পর্যন্ত নিজের জিদ বজায় রাখলেন, কিছুতেই স্বীকার করলেন না যে তিনি গুপ্তচর। কিন্তু তাঁর সঙ্গীরা বেশীর

ভাগই ভয়ে মিথ্যে করে স্বীকার করল। জেলখানার মধ্যে পিটিয়ে ডাঃ দেওয়ান সিংকে জাপানীরা মেরে ফেলল, পরে বাকী দলটিকে গুলি করে মারল।

পুলিশ সাহেব মিঃ ম্যাকার্থী, যিনি জাপানীদের ভয়ে আগেই পালিয়েছিলেন, এবার এলেন সাবমেরিন নিয়ে গুপ্তচরের কাজে। সঙ্গে ছিল ফরেস্টের কয়েকজন মজুর। শোল বে-তে মিঃ ম্যাকার্থী কুলিদের নামিয়ে দিতেন, তারা সারাদিন সহরে ঘুরে খোঁজখবর নিয়ে সন্ধ্যাবেলা শোল বে-তে ফিরে যেত।

দিন দিন পোর্টব্লেয়ারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ছে। সহরে খাবার দাবার নেই, ওষুধপত্র নেই। সকলকে পরিশ্রম করতে হচ্ছে প্রচুর, কিন্তু পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না। জাপানীরা পাহাড় কেটে কেটে মিষ্টি আলু এবং টেপিওকার চাষ আরম্ভ করল। দিনের পর দিন জাপানী সৈন্যরা মিষ্টি আলু সিদ্ধ খেয়ে দিন কাটিয়েছে। এই ভাবে কিছুদিন কাটবার পর জাপানীরা ঠিক করল সহরের লোকসংখ্যা কমাতে হবে, তা না হলে খাদ্য সমস্যা দূর হবে না। কর্মঠ লোকদের বাদ দিয়ে অশক্ত, বৃদ্ধ, পীড়িত মানুষগুলিকে জাহাজ ভরে নিয়ে গিয়ে মাঝসমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে লাগল। সাঁতার কেটে কেউ পালাতে গেলে মেশিনগান চালাতে লাগল। সহরে হাহাকার পড়ে গেল। এবার কার পালা এই চিন্তায় সকলে পাগল হয়ে উঠল।

এই রকম যখন পোর্টব্লেয়ারের অবস্থা সেই সময় অর্থাৎ ১৯৪৩ সনের ডিসেম্বর মাসে নেতাজী সুভাষ বোস এলেন এখানে। চার্টার্ড প্লেনে করে এসে নামলেন এয়ার পোর্টে। সহরের সমস্ত লোক গিয়ে জড়ো হল সেখানে। জাপানী সিভিল গভর্ণর রাজকীয় সম্মানে নেতাজীকে অভ্যর্থনা জানালেন। সহরের সমস্ত গণ্যমান্য লোকেদের ডাকা হয়েছিল আগেই। কিছুদিন ধরেই সহরে আতঙ্কে মৃতপ্রায় হয়ে সকলে দিন কাটাচ্ছিল। অনেক আশা নিয়ে সকলে গেল নিজেদের দুঃখের কথা জানাতে। বাঙ্গালী যাঁরা ছিলেন তাঁরা

ভাবলেন বাংলায় একটু সুখ দুঃখের কথা বলবেন। কিন্তু জাপানীরা সেটা আগেই আন্দাজ করে সর্বক্ষণ নেতাজীকে ঘিরে রইল।

মিন-সি-বুচো নেতাজীকে নিয়ে তুলল রস্ দ্বীপের গভর্ণমেণ্ট হাউসে, পরম সম্মানে এবং পরম সমাদরে। পোর্টব্লেয়ারের জনতা তাঁর নাগাল পেল না। সেলুলার জেলে নেতাজী যখন গেলেন, তার আগেই বন্দীদের সব সরিয়ে ফেলা হল, ফলে সহরের লোকেরা জাপানীদের হাতে কিভাবে নির্যাতিত হচ্ছিল, নেতাজী তা জানতে পারলেন না।

পরদিন জিমখানা গ্রাউণ্ডে বিপুল জনতার সামনে নেতাজী হিন্দীতে ভাষণ দিলেন প্রায় এক ঘণ্টা ধরে। এখানেও তিনি বললেন, "তুম মুঝে খুঁন দে দো, হাম তুমে আজাদী দুংগা।" প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে জিমখানা গ্রাউণ্ডে নেতাজী সুভাষ বোস সর্বপ্রথম স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন।

এখানকার লোকেরা বলে, জাপানীদের ব্যূহ ভেদ করে এক সময়ে গভর্ণমেণ্ট হাউসের বয় বাবুর্চিরা পোর্টব্লেয়ারের অবস্থা সম্বন্ধে নেতাজীকে একটা আভাস দিয়েছিল। নেতাজী কি বুঝেছিলেন জানি না, কিন্তু তিনি সিঙ্গাপুরে ফিরে গিয়ে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে কর্ণেল লোকনাথন্‌কে পাঠিয়ে দিলেন জাপানীদের হাত থেকে আন্দামানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। জাপানীরা তাতে রাজী হল.না। সামান্য একটা কাজ কর্ণেল লোকনাথন্‌কে দিয়ে নিজেরাই শাসন-কার্য চালাতে লাগল। কর্ণেলের চোখের ওপর কত অত্যাচার হল নির্দোষ মানুষের ওপর, তিনি শুধু নিরুপায় হয়ে তা দেখলেন। মাস ছয় পরে কর্ণেল লোকনাথন্ ফিরে গেলেন।

এদিকে যুদ্ধের চাকা ঘুরে গিয়েছে। হিরোসিমা এবং নাগাশাকির পতন হয়েছে। জাপান থেকে পোর্টব্লেয়ারে খবর এল, "আমাদের পরাজয় হয়েছে, তোমরা এবার তল্পিতল্পা গুটাও।" জাপান-সম্রাটের এক আত্মীয় চাটার্ড প্লেনে করে পোর্টব্লেয়ারে এলেন এবং এক রাত্রি থেকে ফিরে গেলেন। পরদিন অর্থাৎ ২০শে আগস্ট এক বিরাট মিটিংএ

মিন-সি-বুচো বললেন, "লড়াই থেমে গিয়েছে, আমাদের সন্ধি হয়েছে। আমরা এবার চলে যাব এবং ইংরেজরা আবার এ দ্বীপের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।"

কিছুদিন পর এক mercy ship এল প্রচুর রেশন এবং ওষুধ-পত্তর নিয়ে। সেই জাহাজে এলেন পোর্টব্লেয়ারের প্রাক্তন ফরেস্ট অফিসার মিঃ ফস্টার। সারা সহরে ঘুরে ঘুরে তিনি সকলকে রেশন দিলেন, অসুস্থদের ওষুধ-পত্তর দিলেন।

এর কয়েকদিন পর 'সাউথ ঈস্ট এশিয়াটিক কমাণ্ড'-এর তরফ থেকে 'এস. এস. দিলওয়ারা' জাহাজ কয়েক হাজার সৈন্য ও পাঁচশ' সিভিলিয়ান নিয়ে এল আন্দামান পুনরধিকার করতে। ব্রিগেডিয়ার সলোমন মিন-সি-বুচোকে জাহাজে ডেকে পাঠালেন। সৈন্যসংখ্যা এবং অস্ত্র-শস্ত্রের একটা হিসাব তার কাছে চাওয়া হল। সেই সঙ্গে সমস্ত জাপানী সৈন্যদের সরিয়ে সহরের বাইরে গ্যারাচার্মা গ্রামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হল। পরদিন সহরে ব্রিটিশ সৈন্য জাহাজ থেকে পোর্টব্লেয়ারের মাটিতে পদার্পণ করল। ১৯৪৫ সনের ৯ই অক্টোবর জিমখানা গ্রাউণ্ডে ব্রিগেডিয়ার সলোমনের কাছে জাপানী সিভিল গভর্ণর যথাবিধি ফারমান সই করে আত্মসমর্পণ করল।

কিছুদিন পর্যন্ত জাপানী সৈন্যরা গ্যারাচার্মা ছিল, পরে তাদের সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

সিঙ্গাপুরে এরপর ট্রিবিউন্যাল বসে এবং পোর্টব্লেয়ার থেকে প্রায় সত্তর জন লোককে সেখানে সাক্ষী দেবার জন্য নিয়ে যায়। বিচারে জাপানী অফিসারদের শাস্তি দেওয়া হয়।

আন্দামানে জাপানী রাজত্বের মজা ছিল এই যে, আজ যাকে মাথায় তুলছে, কাল তাকে মাটিতে ফেলছে; আজ যাকে চীফ কমিশনার বানাল, কাল তাকে গুলি করে মারল; আজ যাকে বন্দী করল, কাল তাকে ছেড়ে দিল।

এখানে এখনও লোকে জাপানী অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে

শিউরে ওঠে। তিন বছরে আন্দামানের প্রায় শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন লোকই মারা গিয়েছিল।

জাপানী রাজত্বের সম্বন্ধে কোন লিখিত কাগজপত্র নেই বা কোন ডকুমেন্টস্ খুঁজে পাওয়া যায়নি। জাপানীরা যাবার আগে সব কাগজপত্র পুড়িয়ে দিয়েছিল। আমি স্থানীয় বিশিষ্ট লোকদের কাছ থেকে যা শুনেছি তাই থেকেই জাপানী রাজত্বের একটা মোটামুটি চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছি। এই সব স্থানীয় লোকেরা জাপানী আমলে অনেকেই বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৪৫ সনে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পুনরধিকার করেন। এই সময় যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ তুলে নেওয়া হল। বহু কয়েদীকে সরকারী খরচে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল। শতবর্ষব্যাপী কলঙ্কের একটা অধ্যায় এতদিনে শেষ হয়ে কালাপানির ভয়াবহতা অনেকাংশে দূর হল। পেনাল সেট্‌ল্‌মেণ্ট বলে আন্দামানের কুখ্যাতি দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে নূতন যুগের সূচনা হল। নানা ভাবে এই দ্বীপপুঞ্জের উন্নতির জন্য সরকারের নজর পড়ল। নিত্য নূতন পরিকল্পনা করা হচ্ছে ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য। কয়েদী উপনিবেশের স্মারক হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকবে শুধু সেলুলার জেল।

এশিয়া সম্মেলনে জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজো আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজাদহিন্দ সরকারকে দান করেন। নেতাজী তখন এই দুই দ্বীপের নূতন করে নামকরণ করেন 'শহীদ দ্বীপ' ও 'স্বরাজ দ্বীপ'। রি-অকুপেশনের পর আন্দামানকে 'সুভাষ দ্বীপ' বলে চালাবার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে গিয়েছে। স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা নেতাজী সুভাষ বোস প্রথম উত্তোলন করেন এই আন্দামানের মাটিতে। কাজেই 'সুভাষ দ্বীপ' নামে এই দ্বীপটি পরিচিত হলে আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় হত।

আন্দামানের দু'শ চারটি দ্বীপের মধ্যে মাত্র ২৫-২৬টি দ্বীপে মানুষের বসতি আছে, বাকী দ্বীপগুলি এখনও 'নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড' হয়ে পড়ে রয়েছে।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্টব্লেয়ার রীতিমত আধুনিক সহর। বিজলী বাতি, পাকা রাস্তা, হাই স্কুল, রেডিও স্টেশন, স্টেটব্যাঙ্ক, ট্যুরিস্ট হোম, সিনেমা হাউস, হোটেল, রেস্টুর্যান্ট, হাসপাতাল সবই আছে।

আন্দামানে চিকিৎসার দিক দিয়ে খুব সুবিধা। বড় হাসপাতাল, ভাল ডাক্তার তো আছেই, সবচেয়ে বড় কথা, 'ফ্রি মেডিকেল ট্রিটমেণ্ট'। পোর্টব্লেয়ারে বেশ বড় এবং সুন্দর একটি হাসপাতাল আছে। সিনিয়র মেডিকেল অফিসার একজন এফ. আর. সি. এস. ডাক্তার।

একে তো বিনা পয়সায় চিকিৎসা, তার ওপর ছোট জায়গা। কাজেই ডাক্তারদের মেজাজ বুঝে রোগীদের চলতে হয়। কখন কোন্ ডাক্তার কোন্ মেজাজে থাকেন হিসেব করে নিয়ে তবে রোগীরা ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। যেহেতু ডাক্তাররা বিনা দর্শনীতে চিকিৎসা করেন সেই হেতু তাঁদের বেশ খোসামোদ করে চলতে হয় এবং মাঝে মাঝে তাঁদের বাক্যবাণও শুনতে হয়। পোর্টব্লেয়ারে কোন প্রাইভেট ডাক্তার নেই। অনেক সময় কিন্তু এই প্রাইভেট ডাক্তারের অভাবটা আন্দামানের বাসিন্দারা বড় বেশী করে উপলব্ধি করেন। কোন রোগীর বাড়ীতে ডাক্তাররা যান না, কাজেই অসুস্থ ছেলেমেয়ে নিয়ে সবাইকে হাসপাতালেই দৌড়াতে হয়।

এতদিন পর্যন্ত সেলুলার জেলের সামনে একটি ব্যারাকে সরকারী হাসপাতাল ছিল। সেলুলার জেলের একটি উইংগ ভেঙ্গে বিরাট বড় (আধুনিক যন্ত্রপাতি সমেত) একটি হাসপাতাল তৈরী হয়েছে। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী হাসপাতালটির উদ্বোধন করেন। নামকরণ হয় 'পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ হাসপাতাল।'

বেশ বড় একটি টি. বি. হাসপাতাল আছে সরকারী হাসপাতালের সামনেই। পোর্টব্লেয়ার ছাড়া লং আয়ল্যাণ্ড, মায়াবন্দর, রঙ্গত, ডিগলিপুর এবং নিকোবরেও বেশ ভাল হাসপাতাল আছে। আর ছোট ছোট দ্বীপে আছে ডিসপেন্সারী। এ ছাড়া গ্রামে ঘুরে বেড়াবার জন্য 'ট্রাভেলিং ডিসপেন্সারী'ও আছে।

কলম্বো প্ল্যানে অস্ট্রেলিয়া আন্দামান সরকারকে একটি 'মেডিকেল বোট' উপহার দেয়, নাম 'Ind Aus'. ইণ্ডাস বোটটি অপারেশনের যন্ত্রপাতি, অপারেশন থিয়েটার এবং কয়েকটি বেডশুদ্ধ একটি ছোটখাট হাসপাতালের মত। দূর দূরান্তের দ্বীপগুলিতে যেখানে হাসপাতাল বা ডাক্তারের অভাব, সে সব দ্বীপে পোর্টব্লেয়ার থেকে ডাক্তারেরা ইণ্ডাসে করে গিয়ে চিকিৎসা করে আসেন। প্রয়োজন হলে অপারেশনও করেন।

ওষুধপত্র পাওয়া যায় হাসপাতাল থেকে বিনা পয়সায়। এদিক দিয়ে আন্দামানের লোকেরা সব দিক দিয়ে সুখী। ডাক্তারের ফি লাগে না, ওষুধের দাম লাগে না, হাসপাতালে থাকতে পয়সা লাগে না এবং অস্ত্র চিকিৎসারও কোন খরচ লাগে না।

যা বলছিলাম। পোর্টব্লেয়ার সত্যিই একটি আধুনিক সহর। অল্পদিনের জন্য পোর্টব্লেয়ারে এলে চমৎকার লাগে। অনেকে যাঁরা প্লেনে করে এসে সাতদিনের জন্য পোর্টব্লেয়ার ঘুরে যান তাঁরা বলেন, আন্দামান স্বর্গের থেকেও সুন্দর, খুবই সুন্দর আন্দামান। এত সুন্দর একটা জায়গা আমাদের এত কাছে আছে অনেকে তা ভাবতেও পারেন না।

সৌন্দর্য আছে ঠিকই তবে কতদিন আর প্রকৃতির শোভা দেখে মন ভরে? বেশীদিন এখানে থাকতে হলে ক্লান্তি এসে যায়। সেই একই লোকজন, সেই একই কথাবার্তা দিনের পর দিন। ভাল কোন সিনেমা ছবিও আসে না। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন রি-অকুপেশনের সময় আন্দামানে এসেছিলেন, তাঁর নামে এখানকার সিনেমা হলটির

নাম হয়েছে 'মাউন্টব্যাটেন টকীজ'। এই একটিই সিনেমা হল পোর্টব্লেয়ারে। বেশীর ভাগ সেখানে হাণ্টারওয়ালী, সাইকেলওয়ালী জাতীয় বই দেখান হয়। ক্লাব অবশ্য আছে কয়েকটি। বাঙ্গালীদের 'অতুল স্মৃতি সমিতি', তামিলদের 'তামজির সজ্ঘম্', তেলেগুদের 'অন্ধ্র এসোসিয়েশন', মালয়ালীজদের 'কেরালা সমাজম্' ছাড়া আর আছে 'হিন্দী কলা সহিত্য পরিষদ' এবং অফিসারদের 'আন্দামান ক্লাব'। মাঝে মাঝে এইসব ক্লাবথেকে গান বাজনা এবং নাটকাদির অভিনয় করা হয়।

তবে এখানকার একঘেয়ে জীবনেও মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য আসে। যেমন কোন সিনেমা কোম্পানী এল, সারা সহরে হৈ চৈ পড়ে গেল। নাই-বা থাকল তাদের সঙ্গে নায়ক বা নায়িকা। নেভি ফ্লীট এল, সারা সহর সরগরম হয়ে উঠল। দিল্লী থেকে ভি. আই. পি.-রা এলেন, চলল কিছুদিন গরম গরম খবরের আদান প্রদান। প্লেন সার্ভিসের সময় তো কথাই নেই, দিনগুলি কোথা দিয়ে যে কেটে যায় টেরই পাওয়া যায় না।

প্লেন সার্ভিস যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন জাহাজ ভরসা। আন্দামানের যানবাহনের মধ্যে জলযানই প্রধান। মেনল্যাণ্ড থেকে আসতে হলে জাহাজ, আবার এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যেতে হলেও মোটর বোট বা স্টীমার। এখানকার শিশুরা জন্ম থেকেই চেনে, 'আন্দামান', 'নিকোবর', 'চলুঙ্গা', 'মোতি', 'কিসমত' বা 'সাগর দুলাল'। তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে বড় হয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন হবার।

মেরিন ডিপার্টমেন্টে জাহাজ মেরামতির একটি কারখানা এবং ছোট একটি ড্রাই ডক আছে। ছোট বড় মোটর বোটও তৈরী হয় এখানকার কারখানায়। 'চলুঙ্গা' নামে একটি ফেরি বোট প্রতি সপ্তাহে পোর্টব্লেয়ার থেকে রওনা হয়ে সব দ্বীপ ঘুরে ফিরে আসে। বেশ বড় একটি স্টীমারের মত দেখতে চলুঙ্গা। প্রায় দু'শ লোক যাতায়াত করতে পারে। সম্প্রতি 'ইয়ারোয়া' নামে আর একটি 'ইন্টার-আয়ল্যাণ্ড' ফেরী বোট মেনল্যাণ্ড থেকে এসেছে। আন্দামান

ছাড়া নিকোবরের দ্বীপগুলিতেও ইয়ারোয়া যাতায়াত করে। এ ছাড়া পুলিশ বিভাগের দুটি সবচেয়ে দ্রুতগামী পেট্রোল বোট আছে, 'জহর' এবং 'সুভাষ'।

যে দুটি জাহাজ মাদ্রাজ ও কলকাতা থেকে যাতায়াত করে তাদের নাম এম. ভি. আন্দামান এবং এম. ভি. নিকোবর। এই জাহাজদুটি একবার কলকাতা গেলে আর নড়তে চায় না। তাদের যত রকমের ব্যাধি দেখা দেয় কলকাতা গেলেই। তার উপর আছে মাল লোডিং এবং আনলোডিং-এর ব্যাপার। একেবারে অনিশ্চিত। লোডিং যাও-বা হল তো হুগলী নদীতে জল নেই। এই ভাবে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে জাহাজ যখন রওনা দেয় তখন সকলে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

আন্দামানে আসতে হলে ঝামেলা পোহাতে হয় নানারকমের। জাহাজে প্যাসেজ পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। যাত্রী অনুপাতে প্যাসেজ কম। তাই সরকারী লোক ছাড়া বেসরকারী লোকেরা প্যাসেজ প্রায় পায়ই না। আন্দামানের লোকেদের যাতায়াত সমস্যা দূর হবে আরও কয়েকটি জাহাজ এলে। কবে সেদিন আসছে জানি না। স্কুল কলেজ ছুটি হলে ছেলেমেয়েরা মেনল্যাণ্ড থেকে আসতে পারে না। আর যদি এসে পড়ল তবে ফিরে যাবার জাহাজ থাকে না। তখন কলকাতার ছাত্রছাত্রীদের মাদ্রাজ হয়ে এবং মাদ্রাজের ছাত্রছাত্রীদের কলকাতা হয়ে স্কুল কলেজে ফিরে যেতে হয়।

আন্দামান পুনরধিকার করার পর যে সব কয়েদী জমিজমা নিয়ে বাস করছিল তাদের অনেকেই দেশে ফিরে গেল। এই জমিজমা যাতে নষ্ট না হয় এই সদিচ্ছায় ভারতসরকার পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের বিশেষ করে চাষীশ্রেণীর লোকেদের এখানে পুনর্বাসনের প্রস্তাব করলেন। দ্বীপান্তরের দেশ কোথায় সেই আন্দামান? প্রথম দিকটায় আপত্তি করলেও শেষে দলে দলে উদ্বাস্তু আন্দামানে আসতে লাগল।

আজ পর্যন্ত প্রায় ষোল হাজার উদ্বাস্তু নরনারী আন্দামানে এসেছে। উত্তর আন্দামান, মধ্য আন্দামান এবং দক্ষিণ আন্দামান জুড়ে চলেছে উপনিবেশ গঠনের কাজ। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা এখানে সেটলার (settler) নামে পরিচিত। প্রথমদিকে পোর্টব্লেয়ারের আশে পাশে তাদের জমি দেওয়া হয়েছিল, পরে আর জমি জমা না থাকায় দূরে দূরে হ্যাভলক দ্বীপে, মধ্য আন্দামানে ও উত্তর আন্দামানে জমি দেওয়া হয়েছে। এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন আর এক অধ্যায়।

ভারতবর্ষের মানুষ বর্মা, সুমাত্রা, মালয়, জাভা, বালি এমন কি সুদূর আফ্রিকাতে গিয়েও বসতি স্থাপন করেছে যুগ যুগান্ত থেকে। আজ এতদিন পর ভারতবর্ষেরই একদল লোক যাদের একমাত্র পরিচয় উদ্বাস্তু বলে, তারা এল আন্দামানে বসতি স্থাপন করতে। পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলি থেকে একবার ছিন্নমূল হয়ে এসে পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গে, আবার সেখান থেকে ছিন্নমূল হয়ে এসে পড়ল আন্দামানের জঙ্গলে। এলো এরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে। টাকা নেই, পয়সা নেই, সহায়-সম্বল, আত্মীয়-স্বজন কিছুই নেই। অজানা অচেনা জায়গায় শুধু ভাগ্যের ওপর ভরসা করে নূতন করে বাঁচবার আশায় এতদূরে সাগর পারে তারা এসে পড়ল।

শ্রীবিনয়কুমার চক্রবর্তী দেশে থাকতে ছিলেন একজন শিক্ষাব্রতী, আন্দামানে এসে হয়েছেন এখানকার সেট্‌লার। এসেছিলেন ১৯৪৯ সনে প্রথম দলের সঙ্গে। তাঁর কাছেই আমি সে সময়কার একটা বিশদ বিবরণ পেয়েছি।

১৯৪৯ সনের এক দোলপূর্ণিমা। আকাশ আর সমুদ্র শুভ্র জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে আর সেই আলোর সাগর মন্থন করে চলেছে 'মহারাজা' জাহাজ। এই সেই জাহাজ, যার ডেকভর্তি ছিল লোহার শিক দেওয়া বাঘের খাঁচার মত খোপ আর সেই খোপে ভর্তি হয়ে আসত, বর্মা ও সিংহল থেকে কয়েদীর দল।

সেদিনও মহারাজা জাহাজ সেই সব পিঞ্জর ভর্তি করে যে একশটি বাঙ্গালী পরিবারকে ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা রাজদ্রোহী না হলেও রাষ্ট্রনীতির বলি। তারা সবাই পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু, বঙ্গ বিভাগের ফলে বাস্তুহারা, নিঃস্ব এবং বিভ্রান্ত।

এরা সব এসেছে বরিশাল, কুমিল্লা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা থেকে। কেউ কিষাণ, কেউ কৈবর্ত, কেউ কুমোর, কেউ মধ্যবিত্ত বাবু। আবার নূতন করে ঘর বাঁধবার আশায়, নিজস্ব ভিটেমাটি, জমিজমার আশায় তারা চলেছে আন্দামানে, যেখানে যেতে পার হতে হয় সাড়ে সাতশ মাইল সাগর, যার সঙ্গে সকলেরই এই প্রথম পরিচয়।

ডেকের ওপর ফাল্গুনী পূর্ণিমা উপলক্ষে হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছিল। সকলে সেখানে জড়ো হয়েছিল, হরিনাম করে যদি মনের অশান্তি দূর করা যায় এই আশায়। সবাই মনে প্রাণে উপলব্ধি করছিল একটা অসীম ব্যাকুলতা। চারদিন পর জাহাজ যখন জেটিতে গিয়ে ভিড়ল, উদ্বাস্তুদের জন্য যে রাজকীয় অভ্যর্থনা অপেক্ষা করছিল তা স্বপ্নেরও অগোচর। জাহাজ থেকেই চোখে পড়েছিল দ্বীপগুলি, আপাদ মস্তক শ্যামল বনানী বেষ্টিত, উপকূলে নারিকেল বীথি। তাদের চোখে সবটাই যেন একটা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল।

উদ্বাস্তুদের সাময়িক বাসের জন্য হমফ্রেগঞ্জ, মংলুটন ও মানপুরে তিনটি ক্যাম্প তৈরী হয়েছিল। নামে যেমন অস্থায়ী কাজেও তেমনি। এখানকার জঙ্গলের বেতের মত একরকম গাছের পাতার ছাউনি, বাঁশের চাঁছারি দিয়ে বোনা বেড়া দিয়ে ঘেরা, কুড়ি বাই ত্রিশ ফুটের এক একটি চালাঘর। তার দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে একটি করে বাঁশের মাচা। খুব তাড়াতাড়ি তৈরী করার জন্য ঘরের মেঝে বড় বড় চাঙ্গড়া দিয়ে ভর্তি। এই রকম তিনটি থেকে সাতটি পর্যন্ত খোপ জুড়ে এক একটি ছাউনি। একটি খোপ একটি পরিবারের সংসার বা জগৎ।

বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্তরের রুচি, শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থা সম্পন্ন

অপূর্ব জনসমাবেশ। সবাই এসেছে সরকারী প্রচার বিভাগের রামধনু রংএর প্রভায় মুগ্ধ হয়ে। তাদের বলা হয়েছিল প্রায় একহাত লম্বা চিংড়ি মাছ, ফসলের ভারে অবনমিত বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত, আর সবার ওপরে বলা হয়েছিল দুগ্ধবতী গাই একটা, চাষের জন্য বলদ একজোড়া, ত্রিশ বিঘে পরিষ্কার জমি, ঘর বানাবার জন্য টিন ও নগদ টাকা, আর নয়মাস পর্যন্ত পরিবারের পোষ্য বিবেচনা করে ৬০৲ টাকা থেকে ১০০৲ টাকা মাসিক সাহায্য। এর সবগুলিই যেমন সত্যি, অনেকগুলি তেমনি মিথ্যে। মাছ যথেষ্ট পাওয়া গেলেও ছবিতে প্রচারিত আকারের মাছ দুষ্প্রাপ্য ও অখাদ্য। দ্বীপের বেশীর ভাগ জায়গাতেই জলকষ্ট। পুকুর, কূপ বা নলকূপ কিছুই তৈরী করা সম্ভব নয়। চাষের জমি সাত আট বছর অকর্ষিত পড়ে থাকার ফলে চোদ্দ পনের হাত লজ্জাবতীলতা, দশ বারো হাত বনতুলসী দিয়ে ভরা। সবার চেয়ে বড় কথা হল, এখানে চাষের জন্য মজুর বা কৃষাণের একান্ত অভাব, কারণ এখানে ভূমিহীন কৃষাণ নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের মত এখানে জমি কিনে মজুর, কৃষাণ বা ভাগচাষী দিয়ে চাষ করার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। বাজার বলতে একটি, পোর্ট-ব্লেয়ারে। কোন ফসলের রপ্তানি নেই, আছে শুধু আমদানি।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যে কয়ঘর উদ্বাস্তু পরিবার ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশ এসেই এমন আলোড়ন ও আন্দোলন সুরু করলেন, প্রতি পদে সরকারকে দোষী করে এমন ভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের সরকারী খরচে আবার কালাপানি পার করে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁরাতো গেলেনই, সঙ্গে নিয়ে গেলেন তাঁদের অনুগত এমন কতকগুলি লোককে যারা সত্যি সত্যি চাষী এবং এদেশের স্থায়ী অধিবাসী হবার উপযুক্ত। এর ফলে যারা রইল তারা বেশীর ভাগই হয় অচাষী নয়ত পশ্চিম বঙ্গে তাদের অবস্থার উন্নতি করার কোন সুবিধাই নেই। এরা বর্তমানের ক্যাশডোল, গরু মোষ এবং টিনের

ঘর পেয়ে নিজেদের পরম সৌভাগ্যবান মনে করে এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে রইল।

কিন্তু যে ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন আবহাওয়ায়, চেনা জগৎ ছেড়ে লোকগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে পড়ল এই সমুদ্রঘেরা অচেনা জগতে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তাদের বেশ বেগ পেতে হল। এ দেশের চেহারা আলাদা, মানুষ আলাদা, ভাষা আলাদা। কিসের ভরসায় তারা বুক বাঁধবে? কিন্তু উপায় কি? ধীরে ধীরে উদ্বাস্তুরা এখানকার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করল। সরকার থেকে যদিও জঙ্গল কেটে জমি পরিষ্কার করে দিয়েছিল তবুও এই পাহাড়ী অঞ্চলে পাথর ও অজস্র শিকড় ভরা জমি পরিষ্কার করে চাষবাসের উপযোগী করতে এদের প্রাণপণ পরিশ্রম করতে হল।

ঘর তৈরী করার উদ্দেশ্যে পরিবার পিছু আটাশ খানা চারফুট বাই দশ ফুট টিন সরকার থেকে দেওয়া হল। বণ্টনের সময় উদ্বাস্তুরাই প্রস্তাব করল, প্রত্যেক পরিবার একটি করে টিন ছেড়ে দেবে, যাতে তাই দিয়ে প্রত্যেক গ্রামে হয় মন্দির নয়ত ক্লাবঘর তৈরী হবে। সাময়িক ভাবে কর্তৃপক্ষের হেফাজতে প্রায় দু'শ টিন জমা দেওয়া হল। কিন্তু ১৭।১৮ বছর হয়ে গেল আজ পর্যন্ত সে সব গ্রামে মন্দির বা ক্লাবঘর হয়নি। এমন কি সে টিনের কোন খোঁজও নেই। কলসী, যাঁতা, শিল-নোড়া, কুলো-ধামা ইত্যাদি নানা জিনিস তাদের জন্য আনা হলেও কারুর ভাগ্যে জুটল না। মশারি, মাদুর, থালা, গেলাস নিলে দাম দিতে হবে জেনে অনেকেই নিতে সাহসী হল না।

পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের এখানকার জমি, ফসল কিংবা চাষ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় সরকারী কর্মচারীরা নানাভাবে তাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে জারোয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে, জলবিহীন ঊষর ভূখণ্ডে অনুর্বর গোচরগুলিতে অধিকার দেখিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করল। জমির পরিমাণও কম। প্রতিশ্রুত ত্রিশ বিঘা জমি খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটল। পাটোয়ারী দেখিয়ে দিল 'ওই গর্জন গাছ থেকে এই

জারুল গাছ পর্যন্ত তোমার সীমানা।' জঙ্গল সাফ করে বার হল নয় দশ বা পনের বিঘা চাষের জমি।

জমির পর পাওয়া গেল জানোয়ার। প্রত্যেক পরিবার পিছু একটি করে সবৎসা গাই ও মোষ। মোষগুলি খাঁটি মণ্টোগোমারি জাতের। দেশেই যার প্রত্যেকটির দাম পাঁচশ থেকে হাজার। তারা যেমন পনের ষোল সের দুধ দেয়, তেমনি তাদের বিচালি, ভুষি ও তেলজলের দরকার। চরে কাঁচা ঘাস খেলে তাদের অসুখ হয়, তেল না দিলে গায়ে ঘা হয়। বাছুর বাঁচানো বিশেষ কঠিন কাজ। উদ্বাস্তুরা মোষ পুষতে অনভ্যস্ত, তার ফলে এক বছরের ভেতর শতকরা আশীটি মোষই গেল মরে। যেগুলি শেষ পর্যন্ত টি`কে রইল তাদের দুধ কমে কমে পাঁচ সাত সেরে এসে দাঁড়াল।

হালের জন্য দেওয়া হল দুই জাতের মোষ, মণ্টোগোমারি (অর্থাৎ পাঞ্জাবী) এবং মাদ্রাজী। যার যেমন বরাত, লটারীতে কেউ পেল মাদ্রাজী মোষ, কেউ পেল পাঞ্জাবী মোষ। যত্ন ও উপযুক্ত খোরাকের অভাবে বেশীর ভাগ মরে গেল। কিছু আবার বর্মী ও লোক্যালদের কাছে উদ্বাস্তুরা বিক্রী করে দিল।

কারুর মোষ গেল মরে, কেউ বিক্রী করে দিল। জমি পরিষ্কার করার কঠিন পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরে অনেকে জমি অন্য লোককে বিক্রী করে দিল। যাদের জমি-জমা, গরু-মোষ কিছুই রইল না তাদের অবস্থা হয়ে উঠল সঙ্গীন। সুরু হল বাঁচবার জন্য সংগ্রাম। কেউ ঢুকল পূর্তবিভাগে, কেউ বনবিভাগে এবং কেউ লেবার ফোর্সে। আর সেই সঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল দলাদলি, হিংসা আর অসামাজিক নানারকম কার্যকলাপ। জুয়া এবং স্থানীয় চোলাইকরা মদের সঙ্গে হল পরিচয়, ইন্ধন যোগাল আশপাশের বর্মীরা।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে ভদ্র শিক্ষিত মানুষ ছিল সামান্য কয়েকজন, বেশীর ভাগই চাষী এবং নমঃশূদ্র।

দেশে থাকতে এদের সামাজিক রূপ ছিল আলাদা। বিগত কয়েক মাসের অসহ পরিবেশ, বিভিন্ন ক্যাম্পের তিক্ত অভিজ্ঞতা অনেকেরই বিচারবুদ্ধি বিকৃত করে দিয়েছিল। বাংলার সমাজ মেল ও গোষ্ঠী বহির্ভূত আন্দামানের সমাজে ধীরে ধীরে তারা মিশে যেতে লাগল। ছেলেমেয়েদের বিয়ের সময় প্রথমে অসবর্ণ বিয়ে তারপর অবাঙ্গালী অর্থাৎ রাঁচী, তামিল, লোক্যাল এবং বর্মীদের সঙ্গে বিয়ে চালু হতে লাগল।

পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক দেশ। সেই নদী নালায় ভরা দেশ থেকে উদ্বাস্তরা এই পাহাড়ী জঙ্গল ভরা দেশ দেখে ভয় পেয়ে গেল। পারি-পার্শ্বিক আবহাওয়া ছাড়াও তাদের লড়াই করতে হয়েছে স্থানীয় লোকেদের বিরুদ্ধে। লোক্যালবর্ণদের ধারণা, তারা আন্দামানের বাসিন্দা, এখানেই তাদের জন্ম, কর্ম, কাজেই আন্দামানের ওপর তাদের পূর্ণ অধিকার। উদ্বাস্তরা তাদের দেশে অনধিকার প্রবেশ করেছে। সাধ্যমত লোক্যালরা উদ্বাস্তদের উত্যক্ত করেছে। বিশেষ করে দক্ষিণ আন্দামানের লোক্যালরা কিছুতেই উদ্বাস্তদের সেখানে থাকতে দিতে রাজী হয়নি। দিল্লীতে হোম সেক্রেটারীকে লোক্যালবর্ণ দ্বারা গঠিত আন্দামান এসোসিয়েশন জানিয়েছিল, 'দক্ষিণ আন্দামান আমাদের, আমরা আজ একশ বছর যাবৎ এখানে বাস করছি। তোমরা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের মধ্য আন্দামান বা উত্তর আন্দামানে বসাও।' তাদের সে আপীল গ্রাহ্য হয়নি। পরলোকগত রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন আন্দামানে এসেছিলেন, তাঁর কাছেও আন্দামান এসোসিয়েশন জানিয়েছিল, 'আমাদের দেশে আমরা উদ্বাস্ত চাই না। তোমরা তাদের এখানে পাঠিও না।' রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন, 'এক ভাই বিপদে পড়লে অন্য ভাই সাহায্য না করলে কি চলে? তা ছাড়া তোমরা বোধহয় জানো না স্বাধীনতার জন্য পূর্ববঙ্গের দান অনেকখানি।'

অনেক অসুবিধাই আছে তবুও উদ্বাস্তরা এখানে সুখেই আছে। পেটে ভাত, পরনে কাপড়, গোলাভর্তি ধান, গোয়ালভরা গরু এবং

ফলভরা বাগান প্রায় সকলেরই আছে। তা ছাড়া যত অসুবিধাই হোক-না কেন, শেয়ালদার স্টেশনে অস্থায়ী বাস, উদ্বাস্তু শিবিরে শিবিরে ভিক্ষা গ্রহণ, এ সবের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে বাস্তুহারা মানুষগুলি আজ একটা নির্ভরযোগ্য মাটিতে পা দিতে পেরেছে এবং নিজস্ব জমিজমা, ভিটেমাটি পেয়ে নূতন করে বেঁচে উঠেছে।

পূর্ববাংলার এই মানুষগুলি ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে আন্দামানের অধিবাসীতে। তারা কথা বলে পাঁচটা হিন্দী শব্দ মিশিয়ে, ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করে হিন্দীতে। তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন তারা বাংলা বলে না তবে উত্তর দেয়, হিন্দী না বললে তাদের অসুবিধা হয়।

এখানে আসবার পর থেকেই উদ্বাস্তু কলোনীগুলি দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম। কেমন করে এত দূর দেশে আমাদের দেশের চাষী ভাইরা বসবাস করছে নিজের চোখে দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়েছিলাম। সুযোগ আসতেই একদিন রওনা দিলাম পোর্টব্লেয়ারের আশে পাশে মংলুটন, শৌলদারী, হার্বাটাবাদ, তিরুর এইসব গ্রামগুলি দেখতে। পোর্টব্লেয়ারের আশে পাশের অঞ্চলের বসতিগুলি বেশ ভালই হয়েছে। কলোনী বলতে যা বোঝায় এগুলি কিন্তু ঠিক তা নয়। তিন চারটি করে পরিবার এক জায়গায় বসানো হয়েছে, আবার হয়ত মাইলের পর মাইল জঙ্গল, তারপর আবার দুইতিন ঘর উদ্বাস্তু। যেখানে যেখানে ধানী জমি পাওয়া গিয়েছে সেখানে সেখানে কয়েকটি করে উদ্বাস্তু পরিবার বসানো হয়েছে। আমাদের দেশের মত ক্ষেত থেকে এরা দূরে থাকতে পারে না। আন্দামানে ধানক্ষেতের প্রবল শত্রু হচ্ছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাতী আর জঙ্গলের হরিণ এবং টিয়াপাখী। তাই জমি রক্ষার জন্য চাষীদের কাছাকাছি থাকতে হয়।

পঞ্চাশ বছর আগে একজন ফরেস্ট অফিসার শখ করে চার জোড়া হরিণ এনে আন্দামানের জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই চার

জোড়া থেকে পঞ্চাশ বছরে কত হাজার হরিণ যে হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। চাষীরা হরিণের জ্বালায় উত্যক্ত হয়ে পড়ে। হরিণ মারবার জন্য দুটি চিতাবাঘ আনা হয়েছিল, তাদের যে শেষ পর্যন্ত কি হল কেউই বলতে পারে না। বর্তমানে কোন বাঘ আনা আন্দামান সরকারের ইচ্ছা নয়, কারণ জঙ্গলের কাছেই সব উদ্বাস্তু কলোনীগুলি। জারোয়ার ভয় তো আছেই তার উপর বাঘের উৎপাত হলে আর রক্ষা নেই। টিয়াপাখীগুলিও বড় অত্যাচার করে। পঙ্গপালের মত ক্ষেতে ঝাঁকে ঝাঁকে বসে সমস্ত শস্য শেষ করে দেয়। ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের হাতীগুলি রাত্রিবেলা ধানের ক্ষেতে গিয়ে সব তচনচ করে দেয়। এসব অত্যাচার থাকলেও আন্দামানে প্রচুর ধান জন্মায়। এখানকার প্রধান শস্য ধান। আর জন্মায় নারকেল ও সুপুরি অপর্যাপ্ত। সরকারী নারকেল বাগিচা ছাড়া বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও নারকেলের বেশ ফলাও ব্যবসা করে। যত নারকেল হয় সব চালান যায় মেনল্যাণ্ডে আর এখানকার লোকেরা নারকেল কেনে খুব চড়া দামে।

ধান অপর্যাপ্ত হলেও এখনও মেনল্যাণ্ড থেকে আমদানি করতে হয়। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরাই প্রথম মুগ, মুসুরি ও কলাই ডালের চাষ করে। তবে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। আলু পেঁয়াজ ছাড়া তরিতরকারী প্রায় সব রকমেরই জন্মায়। শীতের তরকারী, যেমন—ফুলকপি, বাঁধাকপি, টম্যাটো, মটরশুঁটি ভালো হয় না। বাংলা দেশের প্রতিটি শাকসবজি আন্দামানের মাটিতে জন্মায়। ঢেঁকি শাক থেকে সুরু করে উচ্ছে, বেগুন, লাউ, কুমড়ো, চালতা, মূলো সবই পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে পেঁপে, কলা, আনারস প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

কৃষিবিভাগের প্রধান শত্রু হচ্ছে শামুক, চলতি ভাষায় বলে 'গুঙ্গা'। এই শামুকগুলি গাছপালার যা ক্ষতি করে তা বর্ণনা করা যায় না। গল্প শুনেছি পোর্টব্লেয়ারে এই শামুকগুলি আগে ছিল না,

এয়ারপোর্টের ঘাস খেয়ে পরিষ্কার করার জন্য বাইরে থেকে কয়েকটি শামুক এনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ফল হল উল্টো, শামুকরা ঘাসতো খেলই না উপরন্তু পোর্টব্লেয়ারের মাটিতে রক্তবীজের বংশের মত ছড়িয়ে পড়ল। শামুকগুলির বিশেষত্ব, এরা নোনাজল সহ্য করতে পারে না, ফুলগাছ এবং ফলগাছ এদের কাছে সমান প্রিয়। দিনের বেলা রোদ উঠলে কোথায় যে লুকিয়ে থাকে টের পাওয়া যায় না। রাত্রিবেলা মাটি ফুঁড়ে হাজার হাজার শামুক বেরিয়ে ছোট ছোট চারাগাছ নির্মূল করে খেয়ে ফেলে। বড় গাছের, যেমন—পেঁপে গাছ, কলাগাছের গা বেয়ে উঠে সব পাতা এবং ফলগুলি খেয়ে ফেলে। কৃষিবিভাগ থেকে প্রতিবছর বিশেষজ্ঞরা এসে গবেষণা করে যান কি উপায়ে গুঙ্গার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নানারকম রাসায়নিক জিনিসপত্র ব্যবহার করে গুঙ্গা মারার চেষ্টা হয়েছে। সাময়িকভাবে সফল হলেও বংশ নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না।

আন্দামানের মাটি খুব উর্বরা, অল্প পরিশ্রমে, অল্প সময়ে বেশ ভাল শাকসবজি জন্মানো যায়।

উদ্বাস্তু কলোনীগুলির কথা বলছিলাম। গ্রামগুলি ঘোরবার সময় বাড়ী বাড়ী গিয়ে আলাপ করলাম। বেশীর ভাগ উদ্বাস্তু বরিশাল ও খুলনা জেলার লোক। আমাদের দেখে সকলে মহা খুশী। আমাদের বসতে পিঁড়ি পেতে দিল, ঘরের ভাজা মুড়ি ছোট ছোট ডালায় করে এনে দিল।

একপাশে ঢেঁকিঘর, এক পাশে রান্নাঘর, মাঝখানে শোবার ঘর। মাটি দিয়ে নিকোনো ঝকঝকে উঠোন, গোলাভর্তি ধান। সকলের বাড়ীতেই পেঁপে ও কলাগাছের বাগান। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমাদের এখানে মন বসেছে তো?" সে জবাব দিল, "মন কি আর বসে মা, তবে আপনাদের আশীর্বাদে খাওয়া পরার দুঃখটা আমাদের নাই।"

দক্ষিণ আন্দামানের হার্বাটাবাদ, মংলুটন, মধ্য আন্দামানের

রঙ্গত এবং উত্তর আন্দামানের সুভাষগ্রাম আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে। পোর্টব্লেয়ারের কাছে শৌলদারী বোধহয় সব চেয়ে বড় উদ্বাস্তু কলোনী। প্রায় তিনশ পরিবারের বাস, বেশীর ভাগ বরিশাল জেলার নমঃশূদ্র।

আমাদের নিজেদের দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে, তাই উদ্বাস্তুদের ওপর আমাদের একটু দুর্বলতা আছে। যত উদ্বাস্তু অঞ্চলে গিয়েছি, বরিশাল বাড়ী শুনে গুপ্তসাহেবকে সকলে ছেঁকে ধরেছে, যেন তাদের কত আপনজনকে পেয়েছে। অসঙ্কোচে সকলে নিজেদের সুবিধা, অসুবিধা, অভাব অভিযোগের কথা বলেছে। চিঁড়ে, মুড়ি, নাড়ু, খাইয়েছে।

পোর্টব্লেয়ারের আশপাশের গ্রামের লোকেরা বেশ সুখেই আছে। সহরের সঙ্গে যোগাযোগের বন্দোবস্ত আছে, 'বাস সার্ভিস' আছে। তিন চারটি কলোনীর মধ্যে একটি করে বাংলা স্কুল এবং একটি করে ডিসপেনসারী আছে।

আবার এমন সব দূর দূরান্তের দ্বীপগুলিতে পুনর্বসতি হয়েছে যেখানে নিকটতম লোকালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা ছয় মাসেও হয় কিনা সন্দেহ। অনেক দ্বীপে জলের বড় অভাব। সারা গ্রীষ্মকালে জলের জন্য লোকগুলি হাহাকার করে। একবার গ্রীষ্মকালে হ্যাভলক দ্বীপে গিয়েছিলাম। সেখানকার উদ্বাস্তুরা বলেছিল সারা গ্রীষ্মকালে তারা স্নান করতে পারে না জলের অভাবে। যা জল তারা পায় রান্না করে আর খেয়ে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না। বাধ্য হয়ে দিনের পর দিন সমুদ্রের জলে স্নান করতে হয়।

হ্যাভলক দ্বীপ পোর্টব্লেয়ার থেকে পঁচিশ মাইল দূরে। উদ্বাস্তুরা নাম দিয়েছে 'গোবিন্দনগর'। এখানে প্রায় ১৮০টি পরিবার বাস করে। জলের কষ্ট থাকলেও হ্যাভলকে গেলে ভারী ভাল লাগে। সম্পূর্ণ বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের সেট্‌লমেন্ট। সরকার থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, এখানে অন্য কোন দেশের সেট্‌লার, অর্থাৎ রাঁচী বা

কেরালার লোক কোনদিন পাঠানো হবে না। এখানকার উদ্বাস্তুরা বেশ সুখেই আছে।

উত্তর আন্দামানে স্মিথ আয়ল্যাণ্ডে পঁচিশ ত্রিশ ঘর উদ্বাস্তু বসানো হয়েছিল। ঘরে বসে বড় কর্তারা ম্যাপ দেখে আর বই পড়ে পুনর্বসতির চার্ট তৈরী করেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁদের কারুরই থাকে না। স্মিথ দ্বীপে একটি ঝরণা আছে এই সংবাদের ওপর ভিত্তি করে সেখানে উদ্বাস্তুদের বসানো হল। ছোট্ট দ্বীপ। এমন নয় যে পাশাপাশি অনেকগুলি দ্বীপ একসঙ্গে আছে, একটা থেকে আরেকটাতে যেতে হলে কোন অসুবিধা নেই। স্মিথ দ্বীপের আশেপাশে আর কোনও দ্বীপ নেই। সে দ্বীপ থেকে বার হতে হলে নৌকা ছাড়া উপায় নেই। সেখানে ঝরণা আছে ঠিকই তবে কলোনী থেকে বহুদূরে পাহাড়ের নীচে গিয়ে জল আনতে হয় বলে সরকার থেকে কলোনীর মধ্যে কয়েকটি কুয়ো খুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। গ্রীষ্মকালে তার কয়েকটি গেল শুকিয়ে, কয়েকটিতে উঠল নোনাজল। লোকগুলি জলের অভাবে ছটফট করতে লাগল। অনেক কষ্টে যখন তারা নিকটতম লোকালয়ে খবর পাঠাল, তখন সেখানে প্রথমে গেলেন মায়াবন্দরের অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার মিঃ ভদ্র। মিঃ ভদ্র গল্প করেছেন, স্মিথ দ্বীপে গিয়ে সেট্‌লারদের সঙ্গে যখন ঘুরে ঘুরে কুয়োগুলি দেখছিলেন, প্রচণ্ড রোদে, দারুণ গরমে, তাঁর গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল. কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা এমন ছিল যে, পিঠে জলের বোতল ঝোলান থাকা সত্ত্বেও তিনি জল খেতে সাহস করেননি। তাঁর মনে হয়েছিল জল খাবার চেষ্টা করলেই ক্ষুধার্ত বাঘের মত লোকগুলি তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। মিঃ ভদ্র ফিরে এসে সমস্ত অবস্থাটা পোর্টব্লেয়ারে জানালেন। তখন এখান থেকে বড় কর্তারা গেলেন স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখে আসবার জন্য। গুপ্ত সাহেব বলেছেন, স্মিথ দ্বীপে গিয়ে সকলের চক্ষু স্থির! জল কোথায়? কুয়োগুলি শুকনো খটখটে আর কয়েকটিতে নোনাজল। বাঙ্গালী দেখে

গুপ্তসাহেবকে কয়েকজন হাত জোড় করে কেঁদে বলল, "কর্তা, আমরা তো মরছিই, আমাগ পোলাপানগ দয়া কইরা বাচাইবেন।"

এই অবস্থা দেখে স্মিথ দ্বীপের সব কয়টি উদ্বাস্তুকেই অন্যান্য দ্বীপে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দ্বীপে দ্বীপে বহুলোকের সঙ্গে দেখা করেছি, গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, তাদের নিজের মুখে সুখ দুঃখের কথা শুনেছি।

অনেক লোক আছে যাদের কাজই হল সরকারের নিন্দা করা। আরও সুবিধা কেন তারা পায় না এইটাই তাদের একমাত্র অভিযোগ। গতরে খাটতেও সকলে রাজী নয়, বসে বসে পাওয়ার দিকেই নজর বেশী। রাঁচীর এবং কেরালার লোকেরা পূর্ববঙ্গের লোকেদের থেকে অনেক বেশী কষ্টসহিষ্ণু।

আন্দামানে যতজন পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু এসেছে, নিজের জাত ব্যবসা প্রায় কেউই করে না, এমনকি অনেকে ভুলেও গিয়েছে। গোটা আন্দামানে ঘুরে দেখেছি, কিন্তু কোথাও দেখিনি তাঁতিরা তাঁত বুনছে, কুমোরেরা চাক ঘুরাচ্ছে বা মালাকারেরা শোলার ফুল তৈরী করছে। সকলেরই এক কাজ, সে হল চাষবাস।

আন্দামানের জঙ্গল এত গভীর কিন্তু কোন হিংস্র জন্তু নেই। যাও বা দুটি বাঘ আনা হয়েছিল তারও কোন খোঁজ নেই। জন্তু বলতে আছে হাতী, গরু, মোষ, হরিণ, শূয়োর, কুকুর এবং বিড়াল। এত বিস্তীর্ণ গভীর অরণ্য জন্তু জানোয়ার না থাকায় কেমন যেন শ্রীহীন মনে হয়। ব্রিটিশ আমলে ঘোড়া কিছু ছিল কিন্তু জাপানীরা তা খেয়ে শেষ করে গিয়েছে। গ্রেট নিকোবরে কিছু বাঁদর আছে কিন্তু আশ্চর্যের কথা গোটা আন্দামানে একটিও বাঁদর দেখতে পাওয়া যায় না।

সাপ আছে প্রচুর। কিন্তু বিষাক্ত সাপ বিশেষ নেই। কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। আমরা যখন প্রথম পোর্টব্লেয়ারে

এলাম, একদিন রাত্রিবেলা গেস্টহাউসের কেয়ারটেকারকে সাপে কামড়াল। আমরা তো ভয়ে মরি কিন্তু কেয়ারটেকারের কোন ভাবান্তর দেখলাম না। খানিকটা গরমজল পায়ের ওপর ঢেলে কি সব পাতাটাতা লাগাল এবং পরদিন সকাল থেকে আবার কাজকর্ম করতে লাগল। আমরা তো দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। সাপ হয়ত বিষাক্ত নেই, কিন্তু যা আছে এখানে সাংঘাতিক বিষাক্ত প্রাণী, তা হল কান-খাজুরা (centipede); আমাদের দেশের তেঁতুলে বিছের মত দেখতে, লম্বায় প্রায় আট দশ ইঞ্চি। কান-খাজুরার কামড় সাপের কামড়ের থেকেও যন্ত্রণাদায়ক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মারাত্মক। হলফ করে বলতে পারি, মহাভারতের কর্ণ যদি কান-খাজুরার কামড় খেতেন তবে ঘুমন্ত গুরু জামদগ্ন্যের মাথা কোলে করে বসে থেকে তাঁকে আর বাহাদুরি নিতে হত না! কামড় খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে হত। কান-খাজুরার কাছে আমাদের দেশের কাঁকড়া বিছে বা তেঁতুলে বিছে তো তুচ্ছ। সবচেয়ে বিপদের কথা কান-খাজুরার যাতায়াত সর্বত্র। ঘরের মেঝে, বিছানায়, জুতোর ভিতরে, কোটের পকেটে সর্বত্র ঢুকে বসে থাকে। কান-খাজুরা ছাড়া আছে আন্দামানের সমুদ্রে অসংখ্য হাঙ্গর। যেখানে সেখানে কেউ সমুদ্রে স্নান করতে পারে না একমাত্র করবাইন্‌স্ কোভ ছাড়া। আন্দামানের জঙ্গলে বেতগাছ হয় প্রচুর। একরকম বেতগাছ আছে যার ডগা কাটলে চমৎকার পানীয় জল বেরোয়। বর্মাদেশে এই বেতগাছকে বলে life saver.

ম্যানগ্রোভের জঙ্গলগুলি দেখবার মত। প্রত্যেকটি খাড়ির দুইদিকে অসংখ্য গাছ, ছোট, বড়, মাঝারি। জোয়ারের সময় গাছগুলি অর্ধেকের বেশী জলের তলায় চলে যায়। বোটে করে খাড়ির ভেতর দিয়ে যাবার সময় অনেকবার ইচ্ছা হয়েছে ছোট ডিঙ্গি করে যেখানে খালের মত রয়েছে সেখানে ঢুকে পড়ি। অদ্ভুত একটা আকর্ষণ বোধ করেছি। কেন যেন মনে হয়েছে এগুলি বাংলা দেশের খাল,

খানিকদূর গেলেই চোখে পড়বে গ্রামের দৃশ্য। খাড়ির জল টলটলে নীলচে সবুজ রং-এর।

ম্যানগ্রোভের গাছ এখানে জ্বালানি কাঠের জন্য ব্যবহার করা হয়। আন্দামানে কয়লা পাওয়া যায় না, রান্না করতে হয় কাঠ দিয়ে। প্রথম প্রথম অনভ্যাসের ফলে মহিলাদের নাস্তানাবুদ হতে হয়। জিওলোজিস্টরা বলেন ম্যানগ্রোভের জঙ্গল না থাকলে সমুদ্র কোনদিন আন্দামানকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত তার ঠিক নেই। কারণ ম্যানগ্রোভ গাছ মাটিকে আটকে রাখে। কিন্তু ম্যানগ্রোভের জলা জায়গাগুলি বড় সাংঘাতিক। সন্ধ্যার পর যখন ঝাঁকে ঝাঁকে 'স্যাণ্ডফ্লাই' ছেঁকে ধরে তখন পাগল হবার উপক্রম হয়। স্যাণ্ডফ্লাই পোকাগুলি খুব ছোট্ট পাহাড়ী দেশের পিশু পোকার মত, কিন্তু তার কামড়ের জ্বালা ও জের বোধহয় বোলতার চেয়েও বেশী। গল্প শুনেছি বহু আগে পেনাল সেট্‌লমেণ্টের সময় অবাধ্য কয়েদীদের শাস্তি দেবার জন্য রাত্রিবেলা তাদের ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে বেঁধে রাখা হত। একরাত্রি স্যাণ্ডফ্লাইয়ের কামড় খেয়ে কয়েদীরা সম্পূর্ণরূপে বদলে যেত।

পোর্টব্লেয়ার থেকে চল্লিশ মাইল দূরে লংদ্বীপ। ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট ছাড়া অন্য কোন কাজ বিশেষ নেই। বর্তমানে 'অ্যালবিয়ন প্লাই উড ফ্যাক্টরী' এখানে একটি কারখানা খুলেছে এবং অল্প দিনের মধ্যেই দ্বীপটির চেহারা বদলে দিয়েছে। অল্প কয়েকঘর লোকের বাস। জেটি থেকে সিঁড়ি দিয়ে অনেকখানি উঠে তারপর বাড়িঘর সুরু হয়েছে। সমুদ্রের ধারেই ভারী সুন্দর ছবির মত ফরেস্টের ডাকবাংলো। ঘণ্টা দুই থেকে সব দেখে আমরা রওনা দিলাম রঙ্গতের দিকে। খাড়ির ভেতর দিয়ে আমাদের বোট চলছিল, দুই পাশে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। আমরা গিয়ে পোঁছলাম ইরাটা জেটিতে। ছোট্ট একটি কাঠের নড়বড়ে জেটি। ইরাটা থেকে ট্রাকে করে কাঁচা রাস্তা দিয়ে পাঁচ মাইল গিয়ে রঙ্গতের গেস্ট হাউসে

উপস্থিত হলাম। (এখন অবশ্য রঙ্গতে পাকা রাস্তা হয়েছে, বাস হয়েছে, এবং রঙ্গতের জেটিও তৈরী হয়েছে।)

নিবিড় শ্যামল বনরাজি ঘেরা একটি গিরি উপত্যকা রঙ্গত। চারদিকে পাহাড়ের গায়ে প্যাডক, গর্জন, ধূপ, পপিতা, পিমা, দিডুর ভিড়। আর পাহাড়ের নীচে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সোনালী পাকা ধানের ক্ষেত। ক্ষেতের মাঝে মাঝে বাড়িঘর। হালকা মেঘের দল অনেক নীচে নেমে এসে গাছের ফাঁকে ফাঁকে আটকে রয়েছে, ঠিক পাহাড়ী দেশের মত। অপূর্ব দৃশ্য। এখানকার উদ্বাস্তুদের সকলেরই বেশ সচ্ছল অবস্থা।

রঙ্গতের গেস্ট হাউসটি বেশ উঁচু পাহাড়ের ওপর জঙ্গলের মধ্যে। ধারে কাছে কোন বাড়িঘর নেই। বিজলী বাতি না থাকায় সন্ধ্যার পর সমস্ত অঞ্চল অন্ধকার হয়ে গেল। এবারকার ট্যুরে শুধু আমরা নিজেরাই এসেছিলাম, গুপ্তসাহেব, আমি এবং আমার ছোট মেয়ে দোলন। গেস্ট হাউসের পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে নিবিড় জঙ্গল। পিছনের পাহাড়টা যেন ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। রাত বেশী হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন সব' চলে গেলে আমরা একেবারে একলা পড়ে গেলাম। নীচের তলায় চৌকিদার আর ওপরে আমরা তিনজন। জনমানবের সাড়া শব্দ নেই কোথাও, নীচে উপত্যকার মধ্যেও কোন আলো দেখা যায় না। ঘরের মধ্যে লণ্ঠনের আলোয় অন্ধকার যেন আরো গাঢ় দেখাচ্ছিল। রাত গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা গা ছমছমে, ভয় জাগানো, অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হল।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ খ্যাক খ্যাক খ্যাক আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। বেশ জোরে জোরে কে যেন বারান্দায় আওয়াজ করছে। লণ্ঠনটা কখন নিভে গিয়েছে। গাঢ় অন্ধকারে শুনতে পেলাম থেমে থেমে একটা আওয়াজ হচ্ছে খ্যাক খ্যাক খ্যাক। সামনের বারান্দায় কোন দরজা নেই, একেবারে জঙ্গলের ভিতর গেস্ট হাউসটি।

কে জানে কোন্ অশরীরী প্রাণী এসেছে আমাদের দরজায়? খ্যাক খ্যাক আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের গায়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ হচ্ছিল।

গুপ্ত সাহেবের ডাকে নীচে থেকে লণ্ঠন নিয়ে চৌকিদার উঠে এল। আলো নিয়ে সকলে বারান্দায় গেলাম, কোথাও কিছু নেই। উনি চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করলেন, এতক্ষণ আওয়াজ হচ্ছিল কিসের? চৌকিদার শুনে বলল, ভয়ের কিছু নেই সাহেব, ওটা কেবলি অর্থাৎ টিকটিকি। বলে কি লোকটা? টিকটিকি কখনও এত আওয়াজ করতে পারে? বিশ্বাস না করায় আলো তুলে ছাদের কাছে টিকটিকি দেখাল, প্রায় আধ হাত লম্বা বিরাট বড় বড় সবুজ রংএর দুইটি টিকটিকি, মাথাগুলি খুব বড বড়। আমি বললাম, 'এত ভয় দেখায়, মেরে ফেলনা কেন?' চৌকিদার বলল, 'কোন ক্ষতি তো করেনি মেমসাব, রোজ রাতে আসে, ভোর বেলা চলে যায়।'

পরে অবশ্য অনেকের কাছে গল্প শুনেছি টিকটিকি নয় তক্ষক। যে কেউ রঙ্গতের গেস্ট হাউসে রাত কাটিয়েছে, তার সঙ্গেই এই তক্ষক দম্পতির দেখা হয়েছে।

পরদিন সকালে আমরা রওনা দিলাম বেটাপুরের দিকে। ট্রলি করে যেতে হয়। ট্রলি করে রঙ্গত থেকে সতের মাইল এসে বেটাপুর পৌঁছলাম। বেটাপুরে ফরেস্টের বেশ বড় একটি করাত কল আছে। রঙ্গত থেকে মায়াবন্দর পর্যন্ত যে ট্রাঙ্ক রোড হচ্ছে তা এই বেটাপুরের ওপর দিয়েই গিয়েছে। দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়া করে প্রায় তিনটের সময় রঙ্গতে ফিরে এলাম। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে চললাম বকুলতলার দিকে। বকুলতলা হল আর এক দিকে। আগে এখানে শুধু ফরেস্টের কিছু লোকজন ছিল, পরে উদ্বাস্তুদের এখানে বসানো হয়েছে। অনেকদূর পর্যন্ত জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পাকা রাস্তা চলে গিয়েছে, তার দুই পাশে সব উদ্বাস্তুদের গ্রাম, দশরথপুর, ঊর্মিলাপুর, কৌশল্যা নগর ইত্যাদি। কৌশল্যা নগরের আগে

শক্তিগড়—জারোয়া অধ্যুষিত অঞ্চল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো কয়েকটি ঘর। সামনে তাদের ধানের জমি। এই কলোনী-গুলি দেখলে মনে বড় দুঃখ লাগে। কোথায় পূর্ব বাংলার নদী-নালা খাল-বিল ভরা গ্রাম আর কোথায় এখানকার জঙ্গল ঘেরা শুকনো খটখটে উদ্বাস্তু কলোনী। এক উদ্বাস্তু বাড়ীতে ঢুকলে একটি বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা। সে আমাদের দেখে বলল, 'দেখেন দেখেন, আমাগ ভাল কইরা দেখেন, জঙ্গলে মানুষ জানোয়ার দেখতেও তো আসে, আমরা সেই রকম জানোয়ার। সরকার আমাদের কত সুখে রাখছে নিজের চক্ষে দেইখ্যা যান।' মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। সারা জীবন কাটিয়ে শেষ বয়সে দুর্ভোগ সইতে বেচারার এসে পড়তে হয়েছে আন্দামানের জঙ্গলে।

রঙ্গতে দুইদিন থেকে চললাম মায়াবন্দরের দিকে। সমুদ্রপথে যাবার সময় বোটের সারেঙ্গরা লম্বা সূতোয় গেঁথে জলের মধ্যে বঁড়শি ফেলে দিল। আন্দামান নিকোবরের সমুদ্রে মাছ পাওয়া যায় প্রচুর। শঙ্খ, কড়ি, ঝিনুক, শামুক যেমন পাওয়া যায়, তার দশগুণ পাওয়া যায় মাছ। সুরমাই, ভেটকি, পমফ্রেট, পার্শে, কুকারি, চিংড়ি ছাড়া পাওয়া যায় অজস্র সার্ডিন মাছ। স্থানীয় ভাষায় বলে তারিনীমাছ। সমুদ্রের ধারে ধারে টাল করে সার্ডিন মাছ শুকিয়ে জেলেরা 'সুখা মচ্ছি' তৈরী করে। এখানে মাছ ধরার কোন সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নেই, 'ডিপ সী ফিশিং'-এর তো নেইই। অথচ মাছ ধরতে এসে প্রায়ই বর্মী এবং চীনা বোট এখানে ধরা পড়ে।

বোটে সারেঙ্গরা প্রায়ই বঁড়শি দিয়ে বড় বড় মাছ ধরে।

পোর্টব্লেয়ারের পরেই নাম করতে হয় মায়াবন্দরের। এইটিই হল আন্দামানের দ্বিতীয় সহর। সহরে যদিও পাকা রাস্তা নেই, গাড়ীঘোড়া নেই, বিজলী বাতি নেই, সিনেমা হল নেই, তবুও মায়া-বন্দর আন্দামানের একটি অভিজাত সহর। মায়াবন্দরকে বলা যায় কাঠের সহর, কারণ কাঠের জন্যই এর খ্যাতি। মিড্‌ল্ আন্দামানের

যত কাঠ সব চালান যায় মায়াবন্দর থেকেই। শ্রীযুত পি. সি. রে সমস্ত মায়াবন্দরের জঙ্গল ইজারা নিয়েছেন একশ বছরের জন্য। মায়াবন্দরের আকাশে বাতাসে খালি কাঠের গন্ধ। চারিদিকে শুধু নানা ধরনের কাঠ; কাঁচা কাঠ, ভেজা কাঠ, চেরা কাঠ, কাঠের গুঁড়ি এবং কাঠের গুঁড়ো। এছাড়া মায়াবন্দরে আর কিছু নেই। জেটির গায়েই পি. সি. রে কোম্পানীর স-মিল্ তারপর খানিকটা উঁচুতে সহরের বাড়ী ঘর। এখানে পি. ডব্লিউ. ডি. এবং পি. সি. রে কোম্পানীর চমৎকার দুটি গেস্ট হাউস আছে। মায়াবন্দর যদিও খুব ছোট্ট সহর তা হলেও এখানে বেশ কয়েকজন সরকারী অফিসার আছেন। মায়াবন্দরে মাঝে মাঝে আন্দামান, নিকোবর জাহাজ নোঙর করে, আবার কাঠ নিয়ে যাবার জন্য কলকাতা থেকেও মাঝে মাঝে জাহাজ আসে।

মায়াবন্দর থেকে খানিকদূরে বর্মীদের 'ওয়েবি' গ্রাম। প্রচুর কমলালেবু জন্মায় ওয়েবিতে।

মায়াবন্দর থেকে রওনা দিলাম উত্তর আন্দামানের ডিগলিপুরের দিকে। বেশ লম্বা সমুদ্র পাড়ি। ভোর বেলা রওনা দিয়ে বেলা একটার সময় এরিয়েল বে জেটিতে পৌঁছলাম। জেটি থেকে কাঁচা রাস্তা দিয়ে ট্রাকে করে পাঁচ মাইল পাহাড়ী পথে উঠে তবে ডিগলিপুরের উদ্বাস্তু গ্রাম সুভাষগ্রাম। উত্তর আন্দামানের সব চেয়ে বড় বসতি। উত্তর আন্দামানের বাসিন্দা বলতে আজকাল পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদেরই বোঝায়। এখানে তাদের প্রবল প্রতাপ। ডিগলিপুরে শাসনকার্যের জন্য একজন তহশীলদার আছেন। আমার সুভাষগ্রামের সেট্‌লমেণ্টটি বড় ভাল লাগল। কথায় বার্তায় চালচলনে পূর্ববাংলার আবহাওয়া বেশ টের পাওয়া যায়।

উত্তর আন্দামানের সব চেয়ে উঁচু পাহাড় স্যাড্‌ল্ পিক্ আন্দামানের মাউণ্ট এভারেস্ট। জেটি থেকে ডিগলিপুরে যাবার পথে একটি নদী পড়ে। আমরা যখন গেলাম, জল তখন প্রায় ছিলই না।

কিন্তু বর্ষাকালে এই নদী যখন জলে টইটম্বুর হয়ে ওঠে তখন সুরু হয় কুমীরের উপদ্রব। প্রতি বছর উদ্বাস্তুরা মাছ ধরতে এসে কত জন যে কুমীরের পেটে যায় তার ঠিক নেই।

ডিগলিপুরে তরিতরকারী এবং ধান জন্মায় বোধহয় গোটা আন্দামানের মধ্যে সব চেয়ে বেশী। আন্দামানে ফসল জন্মায় একবার কিন্তু এত অপর্যাপ্ত যে সারা বছর খেয়ে তারপর বিক্রী করেও বেশ পয়সা উপার্জন হয়।

'এরিয়েল বে'র বন্দরটি সমগ্র আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর। সমুদ্র ছয় মাইল ভিতরে ঢুকে গিয়েছে, চওড়ায় প্রায় এক মাইল। তিনদিক পাহাড়ে ঘেরা। ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার প্রথমবার জরীপ করতে এসে এই বন্দরটি দেখেই বলেছিলেন 'ব্রিটিশ নেভির অর্ধেক-ই প্রায় এখানে ভিড়ানো যায়।' ভারত গভর্ণমেণ্টেরও পরিকল্পনা আছে নূতন করে জেটি তৈরী করে বন্দরটি চালু করার।

আন্দামানের সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনীগুলি দেখে মনটা বেশ খুশীই লাগল। ভালই আছে এরা, সুখেই আছে।

কয়েক মাস যাবার পর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। উদ্বাস্তু অর্থাৎ সেট্‌লারদের সম্বন্ধে অবাঙ্গালীরা একটা অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাব পোষণ করেন, নানা বিরুদ্ধ মন্তব্য ও কুৎসা করেন। এমন কথাও অনেকের মুখে শুনেছি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের কল্যাণে আন্দামানে মেয়ে খুব সস্তা হয়ে গিয়েছে। শুনে মনে যেমন হত রাগ তেমনি হত দুঃখ। ভাবতাম এটা নিছক বাঙ্গালী বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রায় বছর খানেক এখানে থাকবার পর উদ্বাস্তুদের চরিত্রের আর একটা দিক নজরে পড়ল।

আন্দামানের আকাশে বাতাসে পাপের বীজ ছড়ানো, একদিনের নয়, শতাধিক বর্ষের এবং এর প্রভাব এড়ানো বড় সহজ কথা নয়। এমনিতেই সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ এখানে এসে ধীরে ধীরে নিজেদের শিক্ষা, দীক্ষা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি সব ভুলতে বসে, আর বাংলাদেশের

উদ্বাস্তুরা তো পোড় খাওয়া, ভাগ্য বিতাড়িত একদল মেরুদণ্ডহীন শিক্ষাদীক্ষা হীন মানুষ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বলি। একবার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণে বাড়ীঘর, জমিজমা, বিষয় সম্পত্তি এমনকি স্ত্রীপুত্র ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছে। চোখের ওপর পরমাত্মীয়ের মৃত্যু হয়েছে, মা-বোনেরা লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েছে, পেটের ধান্দায় মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট হয়েছে, ঘরের মেয়ে-বৌ পালিয়ে গিয়েছে। দুঃস্বপ্নের মত তারা পথে পথে কাটিয়েছে। তারপর সরকার পরিচালিত ক্যাম্পে ও ভগবানের পরিবেশিত গাছতলায় বা স্টেশনে তাদের যে আশ্রয় মিলল তাইতেই তারা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করল। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। আবার তাদের সেই আশ্রয় ছেড়ে আসতে হল সাগর পাড়ি দিয়ে দ্বীপান্তরের দেশে এই আন্দামানে। আশা হল এবার তারা নিশ্চিন্ত নির্ভয় জীবন যাপন করবে। কিন্তু তখনো বুঝতে পারেনি, যে সম্পত্তি ও সমৃদ্ধি তারা পিছনে ফেলে এসেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান জিনিস তাদের খোয়া গিয়েছে—সেটা তাদের সহজাত নৈতিক ঐতিহ্য, বাঙ্গালীর বিশেষ সংস্কৃতি। কিন্তু এর জন্য দায়ী তারা নিজেরা নয়, দায়ী বাস্তুহারাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অপ্রত্যাশিত আমূল বিপর্যয়। এখানে এসে তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল নিতান্ত জৈব অভাবের পূর্তি।

কাজেই এই নূতন পরিবেশে এসে যখন তারা দেখল তাদের বসতির এক পাশে লোক্যালবর্ণদের গ্রাম, অন্য পাশে বর্মীদের গ্রাম, সে সব গ্রামে দুর্নীতি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, চরিত্র নিয়ে কেউ বড়াই করে না, সতীত্বকে কেউ মর্যাদা দেয় না, খুন জখম, ব্যভিচার কোনটাই খুব দূষণীয় বলে মনে করে না, স্বভাবতঃই তারা সেই পরিবেশের দিকেই ঝুঁকতে লাগল। যে কয়জন শিক্ষিত উদ্বাস্তু ভদ্রলোক ছিলেন তাঁদের কথা কেউ শুনতে চাইল না। প্রয়োজন হলে ঘরের মেয়ে-বৌ-এর বিনিময়ে পয়সা রোজগার করতে অথবা সামান্য কারণেপ্রতিবেশীর মাথায় লাঠির বাড়ি মারতে উদ্বাস্তুদের আর

কোন বাধা রইল না। নামতে নামতে যেখানে এসে তারা নেমেছে, সেখানে সততা, উদারতা বা নীতির কোন স্থান নেই। তার ফলে আমাদের দেশের নিরীহ সরল মানুষগুলি আজ অবাঙ্গালীদের চোখে হেয় ও অবজ্ঞেয় হয়ে পড়েছে।

এদের শিক্ষা দিয়ে, উপদেশ দিয়ে, মানসিক উন্নতি করতে পারে একমাত্র এদের ছেলেমেয়েরাই। গ্রামে গ্রামে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উদ্বাস্তুদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, সেখানে পড়া শেষ হলে পোর্টব্লেয়ার হাইস্কুলে ভর্তি হচ্ছে। স্কুল শেষ করে অনেকে নানারকম টেকনিক্যাল লাইনে ঢুকছে। কাজেই আশা আছে উদ্বাস্তুদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা শেষ করে নিজেদের গ্রামে ফিরে এলে বাস্তুহারা বাঙ্গালী সমাজের একটা নিজস্ব রূপ ফুটে উঠবে। এদের ভেতর থেকেই জন্ম নেবে একটা সমাজ যার ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বল, যার কর্ম হবে কল্যাণময়।

আন্দামানে দুটি আগ্নেয়গিরি আছে—ব্যারেন আয়ল্যাণ্ড এবং নারকোণ্ডাম আয়ল্যাণ্ড। অবশ্য দুটিই এখন মৃত। ১৭৮৯ সনে ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার যখন দ্বীপগুলি জরীপ করছিলেন, ব্যারেন দ্বীপের পাশ দিয়ে যাবার সময় অগ্ন্যুৎপাত হতে দেখেছিলেন, তারপর আর কেউ দেখেছেন কিনা কোন খবর পাওয়া যায়নি।

ব্যারেন দ্বীপ ও নারকোণ্ডাম দ্বীপে যাবার সুযোগ খুব কমই পাওয়া যায়। এই দুই দ্বীপে মানুষের কোন বসতিও নেই বা বনবিভাগের কোন কাজও নেই, কাজেই সরকারের তরফ থেকে কোন লোকেরই আসবার প্রয়োজন হয় না। সেবার জিওলজিস্ট পার্টি ঠিক করল তারা ব্যারেন দ্বীপে যাবে। চীফ কমিশনার মিঃ মহেশ্বরী, গুপ্তসাহেব এবং জিওলজিস্ট পার্টির সাত আট জন মিলে ব্যারেন দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। প্রত্যেক বছর জিওলজিস্ট পার্টি আন্দামানে এসে দ্বীপে দ্বীপে জরীপ করে বেড়ান।

আগ্নেয়গিরি দুটি মিডল্ আন্দামানের কাছাকাছি, পোর্টব্লেয়ার থেকে আশী মাইল দূরে। প্রথম দর্শনে অদ্ভুত লাগে ব্যারেন দ্বীপ দেখতে, ঠিক পিরামিডের মত কোণাকৃতি। উচ্চতায় ১১৫০ ফিট। চারপাশে সামান্য ঝোপঝাড় তারপর ছড়ানো পাথর, আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে নির্গত লাভার রাশি। অত্যন্ত ধারালো পাথরগুলি। খানিকদূর গিয়েই সোজা উঠে গিয়েছে রুক্ষ, গাছপালাহীন, অনুর্বর পাথুরে ব্যারেন দ্বীপ, আন্দামানের একদা বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি। ঝোপঝাড় যা নীচের দিকে আছে তাতে চরে বেড়ায় বিরাটাকৃতি একপাল রামছাগল।

গুপ্তসাহেবরা ঢেউ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অতিকষ্টে তীরে উঠলেন। জিওলজিস্ট পার্টি তাঁবু ফেললেন, খাবার আয়োজন করলেন। ব্রেকফাস্ট খেয়ে গুপ্তসাহেবদের আরোহণ-পর্ব সুরু হল। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছাইয়ের পাহাড়। পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে হড় হড় করে নেমে এলেন, এক পা উঠলে তিন পা নামতে হয়। এই ভাবে কিছুক্ষণ চেষ্টা করতে সকলে গলদঘর্ম হয়ে গেলেন, মাথার ওপর চড়চড় করছে রোদ তার ওপর পাথরগুলি তেতে আগুন হয়ে উঠেছে। প্রথমদিন উঠতে না পেরে সকলে হাল ছেড়ে দিলেন। পরদিন ভোরবেলা আবার সকলে পাহাড়ে চড়ায় চেষ্টা করতে লাগলেন। চারদিক ঘুরে একটা জায়গা বেছে সবাই উঠতে লাগলেন। লাঠিতে ভর দিয়ে, থেমে থেমে, পাথরের খাঁজে খাঁজে সন্তর্পণে পা রেখে সকলে যখন ওপরে উঠলেন, পরিশ্রমে আর তৃষ্ণায় সকলের 'কণ্ঠাগত প্রাণ'। সামনে রয়েছে আগ্নেয়গিরির মুখ বা 'ক্রেটার'। বিরাট একটি গর্ত। ক্রেটারের মুখ দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া বার হচ্ছে। আশে পাশে আরও কয়েকটি ছোট ছোট গর্ত দেখা গেল। সে সব জায়গা দিয়েও আগে আগুন বার হত। ক্রেটারের বাইরে চারপাশে ছড়ানো লাভার স্রোত, শক্ত পাথরের মত। সকলে মিলে ক্রেটারের মধ্যে খানিকটা ঢুকে পড়লেন, ভেতরটা নাকি এখনও বেশ গরম। প্রায় মণ পনের গন্ধক কুড়িয়ে জড়ো করা হল।

ভূতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন ব্যারেন দ্বীপের ক্রেটারটি জগদ্বিখ্যাত আগ্নেয়-গিরি মাউন্ট ভিসুভিয়াসের ক্রেটারের মত দেখতে।

নীচে নামবার সময় হল বিপদ। অনেক কষ্টে লাঠির ওপর ভর দিয়ে একরকম কায়দা করে সর সর করে সকলে নেমে এলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর সকলে চললেন বোটে করে নারকোণ্ডামের দিকে। নারকোণ্ডামেও সামান্য গাছপালা আছে। উচ্চতায় এই আগ্নেয়গিরিটি ২৩৩০ ফিট। লম্বায় আড়াই মাইল, চওড়ায় দেড় মাইল। শোনা যায় ১৮৪৪ সনে ব্রিটিশ জাহাজ 'কোয়ানটুং' যখন আন্দামান সমুদ্রে এই দ্বীপগুলি জরীপ করে বেড়াচ্ছিল, সেই সময় শেষ অগ্ন্যুৎপাত হয়। কোয়ানটুং জাহাজের নাবিকরা বহু দূর থেকে নারকোণ্ডামের মুখ থেকে অগ্ন্যুৎপাত হতে দেখেছিল। নামটি সম্বন্ধে নানা গল্প আছে। কেউ বলেন মালয়বাসীরা এখানকার নাম দিয়েছিলেন নরককুণ্ডম্। সংস্কৃত সাহিত্যে নাকি তাদের কিছুটা জ্ঞান ছিল। কিন্তু তারা কি কারণে এ দ্বীপটির সঙ্গে নরককুণ্ডের তুলনা করেছিল জানি না। আরেকটি গল্প—করমণ্ডল উপকূলের ব্রাহ্মণরা যখন বাণিজ্য উপলক্ষে এই দ্বীপটির পাশ দিয়ে যাতায়াত করতেন, এই অদ্ভুত গঠনের নির্জন পাহাড়ী দ্বীপটির মুখ থেকে অগ্ন্যুৎপাত হতে দেখে নাম দিয়েছিলেন নরককুণ্ডম। নরককুণ্ডম থেকে নরকণ্ডম, তার থেকে নারকোণ্ডাম। কে জানে এই অণ্ডম থেকেই হয়ত সারা অঞ্চলের নাম হয়েছে আণ্ডেমান তথা আন্দামান।

পোর্টব্লেয়ার আসবার আগে যত জনকে জিজ্ঞেস করেছি স্কুলের বিষয়, সকলেই বলেছেন 'ভাল স্কুল নিশ্চয়ই আছে, এত সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে লোক পাঠাচ্ছে, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা কি আর হয়নি?' নিশ্চয় করে কেউ কিছু বলতে পারেননি। ডি. পি. আই.-কে ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন হিন্দী আর উর্দু মিডিয়ামে হাই স্কুল আছে। যাই হোক মেয়েদের স্কুল

থেকে নাম না কাটিয়ে চার পাঁচ মাসের ছুটি নিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। বড় মেয়ে বীথি সিনিয়র কেম্ব্রিজ দিয়ে এসেছিল, তার জন্য চিন্তা ছিল না, ছোট মেয়ে দোলনের জন্য মর্ডান প্রিপেরটারি নামে একটি ইংলিশ মিডিয়াম প্রাইমারী স্কুল ছিল। মেজ মেয়ে মীনা এবং সেজ মেয়ে বাবি, তারা উঁচু ক্লাসের ছাত্রী, কিছুতেই হিন্দী মিডিয়ামে পড়তে রাজী হল না। অগত্যা তাদের আবার কলকাতা পাঠিয়ে দিতে হল।

পোর্টব্লেয়ারে দুটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে, একটি ছেলেদের একটি মেয়েদের। শিক্ষার মাধ্যম হিন্দী ও উর্দু। স্কুলগুলি সব অবৈতনিক। স্কুলের স্ট্যাণ্ডার্ড মোটেও ভাল নয়, পাশের হার অত্যন্ত কম। বছরে একজনও প্রথম বিভাগে পাশ করে কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া লোক্যাল ছেলেমেয়ে থাকায় নৈতিক আবহাওয়াও খুব ভালো নয়। সরকারী কাজে ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশ থেকে সকলে যখন এখানে আসতে বাধ্য হন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সমস্যা নিয়ে অকূল পাথারে পড়েন। তিন বছরের জন্য যাঁরা ডেপুটেশনে আসেন তাঁরা তো ছেলেমেয়েদের এখানে রাখেনই না, এমনকি আন্দামান অ্যাডমিনিস্ট্রেশনেও যাঁরা ত্রিশ বছরের জন্য চাকরী করতে আসেন তাঁরাও ছেলেমেয়েদের মেনল্যাণ্ডে রেখে আসেন। হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ছাড়া মিড্‌ল স্কুল ও প্রাইমারী স্কুল আছে অগুন্‌তি।

পেনাল সেট্‌লমেণ্টের সময় কয়েদীদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে সরকার থেকে বিনা বেতনে স্কুল করা হয়েছিল, আজও সব স্কুল তাই অবৈতনিক। পোর্টব্লেয়ারের বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা বেশীর ভাগই বাংলা জানে না। হিন্দীতে পড়াশোনা করে। উদ্বাস্তুদেরও সেই অবস্থা। হিন্দী শিখলে সরকারী কাজ পাবার সুবিধা, এই ধারণা থাকায় সকলে হিন্দী শেখাটাই বাঞ্ছনীয় মনে করে। আশঙ্কা হয়, দশ পনের বছর পরে এই ষোল হাজার

বাঙ্গালী নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সব ভুলে যাবে, তাদের মধ্যে বাঙ্গালীত্ব আর কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১৯৬০ সনে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের একটা শাখা আন্দামানে এসেছিল রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করতে। সদস্যরা উদ্বাস্তু কলোনীতে গেলে বহু লোকের কাছে অভিযোগ শোনেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের বাংলাতে উচ্চশিক্ষা পাওয়ার কোন বন্দোবস্ত নেই। একটা বাংলা হাইস্কুলের অত্যন্ত প্রয়োজন।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সদস্যদের উৎসাহে এবং সাহায্যে স্থানীয় বাঙ্গালীরা ১৯৬৫ সনে পোর্টব্লেয়ারে একটি বাংলা স্কুল খোলেন। নাম দেওয়া হয় রবীন্দ্র বাংলা বিদ্যালয়।

ডি. এম. কে.। দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাঘাম্। আন্দামানে দক্ষিণ ভারতীয় এই সংস্থাটির আধিপত্য দেখলে অবাক্ হতে হয়। ১৯৬০ সনের গোড়াতে এই বিষবৃক্ষের বীজ পোঁতা হয়েছিল এখানকার মাটিতে। মাদ্রাজ থেকে সব বড় বড় ডি. এম. কে. নেতারা এসে সহরের সর্বত্র বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন। দিনের পর দিন গান্ধী ময়দানে বিরাট সভা হল। নেতাদের বক্তৃতা শোনার জন্য কাতারে কাতারে লোক বসে গেল ঘাসের ওপর। বক্তৃতার ভাষা তামিল, কাজেই মাদ্রাজী ছাড়া কেউ সে ভাষা বুঝতে পারলেন না। তবুও যে মাদ্রাজী ডি. এম. কে.-র সমর্থক নন, তাঁদের কাছে বক্তৃতার মর্ম কিছু শোনা গেল।

নেতাদের মূল বক্তব্য হল এই রকম, "উত্তর ভারতীয়েরা চিরকাল আমাদের ওপর অন্যায় করে এসেছে, আমাদের অবজ্ঞার চোখে দেখেছে। রামায়ণের যুগ থেকে আমাদের ওপর অবিচার করা হয়েছে। উত্তর ভারতীয়দের রামচন্দ্র দক্ষিণ ভারতীয়দের রাবণকে অন্যায়ভাবে বধ করেছে। আজ আমাদের সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। তোমরা অন্যায়ের প্রতিকার চাও। তোমাদের

পিছনে থাকবে মেনল্যাণ্ডের ডি. এম. কে.-র সহানুভূতি ও সমর্থন" ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাই হোক প্রতি জাহাজেই কোন না কোন নেতা আসতেই থাকলেন এবং ধীরে ধীরে একটি বিরাট দল সংগঠিত হল। দিন দিন এই সংস্থাটি যে রকম ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে লাগল তাতে সবাই প্রমাদ গণল।

গল্প শুনেছি ১৯৪৯ সনে এবং তারও পরে যখন পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের আন্দামানে আনা হচ্ছিল, স্থানীয় লোক্যালবর্ণরা বাঙ্গালীদের সংখ্যাধিক্যে ভয় পেয়ে তৎকালীন কেরলীয় চীফ কমিশনারকে অনুরোধ করে দক্ষিণ ভারত থেকে লোক আনানো সুরু করেছিল। আজ আন্দামানে মাদ্রাজীদের সংখ্যাধিক্যে লোক্যাল-বর্ণদের স্বখাত সলিলে ডুবে মরার অবস্থা হয়েছে। এখানে ডি. এম. কে. শব্দটা শুনলে সকলের মনে এমন ভাবের সৃষ্টি হয়, যেমনটি মনে হত রায়টের সময় মুসলমান শব্দ শুনলে।

কারণে অকারণে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতে ডি.এম. কে. অদ্বিতীয়। অবস্থা যখন চরমে ওঠে তখন সুরু হয় ১৪৪ ধারা। আন্দামানের শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রায় ডি. এম. কে.-র অবস্থিতি ঠিক যেন সুস্থ শরীরে একটি বিষফোঁড়ার মত।

ডি. এম. কে.-র পৃষ্ঠপোষকতায় একবার আন্দামানে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯৬০ সনের ১০ই এপ্রিল। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখি আমাদের গেটের কাছে চারজন সশস্ত্র পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করায় হাবিলদার জবাব দিল পুলিশ সাহেবের আদেশে পাহারা দিতে এসেছে।

কয়দিন থেকেই শুনছিলাম পি. ডব্লিউ. ডি.-র মজুরেরা গোলমাল সুরু করেছে। কারণ ছিল ৫৲ টাকা মাইনে বাড়ানো। এখানে ওখানে মিটিং করা, অফিসে গিয়ে হানা দেওয়া, প্রসেশন বার করা,

ধর্মঘট করা ইত্যাদি নানারকম গোলমাল সুরু করেছিল। ভাবলাম হয়ত এই সব কারণেই পুলিশ সাহেব পাহারা দেবার জন্য লোক পাঠিয়েছেন।

বেলা আটটার সময় চীফ কমিশনারের বাড়ীতে পি. ডব্লিউ. ডি.-র আফিসারদের একটা মিটিং ছিল। গুপ্তসাহেব যখন তৈরী হচ্ছিলেন সেই সময় গেটের কাছে একটা গোলমাল শুনে বারান্দায় গিয়ে দেখি প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন মজুর জোর করে কম্পাউণ্ডে ঢুকতে চাইছে আর হাবিলদার তাদের বাধা দিচ্ছে। খানিক পরে গজর গজর করতে করতে সবাই ফিরে গেল। কথাবার্তা সব তামিল ভাষায় হওয়ায় কিছু বুঝতে পারলাম না তবে মনে একটা আশঙ্কার ছায়া পড়ল। ঘরে এসে ওঁকে সব ব্যাপারটা জানাতে উনি মোটেও গুরুত্ব দিলেন না। এদিকে তৈরী হয়ে যখন নীচে নামছেন এমন সময় হাবিলদার এসে বাধা দিল, 'সাহেব আপনি ঘর থেকে বার হবেন না, সহরে বড় গোলমাল সুরু হয়েছে, ডি. সি. সাহেবের গুলিতে তিনজন মজুর মারা গিয়েছে। মজুরেরা ক্ষেপে উঠে ডি. সি., এস্. পি. এবং আপনাকে মারবে বলে ঠিক করেছে; ডিলানিপুরের মোড়ে একদল আপনার গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছে।'

আমাদের বাড়ী থেকে বাইরে কোথাও যেতে হলে ডিলানিপুর দিয়েই যেতে হয়। ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। আন্দামানে এরকম ব্যাপার হতে পারে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। গুপ্তসাহেব কিছুতেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করলেন না এবং যাবার জন্য জিদ ধরলেন। হাবিলদারও উল্টে জিদ করল, 'না সাহেব, আপনাকে কিছুতেই যেতে দেব না।'

ঘণ্টাখানেক পর এক ভদ্রলোক ফোন করে জানালেন সহরের অবস্থা বড় খারাপ। পুলিশ ফায়ারিং-এর ফলে তিনটি মজুর আহত হয়ে হাসপাতালে মারা গিয়েছে। তাদের দেখতে ডি. সি. ও এস্. পি. হাসপাতালে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে বাজারের মধ্যে প্রায় হাজার

খানেক মজুর ডি. সি.-র গাড়ি আটকায় এবং ডি. সি.-কে গাড়ি থেকে টেনে বার করে গাড়ি উল্টে দেয়। তারপর পাথর দিয়ে ডি. সি.-কে দারুণ আঘাত করে। অনেক কষ্টে মজুরদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে ডি. সি. ও এস. পি. এক দোকানের মধ্যে ঢুকে প্রাণ বাঁচান। মজুরদের সব চেয়ে রাগ ডি. সি.-র ওপর, তারপর চীফ কমিশনার, প্রিন্সিপ্যাল এঞ্জিনীয়ার এবং পি. ডব্লিউ. ডি.-র অন্যান্য অফিসারদের ওপর।

সারা সহর অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে থম থম করছে। নেতাহীন উন্মত্ত জনতা। পথে ঘাটে একটিও লোক দেখা যায় না। সরকারী জীপ দেখলেই মজুরেরা আক্রমণ করে। স্কুল অফিস বন্ধ। সরকারী জিনিসপত্র তচনচ্ করে, রাস্তাঘাট, ব্রিজ নষ্ট করে, পি. ডব্লিউ. ডি.-র স্টোর লুট করে মজুরেরা আক্রোশ মেটাতে লাগল। আন্দামান সরকারের উপযুক্ত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর অভাবে গোলমাল উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। এরপর পি. ডব্লিউ. ডি.-র মজুরেরা মেরিন, ফরেস্ট এবং লেবার ফোর্সের মজুরদের দলে টানতে লাগল। সহরের একেবারে অচল অবস্থা।

রাত্রিবেলা দেখি বাড়ির চারদিকে আরও পুলিশ এসে ঘিরে ফেলেছে। মজুরেরা নাকি ভয় দেখিয়েছে ডি. সি., পি. ই. এবং অন্যান্য পি. ডব্লিউ. ডি.-র অফিসারদের বাড়িতে আগুন লাগাবে। ডি. সি. মিঃ হালভে তো ভয়ে সপরিবারে চীফ কমিশনারের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। আমাদের মনের ভাব অবর্ণনীয়। ভয়, উত্তেজনা, থ্রিল মিশিয়ে কেমন যেন একটা ভাব। আগুন লাগাবার কথা শুনে প্রমাদ গণলাম। কাঠের বাড়ি, আগুন লাগালে আর রক্ষা নেই, জীবন্ত দগ্ধ হতে হবে।

যাই হোক আগুন আর শেষ পর্যন্ত বাড়িতে লাগায়নি এবং ভালয় ভালয় রাতটা কেটে গেল। ভোর হল। সহরের সেই একই অবস্থা। কোথাও যেন মানুষের অস্তিত্ব নেই। এর পর মজুরেরা

পোর্টব্লেয়ারের বাইরে হামলা সুরু করল। সকলের একমাত্র ভয় এই গোলমাল যদি অন্যান্য দ্বীপে সুরু হয় তবে আর রক্ষা নেই। সহরে আর বাড়তি পুলিশ নেই যে গোলমাল ঠেকাতে পাঠাতে পারে।

এই রকম যখন অবস্থা, হোম মিনিস্ট্রীর অনুরোধে কলকাতা থেকে চার্টাড প্লেনে করে নিকোবর হয়ে পুলিশ বাহিনী পোর্টব্লেয়ারে এসে পোঁছাল। ধীরে ধীরে এর পর সহরের অবস্থা শান্ত হয়ে এল। এই কয়দিনে সহরের সকলের মনের ওপর দিয়েই একটা দারুণ ধকল গেল।

আন্দামানের বেশীর ভাগ দ্বীপে এখনও মানুষের পদার্পণ হয়নি, কাজেই সে সব দ্বীপ এখনও সকলের কাছে রহস্যময়। এমনকি পোর্টব্লেয়ারের ধারে কাছে গভীর জঙ্গলের ভিতর কি আছে না আছে অনেকেই খবর রাখেন না।

জিওলজিস্ট পার্টির কাছেই অনেক সময় নূতন নূতন জায়গার সন্ধান পাওয়া যায়। একবার জিওলজিস্ট মিঃ করুণাকরণ বলেছিলেন মানার ঘাটের কাছাকাছি জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা চমৎকার একটি ঝরণা দেখতে পেয়েছেন। তবে রাস্তা খুব খারাপ।

এক ছুটির দিনে বিরাট একটি দল রওনা দিলাম ঝরণা দেখার উদ্দেশ্যে। পোর্টব্লেয়ার থেকে প্রায় মাইল ত্রিশেক গিয়ে মানার ঘাট। রাস্তায় গাড়ি রেখে সকলে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। রওনা দেবার আগেই শুনেছিলাম রাস্তা খুব খারাপ, মাঝে মাঝে নালা আছে আর জঙ্গলে অসংখ্য জোঁক। আন্দামানের জঙ্গল জোঁকের জন্য বিখ্যাত। জোঁকের ভয়ে ছেলেরা সকলে গামবুট পরে নিলেন। মেয়েরা সবাই চটী পায়েই গিয়েছিলাম।

রাস্তা যে এত খারাপ আগে কেউ বুঝতে পারেননি। জঙ্গলের মধ্যে সবাই ঢুকলাম দুরু দুরু বক্ষে জোঁকের প্রতিষেধক হিসেবে

ডেটলের বোতল ও নুনের পোঁটলা নিয়ে। আগের রাত্রিতে বৃষ্টি হওয়ায় পথ জল-কাদায় ভর্তি।

আধ মাইল পথ বেশ নিরাপদেই আসা গেল। তারপর সুরু হল জোঁকের রাজত্ব। টুপটাপ করে গাছ থেকে পড়ছে। মাটি থেকে গা বেয়ে উঠছে, মাথা বেয়ে জামার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। সে এক অসহ অবস্থা। নুন দিয়ে জোঁক ছাড়িয়ে আবার পথ চলা সুরু হল। পায়ে ঘষে নিয়েছিলাম ডেটল। কিন্তু রাস্তায় নালা পড়লেই জলে ডেটল ধুয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে চলতে চলতে ডেটলের বোতল খালি হয়ে গেল—হাতে একমাত্র অস্ত্র নুনের পোঁটলা।

এবার সুরু হল চড়াই। চলেছি তো চলেছি। পিচ্ছিল পথ, এক পা উঠলে তিন পা পিছিয়ে আসি। লাঠিতে ভর দিয়েও পিছল পাহাড়ে পা রাখা মুশকিল। থেমে থেমে যে উঠব তারও উপায় নেই, থামলেই লাখ লাখ জোঁক কিলবিল করে গা বেয়ে উঠবে। পথ আর শেষ হয় না। সকলের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে, ঘামে জামা কাপড় ভিজে গিয়েছে, পথের আর শেষ নেই।

এবার পড়ল খাড়া চড়াই। পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম। যত এগোচ্ছি জোঁকের সংখ্যা ততই বেড়ে যাচ্ছে! রাস্তার মধ্যে পাতার ফাঁকে ফাঁকে কিলবিল করছে, চেহারাটা দেখলেই গায়ের মধ্যে কেমন যেন শির শির করে ওঠে। কখন যে পায়ের পাতায়, হাঁটুতে, গালে, কপালে এসে লাগছে টেরই পাচ্ছি না। এখানকার জঙ্গলে মানুষ তো নয়ই গরু ছাগলও ঢোকে না, তাই মহানন্দে জোঁকের দল আমাদের ছেঁকে ধরল। আমার তখন কেবল মনে পড়ছিল সেটলমেণ্টের গোড়ার দিকের কয়েদীদের কথা। তাদেরও তো শুনেছি এমনি করেই জোঁকে ছেয়ে ফেলত।

দুর্গম চড়াই এক মাইল ওঠবার পর গাইড বলল রাস্তা ভুল হয়েছে। এবার উপায়? আবার সেই পাহাড়ী পথে নামতে লাগলাম। ওঠার চাইতে নামা আরও কঠিন হয়ে পড়ল। কতজন

যে গড়িয়ে নীচে পড়ল তার ঠিক নেই। যেন পাল্লা দিয়ে সকলে নীচে গড়িয়ে পড়তে লাগলাম। এইভাবে নামতে নামতে এবার একটা অন্য পথ পেলাম। মনে হল এ রাস্তায় জোঁকের উপদ্রব কম। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আরও প্রায় এক মাইল এসে দাঁড়ালাম ঝরণার সামনে।

অপরূপ দৃশ্য। কত উঁচু থেকে জল পড়ছে। অনবরত ঝর ঝর করে জল পড়ার শব্দ। আশপাশের পাথরগুলো শ্যাওলা পড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে জল জমে রয়েছে, তারপরই উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে নীচের দিকে কলকল স্রোতে নেমে গিয়েছে।

চীফ কমিশনার মিঃ মহেশ্বরী ঝরণাটির নাম দিলেন 'বসুধারা'। আমার ইচ্ছা করছিল নাম দিই পাগলা ঝোরা। বাধাবন্ধনহীন প্রাণোচ্ছল এক শিশুর মত নেচে চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরণার ধারা।

'পিছন পানে নাইকো বাধা
পিছনে টান নাইকো মোটে,
পাগলা ঝোরার পাগল নাটে
নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে।
লাফিয়ে পড়ে ধাপে ধাপে
ঝাঁপিয়ে পড়ে উচ্চ হতে,
চড়চড়িয়ে পাহাড় ফেড়ে
নৃত্য করে মত্ত স্রোতে।'

বঙ্গোপসাগরের মধ্যে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থিতি সত্ত্বেও কোনদিন এখানে নৌঘাঁটি তৈরী হয়নি। অথচ ১৭৮৯ সনে আন্দামানে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের পর থেকেই ইংরেজদের পরিকল্পনা ছিল এখানে naval arsenal খোলবার।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ক্যাপ্টেন ব্লেয়ারকে দ্বীপগুলি জরীপ করতে পাঠান, তখন তাঁকে যে প্রধান কারণ দেখান হয়েছিল তা হল—"The primary view of the Research being, as already stated, the acquisition of an Harbour, where fleets in time of war can refit by any means, on leaving the coast of Coromondal upon the approach of stormy monsoon; or to which any part, or the whole, may retire in the event of a disastrous conflict with an enemy, and to obtain a central position in the Bay, whence the ship may return to the scene of Action, as soon as possible."

কাজেই দেখা যাচ্ছে আন্দামানে নৌঘাঁটি খোলবার ইচ্ছা প্রথম থেকেই ছিল ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কিন্তু প্রয়োজন বোধ না করাতে হয়ত অত অর্থ ও সময়ের অপব্যয় করতে রাজী হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধই যত কাল হল। একজন ইংরেজ নেভাল অফিসারের কাছে গল্প শুনেছি যে, গত যুদ্ধে সিঙ্গাপুরের পতনের পর ইংরেজরা হাত কামড়েছে। যদি আন্দামান বা নিকোবরে তাঁদের একটা নৌঘাঁটি থাকত তবে এমন করে সিঙ্গাপুর তাঁরা হারাতেন না এবং বঙ্গোপসাগর নিজেদের আয়ত্তে রাখতে হলে আন্দামান নিকোবর হচ্ছে উপযুক্ত স্থান।

স্বাধীনতার পর নৌঘাঁটি খোলা হবে বলে কথা চলছিল। হঠাৎ এল চীনের আচম্বিতে ভারত আক্রমণ। এইবার সত্যি সত্যিই আন্দামানে নেভাল বেস খোলবার প্রস্তুতি চলতে লাগল।

১৯৬০ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী আন্দামানে সকাল সাতটার সময় নেভাল বেসের উদ্বোধন হল। নেভির প্রথা অনুসারে নেভির 'ফার্স্ট লেডি' মিসেস সোমান (ভাইস এডমিরাল সোমানের স্ত্রী) বেসের নামকরণ করলেন আই. এন. এস. 'জারোয়া'।

এরপর এডমিরাল সোমান জনতাকে উদ্দেশ করে ভাষণ দিলেন। সোমানের ভাষণের পর নেভির ছেলেরা ভাঙড়া নাচ দেখাল। উদ্বোধন উপলক্ষে লিট্‌ল আন্দামান থেকে ওঙ্গিদের আনানো হয়েছিল। ওই ছিমছাম পরিবেশে উলঙ্গ ওঙ্গিরা যখন ঢুকল, সমস্ত জায়গাটা জুড়ে উঠল একটা চাপা গুঞ্জন। বিশেষ করে আট দশটা জাহাজে করে যেসব নেভাল অফিসার এসেছিলেন তাঁদের কাছে এমন দৃশ্য দুর্লভ। ওঙ্গিদের বসতে বললে সকলে চেয়ারের ওপর পা তুলে বসল। চোখে মুখে তাদের বিস্ময়বিহ্বল ভাব। কেন এসেছে, কোথায় এসেছে, কিছুই তাদের বোধগম্য হচ্ছিল না। ভাঙড়া নাচের পর নৃতত্ত্ববিভাগের অফিসারটি তাদের নাচতে বললেন। স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় চৌদ্দ পনেরটি ওঙ্গি হাত ধরাধরি করে সরু গলায় গান করে নাচতে লাগল। লিট্‌ল আন্দামানের জঙ্গলের মধ্যে যে নাচ উপভোগ করেছিলাম, এই সভ্য পরিবেশে, দুনিয়ার লোকের সামনে উলঙ্গ মেয়েদের পাছা দুলিয়ে নাচ অসহ্য লাগছিল। 'বন্যেরা বনে সুন্দর' এর মত সত্যি কথা আর হয় না। যাই হোক একটা নাচ শেষ হতেই শ্রীমতী সোমান নাচ বন্ধ করে দিতে বললেন। এরপর জলযোগের পর উৎসবের শেষ হল।

পোর্টব্লেয়ারে গতানুগতিক জীবনে আই. এন. এস. জারোয়ার উদ্বোধন খুবই চাঞ্চল্য এনেছিল।

সাগর প্রতিরক্ষার জন্য সম্প্রতি অজয়, অক্ষয় ও অভয় নামে যে প্রহরাতরী সংগ্রহ করা হয়েছে তার একটি সব সময়েই আন্দামান নিকোবর দ্বীপে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়।

আন্দামানের পূর্ব উপকূলেই সব সহর ও বন্দরগুলি এবং সব জাহাজগুলি পূর্ব উপকূল দিয়েই যাতায়াত করে। পশ্চিম উপকূল নেভিগেশানের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে সেদিক দিয়ে কোন জাহাজ যাতায়াত করে না। এবং সেদিকে কোন লোকালয়ও নেই।

জারোয়া এলাকা বলতেও পশ্চিম উপকূলকেই বোঝায়। কোন বহিঃশত্রু যদি পশ্চিম উপকূলে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকে তবে আন্দামানের লোক সহজে তা টের পাবে না। সম্প্রতি নেভির জাহাজগুলি মাঝে মাঝে সেদিকে গিয়ে ঘুরে আসে।

'যাত্রা করো যাত্রা করো যাত্রীদল
উঠেছে আদেশ,
বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মত শেষ।'

অবশেষে দীর্ঘ চার বছর পর এল গুপ্তসাহেবের বদলীর আদেশ! এসেছিলাম দু' বছরের জন্য, থেকে গেলাম চার বছর।

যাঁরাই এখানে বদলী হয়ে আসেন—প্রতিটি মাস, প্রতিটি দিনের তাঁরা হিসাব রেখে যান কবে শেষ হবে নির্বাসনের দিন, এই আশায়। আমরাও এতদিন অধীর আগ্রহে ফিরে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সত্যি সত্যি যখন সময় হয়ে এল তখন এই দ্বীপ-গুলির জন্য মনের মধ্যে একটা আকুলতা অনুভব করলাম। আর কোন দিন এখানে আসব না, আর কোন দিন দেখব না এই সাগরঘেরা দ্বীপগুলি, আর কোন দিন যাপন করব না এমন ঢিলেঢালা মন্থরতায় ভরা জীবনযাত্রা। ভাবতেও পারিনি এই কয় বছরে আন্দামানকে এত ভালবেসে ফেলেছি। যদিও অনেক সময় অনেক অসুবিধা বোধ করেছি তবুও বলতে ইচ্ছা হয়, ভাগ্যে এখানে এসেছিলাম! আমরা এখানে জলে, স্থলে, পর্বতে, বন্দরে, সহরে, গ্রামে প্রকৃতির যে রূপ দেখেছি, সমুদ্রের বুকে দ্বীপগুলিতে বসে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, সমুদ্রকে যতটা আপন করে জেনেছি তার তুলনা হয় না। বই পড়ে বা লোকমুখে শুনে এই একদা কুখ্যাত আন্দামান সম্বন্ধে সঠিক জানা কোনদিনই সম্ভব হত না।

জনপ্রিয় holiday resort বানাবার জন্য আন্দামান সরকার

প্রভৃত চেষ্টা করছেন। জাহাজের এবং প্লেনের ভাড়া অত্যন্ত বেশী হওয়ায় সকলের পক্ষে আন্দামান আসা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ভারতবর্ষের লোকেদের অবশ্য মনে হবে, অতদূরে অজানা রহস্যঘেরা দ্বীপে কে যায়? আন্দামান যে কত সুন্দর তা এখানে না এলে কেউ বুঝতে পারবেন না। কবিত্ব করে বলতে ইচ্ছে করে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ শঙ্খের বলয় পরে, প্রবালের মালা গলায়, সবুজ বসনাঞ্চল ছড়িয়ে তার অফুরন্ত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার খুলে বসে আছে। কিন্তু তার সে সৌন্দর্যে সাড়া দেয় কয়জন? যে সুদূরে সমুদ্রের কোলে সে বসে আছে সেখানে পৌঁছানো সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও আশা করি দূরত্ব গ্রাহ্য না করে, যাতায়াতের অত্যধিক ভাড়া উপেক্ষা করে, নূতনত্বের আশায়, অদূর ভবিষ্যতে অনেকে ছুটির সময় পুরী, দার্জিলিং-এর দিকে না গিয়ে আন্দামানের দিকে পাড়ি দেবেন। এমন সবুজের সমারোহ, এমন সুনীল সবুজের নিবিড় মিলন, এমন চির সবুজের দেশ ভারতবর্ষে আর কোথাও আছে কিনা জানি না। ঋতুর পরিবর্তন হয়, গাছের পাতা ঝরে পড়ে, এখানে তা টেরও পাওয়া যায় না। গাছে পুরোনো পাতা থাকতেই নতুন পাতা গজিয়ে ওঠে। এক ডালে নতুন পাতা, একডালে পুরোনো পাতা, এক ডালে আমের মঞ্জরী অন্য ডালে কাঁচা আম, এরকম দৃশ্যের অভাব এখানে হয় না। পৃথিবীর এভারগ্রীন ফরেস্টের মধ্যে নাকি আন্দামানের নামও পড়ে। সবুজ, চিরসবুজের দেশ এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ।

"No amount of description of these islands can do justice to them. Their beauty maddens the soul like wine. They invite or await a Wordsworth, a Spenser or a Tagore to celebrate them in immortal verse; a Macaulay or a Thackeray to praise their striking beauties in glorious prose; a Michael

Angelo or a Raphael to depict this 'fairy land' in glowing colours." (F. A. M. Dass)

২রা অক্টোবর এল যাবার দিন। আবার উঠলাম আন্দামান জাহাজে। জেটি লোকে লোকারণ্য। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে সকলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। ভাবলাম আর কোন দিন হয়ত এদের সঙ্গে দেখা হবে না, সুখে-দুঃখে যাদের সঙ্গে কাটিয়ে দিলাম চারটা বছর। শেষবারের মত দেখে নিলাম পোর্টব্লেয়ার সহরকে।

জাহাজ ছাড়ল। ডানদিকে ফেলে এলাম চ্যাথাম জেটি, সেলুলার জেল, রসদ্বীপ, জল কেটে কেটে, 'এম. ভি. আন্দামান' আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলল কলকাতার দিকে।